চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী

‘চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি’র মূল তিব্বতী থেকে
বাংলা অনুবাদ

অলকা চট্টোপাধ্যায়

বিবেশক
প্যাপিরাস
২ গণেন্দ্র মিত্র লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৪

প্রকাশ : ১৩৬৭

শ্রীমতী নমিতা মজুমদার কর্তৃক সুবচন, আবাস 731
3 বিধান শিশু সরণি, কলকাতা 54 থেকে প্রকাশিত।
শ্রীঅরিজিৎ কুমার কর্তৃক টেকনোপ্রিন্ট, 7 সৃষ্টিধর দত্ত লেন,
কলকাতা 6 থেকে মুদ্রিত।

গোপাল হালদার

শ্রদ্ধাস্পদেষু

মুখবন্ধ

গত কয়েক বছর গবেষণা করে চুরাশি সিদ্ধদের বিষয়ে উপকরণ যা সংগ্রহ করেছি, প্রথমে ইচ্ছা হয়েছিল, ইংরেজিতে লিখে তার যথাযোগ্য সদ্ব্যবহার করার। কিন্তু পরে প্রাথমিক পর্যায়ে এ বিষয়ে সংক্ষেপে বাংলায় লেখার সিদ্ধান্ত করি।

তার প্রধান কারণ বিশিষ্ট কয়েকজন সিদ্ধরচিত চর্যাগীতি ও তৎসংক্রান্ত আলোচনা স্কুল থেকে বিশ্ববিদ্যালয় পর্যন্ত সকল স্তরে বাংলার ছাত্রছাত্রীদের অবশ্যপাঠ্য। এই সিদ্ধদের রচনা বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন বলে পণ্ডিতমহলে স্বীকৃত; তথা তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত এই সিদ্ধদের জীবনী সংকলন 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'র সম্পূর্ণ বাংলা অনুবাদ এ পর্যন্ত হয়নি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিতে এবং আধুনিক অর্থে জীবনীকোষটির বাস্তবমূল্য যাই হোক না কেন, সিদ্ধ প্রসঙ্গে এটিকে অগ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। ভূমিকায় এ বিষয়ে কিছুটা আলোচনা করার প্রয়াস করেছি।

তিব্বতী ভাষা আমি শিখেছি বিশ্বভারতীর ভারত-তিব্বত বিভাগের অধ্যাপক লামা চিম্‌পার কাছে; বছরের পর বছর এ জন্য তিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। বর্তমান অনুবাদের যেটুকু সার্থকতা তার অনেকটাই আচার্য হিসেবে তাঁর প্রাপ্য।

এ ছাড়াও আলোচ্য বইটি রচনায় যাঁদের কাছে পরামর্শ ও সাহায্য পেয়েছি, তাঁদের নাম এখানে বিশেষ করে উল্লেখ করতে চাই। এঁদের মধ্যে আছেন বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের সহ-সভাপতি অধ্যাপক কে. সচ্চিদানন্দ মূর্তি; তিনিই প্রথমে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে গ্রন্থ ইত্যাদি দিয়ে আমাকে সাহায্য করেন। তাছাড়া, কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগারের বর্তমান পরিচালক অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্ত, সারনাথের কেন্দ্রীয় উচ্চ-তিব্বতী শিক্ষা সংস্থানের পরিচালক অধ্যক্ষ রিমপোছে, দিল্লির জওহরলাল নেহরু বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক হরবনস্ মুখিয়া, ডক্টর মহাদেব সাহা, কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংস্কৃত বিভাগের অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়, অধ্যাপক রামকৃষ্ণ ভট্টাচার্য, বিশ্বভারতীর ভারত-তিব্বত বিভাগের অধ্যাপক সুনীতিকুমার পাঠক, ব্যাঙ্গালোরের

অধ্যাপক জি. রামকৃষ্ণ ও শ্রীমতী এন. গায়ত্রী। সর্বশেষে দেবীপ্রসাদের সাহায্য ও সহযোগিতা ছাড়া এই বইটির প্রকাশ সম্ভব হতো না।

আমি প্রধানত কাজ করেছি জাতীয় গ্রন্থাগার, এশিয়াটিক সোসাইটি ও বিশ্বভারতীতে। এই তিনটি সংস্থার কর্তৃপক্ষ ও কর্মীবৃন্দ তাঁদের বহু কাজের মধ্যে আমার প্রয়োজন সব সময়েই মিটিয়েছেন। প্রকাশনা ও মুদ্রণে বিশেষ সাহায্য করেছেন অধ্যাপক অনিল আচার্য ও শ্রীঅরিজিৎ কুমার। এঁদের আমার আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাই।

এঁদের সবার সহযোগিতা না পেলে মতামত প্রকাশে আমার অনেক বেশি দ্বিধা থাকতো এবং ভুলত্রুটিও বেড়ে যেতো নিঃসন্দেহেই। তবে বই-এর ভূমিকা ও অন্যান্য অংশে ব্যক্ত মতামত ও বই-এর ত্রুটিবিচ্যুতির সমস্ত দায়িত্ব অবশ্যই আমার।

বিষয়সূচি

ভূমিকা [১]

ভূমিকার উত্তরকথন : সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত বিপ্লব [৩৭]

চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী

অনুবাদ প্রসঙ্গে ৩

লূইপা ১১ লীলপা ১২ বিরূপা ১৩ ডোম্বিপা ১৮ শবরিপা ২০ সরহপা ২৩ কংকরিপা ২৫ মীনপা ২৬ গোরক্ষ ২৮ চৌরঙ্গ ৩১ বীণপা ৩২ শান্তিপা ৩৩ তন্তিপা ৩৭ চর্মরীপা ৩৯ খড়্গপা ৪১ নাগার্জুন ৪৩ কাহ্নপা ৪৭ কর্ণরিপা ৫০ থগনপা ৫৩ নারোপা ৫৫ শালিপা ৫৭ তিল্লোপা ৫৮ চত্রপা ৫৯ ভদ্রপা ৬০ দুখণ্ডি ৬২ অজোকো ৬৩ কলপ ৬৩ ধোম্বিপা ৬৫ কঙ্কণ ৬৬ কম্বলপা ৬৭ দিংকপা ৭১ ভন্ধেপা ৭২ তন্ধেপা ৭৪ কুক্কুরিপা ৭৫ কুচিপা ৭ মপা ৭৮ মহিপা ৭৮ অচিন্ত ৮০ বভহি ৮১ নলিন ৮২ ভুসুকু ৮৩ ইন্দ্রভূতি ৮৭ মেকোপা ৮৯ কোটলিপা ৯০ কংপরিপা ৯২ জালন্ধর ৯৩ রাহুল ৯৪ ধর্মপা ৯৬ ধোকরিপা ৯৭ মেদিনী ৯৮ পংকজ ৯৯ ঘণ্টাপা ১০০ শেলিপা ১০৫ চলুকি ১০৬ গরুড় ১০৭ লুচিক ১০৮ নগুণ ১০৯ জয়ানন্দ ১১১ পচরিপা ১১২ চম্পকপা ১১৩ ভিক্ষণিপা ১১৫ তেলিপা ১১৬ কুমোরিপা ১১৭ চর্পরিপা ১১৮ মণিভদ্রা ১২০ মেখলা ১২২ কনখলা ১২৩ কলকল ১২৩ কন্তলি ১২৪ ধহুলিপা ১২৬ উধিলি / উড়লি ১২৭ কপাল ১২৭ কিরপল ১২৯ সকর (সাগর) ১৩০ সর্বভক্ষ ১৩৩ নাগবোধি ১৩৪ দারিকপা ১৩৬ পুতলি ১৩৯ পনহ ১৪০ কোকিলপা ১৪১ অনংগ ১৪২ লক্ষ্মীংকরা ১৪৪ সমুদ্র ১৪৬ ব্যালিপা ১৪৭

পুষ্পিকা ১৪৯

পরিশিষ্ট ১৫১

ভূমিকা

তিব্বতের অতি-প্রসিদ্ধ এক ঐতিহাসিকের নাম 'গোয় লোচাবা শোনুনুপাল', তর্জমায় 'গোয় অঞ্চলের পণ্ডিত-অনুবাদক কুমারশ্রী'। তাঁর জীবনকাল 1392-1481 খ্রীস্টাব্দ। তাঁর লেখা সুবিশাল ঐতিহাসিক গ্রন্থটিকে সংক্ষেপে "থেব-থের ঙোম্-পো" বলে উল্লেখ করা হয়। রচনাকাল 1476-1478। গ্রন্থটির অসামান্য ঐতিহাসিক গুরুত্ব বিবেচনা করেই একালের মহান তিব্বতী-বিশারদ জর্জ রোয়েরিখ (George N. Roerich) দীর্ঘদিন ধরে—এবং বিদগ্ধ লামাদের সহায়তায়—এটির ইংরেজি তর্জমা করেন এবং এশিয়াটিক সোসাইটি থেকে *The Blue Annals* নামে তা প্রকাশিত হয়।

ঐতিহাসিক হিসেবে গোয় লোচাবা-র অসামান্য গুরুত্ব নিয়ে এখানে আলোচনার দরকার নেই; রোয়েরিখের ভূমিকার উপর চোখ বোলালেই তা বোঝা যাবে। তবুও গুরুত্বটার কথা মনে রাখা দরকার। তাঁর কোনো উক্তিই একেবারে ভিত্তিহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া অতি বড়ো বিদ্বানের পক্ষেও দুঃসাহস মাত্র। অতএব তাঁরই একটি উক্তি থেকে সিদ্ধদের আলোচনা শুরু করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না।

দোহা প্রচারে বাধা

গ্রন্থে উক্ত হয়েছে,[1] বৌদ্ধধর্মের প্রসার ও সংস্কারে ব্যস্ত স্বয়ং অতীশ তাঁর তিব্বত-বাসের দ্বিতীয় পর্যায়ে সে-দেশে সরহ-র দোহা প্রচার করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু বাধা পেয়েছিলেন। এবং বাধাটা তুলেছিলেন স্বয়ং 'ডোম্-জ্যো-বেই-জুং-নে' (=ডোম্ বংশের জয়াকর)।

ব্যাপারটা রীতিমতো ভাবিয়ে তোলার মতো। কেননা তিব্বতে অতীশের শেষ দশ বছরের জীবনে এই "উপাসক" ডোম্-ই ছিলেন তাঁর সবচেয়ে অনুগত শিষ্য এবং বৌদ্ধধর্ম প্রচার অভিযানের প্রধানতম সংগঠক। তবুও স্বয়ং "প্রভু" বা "মহাপ্রভু" যদি সরহর দোহা প্রচার করতে চান তাহলে অমন অনুগত ভক্তর পক্ষে বাধা দেবার কারণ কী হতে পারে?

রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহ-কে যে-ভাবে বুঝেছিলেন তা মনে রাখলে প্রশ্নটার একরকম উত্তর পাওয়া যেতে পারে। রাহুলের মতে[২] সরাসরি সমাজ-বিপ্লবী না-হলেও সরহ অবশ্যই বিপ্লবী ছিলেন। মতাদর্শগত বিপ্লবী। সরহর দোহা বা গানে সবরকম ধর্মবিশ্বাসের বিরুদ্ধে তীব্র শ্লেষই তার চরম প্রমাণ।

কী রকম গান ? কিছুটা নমুনা তোলা যাক। সরহ বলছেন,

সরহ-র গান

হতভাগারা যোগীদের নিয়ে পরিহাস করে ;
বলে—ওরা বিষাক্ত সাপের মতো,
দেখামাত্র ভয়ে পালাও ॥[৩]

ব্রাহ্মণরা আসলে কিন্তু ভেড়ুয়া (অজ্ঞ, বোকা),
ওরা অর্থহীন চতুর্বেদ আওড়ায়।

মাটি, জল আর কুশ নিয়ে ওরা
বিড়বিড় করে মন্ত্র পড়ে।
ঘরে বসে হোম করার নামে
কাঠ পুড়িয়ে সেই ধোঁয়ায়
শুধু জ্বালা ধরায় নিজেদের চোখে।

রকমারি কাঠের ডাণ্ডা ধরে
ওরা একদণ্ডী, ত্রিদণ্ডীর আজব বেশে
জ্ঞানীর ভাণ করে—
যেন তারা পরমহংস।
অথচ ধর্ম ও অধর্মের তফাত
কোনটাই তারা জানে না।
মিথ্যা কথা বলে শুধু
মানুষকে ঠকায়।

ঈশ্বরবাদী যারা তারা গায়ে ছাই মাখে,
মাথায় জটা বাঁধে, ঘরের কোণে বসে

প্রদীপ জ্বালায় আর
ঘণ্টা বাজায়।

জোড়াসনে বসে তারা চোখ বুঁজে
রণ্ডিমুণ্ডি আর রকমারি বেশের লোকদের
ফুসফুস করে কানে মন্ত্র পড়ে।
অভিষেক দিয়ে আদায় করে
গুরুদক্ষিণা—
এই ভাবেই ঠকায় লোক।

ক্ষপণকদের (জৈন ?) লম্বা লম্বা নখ
নোংরা শরীরে দুর্গন্ধ,
বিবস্ত্র, আর চুলে জট,
ভাণ করে আত্মমুক্তির আর
লোক ঠকায় ভুল পথের নির্দেশ দিয়ে।

নগ্ন থাকলেই যদি মুক্তি পাওয়া যায়
তাহলে শেয়াল কুকুররাই বা
তা পাবে না কেন ?
লোম উৎপাটনেই যদি মোক্ষ হয়
তাহলে যুবতীর নগ্ন নিতম্বই বা
বাদ যাবে কেন ?

পুচ্ছ ধারণ (জৈনদের চামর দোলানো ?) করলেই যদি
মোক্ষ হয়
ময়ূর ও চামরী গাভীরই বা
মুক্তি নয় কেন ?

উচ্ছিষ্ট খেলেই (দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে খেলে ?)
যদি মুক্তি হয়
তাহলে মুক্তি পাবে না কেন
হাতি ঘোড়ারা ?
সরহ বলেন, ক্ষপণকদের মোক্ষ

আমার ধারণার অগম্য।
সত্যকে জানে না তারা
আর সেই অজ্ঞতাতেই
নিপীড়ন করে দেহকে ॥

স্থবিরের উপদেশে প্রব্রজ্যাগ্রহণকেই
সর্বোত্তম বলে প্রচার করে
শ্রমণ আর ভিক্ষুরা ;
সূত্রপাঠ করে, এদের
কেউ কেউ বা শাস্ত্রবচনে
শুধু উত্ত্যক্ত করে নিজের মন।

অন্যরা মহাযানের রথে দৌড়য়
আর বলে
তাদের শাস্ত্রই শ্রেষ্ঠ।
কেউ বা ধ্যান করে মণ্ডলচক্রের
চতুঃ-তত্ত্বের ব্যাখ্যা করে অন্যরা।

[নিম্নোক্ত স্তবকটি প্রবোধচন্দ্র বাগচী-সম্পাদিত সংস্করণে নেই ; মূল তিব্বতী থেকে সংগৃহীত]

কেউ বা সত্য বলে মানে আকাশ ধাতুকে
শূন্যতার ধ্যান করে কেউ
ভ্রান্তপথে চলে এরা সবাই।

সহজ ছেড়ে যারা নির্বাণের আশায় ছোটে
পরমার্থ মেলে না তাদের
সিদ্ধিও নয়।

অন্য বিষয়ে আসক্ত যার চিত্ত
মোক্ষ সে পাবে কী করে ?
ধ্যানেই কি মুক্তি আসবে ?

কী হবে প্রদীপে ? নৈবেদ্যরই বা
কী প্রয়োজন ?

কী লাভ মন্ত্র আউড়ে ?
তীর্থ আর তপোবনে গিয়েই
বা কী হবে ?
মোক্ষ আসে কি শুধু অবগাহনে ?

ছাড় মায়ার বন্ধন,
ত্যাগ কর মিথ্যাদর্শন।
সহজকে জানলে আর
অজানা থাকবে না কিছু।
অন্যরা মুক্তি বলতে যা ভাবে
তা মিলবে এ ভাবেই।

জানতে হবে একমাত্র সহজকে
স্মরণ করবে একমাত্র সহজকে।
শাস্ত্র আর পুরাণের ব্যাখ্যা কিছু নয়।
সহজই সব।
সকল মতের এই শেষ কথা।

সমাধি নয়, প্রব্রজ্যাও নয়
গৃহে বাস কর সুখে
নিজের সঙ্গিনীর সঙ্গে।
যা কিছু কামনা বাসনা
তার ভোগ সমাপ্ত না হলে
কী করে মুক্ত হবে বন্ধন থেকে ?

সহজ যদি এত সহজেই মেলে
তা হলে তার জন্য ধ্যানের কী দরকার ?
আর সহজ যদি হয় অজানা
তাহলে তাকে খোঁজা তো
শুধু অন্ধকার হাতড়ানো।
সরহ তাই সরবে বলেন,
—সহজে না-আছে ভাব, না অভাব।

সমাধি আর ধ্যানে
সহজের সন্ধান মিলবে না ।
তাই ধ্যান করবে কেন ?…

নয় মন্ত্র, নয় তন্ত্র, নয় ধ্যান—
এ সবই ছলনামাত্র ।
হে মূর্খ, স্বভাবে যা শুদ্ধ
সমাধিতে আবিল কোরো না
সেই মন ।
কষ্ট দিও না নিজেকে, থাকো সুখে ।

সুখে কর পানাহার আর মৈথুন—
একবার নয় বারবার ; পূর্ণ কর
এই চক্রেরই আবর্তন ।
সংসারপারের সাধনা হবে
এই ধর্মেই ।

দু পায়ে দলিত কোরো না
এই সংসারকে
তুচ্ছ কোরো না
এই জগৎকে ।

সরহ তাই বলেন :
বায়ু আর মন পথ পায় না
ঢুকবার ;
প্রবেশ নেই চন্দ্র সূর্যেরও
সেই সহজে স্থিত হোক
তোমার চিত্ত ।

পৃথক থেকো না, মিলে যাও ।
বিচার কোরো না বৃথা যুক্তি দিয়ে ।
এই ভাবে চরম কামনার তুঙ্গে উঠলে
এই ত্রিলোকের সব কিছুকেই

মনে হবে এক আর অভিন্ন।
আদি নেই, নেই মধ্য, নেই অন্ত,
সংসারও নেই, নির্বাণও নেই
আত্মপরও নেই এই উত্তম মহাসুখে।

সামনে, পিছনে দশদিকে
যা দেখছ তুমি, সেই বাস্তবই সত্য
ভ্রম থেকে আজ তোমার মুক্তি হোক
বৃথা প্রশ্ন কোরো না অন্যকে।

শ্বাসরুদ্ধ করে সাধনার কী দরকার ?
নাসাগ্রে দৃষ্টিনিবদ্ধ করে
কী দরকার চিত্তসংযোগের ? ওহে মূর্খ !
একবার অন্তত সহজ উপভোগ কর
তাহলে টুটে যাবে সংসারের বন্ধন।

* * *

সহজে সবাই সমান,
সেখানে শূদ্রও নেই, নেই ব্রাহ্মণ।
এই (সহজেই) পুণ্যসলিলা যমুনা,
এখানেই গঙ্গাসাগর, বারাণসী, প্রয়াগ।
চন্দ্র সূর্যও এখানেই।

ক্ষেত্র, পীঠ, উপপীঠ
ঘুরেছি সব তীর্থেই,
তবু দেহের মতো এমন পবিত্র
সুখস্থান পাইনি কোথাও।

* * *

ওহে নিষ্কুলী (কুলহীন)
সহজের তত্ত্বে মন্ত্র-শাস্ত্র সবই অর্থহীন ;
তার মাঝেই লীন হয়ে যায়
ব্রহ্মা-বিষ্ণু-মহেশ্বর, সমগ্র চরাচর।

যারা পান করে না গুরুবচনের
অমৃতধারা
শাস্ত্রের নানা কচকচির মরুভূমিতে
শুকিয়ে মরে তারা তৃষ্ণায়।

ক্ষমা করুন পণ্ডিতরা,
অন্য কিছু করার নেই আমার
গুরুর উপদেশ যা জেনেছি, বলছি তাই।
গোপন কিছুই করব না।

কমলকুলিশে ইন্দ্রিয়ভোগে
দুয়ের যে সুখ,
কে আছে ত্রিভুবনে
যে আনন্দ পায় না সেই রমণে ;
এতে সর্ব কামনা পূর্ণ হয় না, এমন
আছে কি কেউ ?

"এই আপন, ঐ পর"—এইভাবে
ভাবে যে
বদ্ধ থাকে সে বিনা বন্ধনেই ;
মুক্ত করতে পারে না সে নিজেকে।

* * *

সিদ্ধদের পরিচয়

অবশ্যই সরহ সম্পর্কে আলোচনা করতে হলে তাঁর সমসাময়িক ও সমপর্যায়ের মানুষগুলির কথা বিশেষ করে জানা দরকার ; বিচ্ছিন্ন বা বিক্ষিপ্তভাবে আলোচনায় খুব লাভ হবে না।

সরহ ও এই আশে-পাশের মানুষগুলিই সিদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী তাঁর 'হাজার বছরের পুরাণ বাঙ্গলা ভাষায় বৌদ্ধগান ও দোহা'য় পদকর্তাদের পরিচয় দিতে গিয়ে তেত্রিশ জনের নাম করেছেন, এঁদের মধ্যে কেউ কেউ আমাদের আলোচিত সিদ্ধদের তালিকার অন্তর্ভুক্ত নন। যেমন দীপংকর শ্রীজ্ঞান, ধৃষ্টিজ্ঞান, বৈরোচন, মহাসুখতাব্রজ প্রভৃতি।

পরবর্তী কালের গবেষণায় অবশ্য তেত্রিশ জনের নয়, প্রধানত তিব্বতী সূত্র থেকে মোট চুরাশি জনের নাম পাওয়া যায়। তিব্বতী ভাষায় এঁদের বলা হয়েছে ড়ুপথোব বা সিদ্ধ। তবে পরবর্তী কালে নিছক সিদ্ধের সঙ্গে সম্মানার্থে আচার্য, মহাচার্য ইত্যাদি জুড়ে দেওয়া হয়েছে কখনও কখনও। সরহ এই সিদ্ধদের মধ্যে অন্যতম আর সরহ প্রমুখদের নিয়েই আমাদের এই আলোচনা।

সিদ্ধদের সম্পর্কে বিশদ করে জানতে হলে যে প্রধানত তিব্বতী উপকরণের উপর নির্ভর করতে হবে, এ কথা আমরা প্রসঙ্গান্তরে আলোচনা করেছি। অতএব তিব্বতী সূত্র থেকে চুরাশি সিদ্ধদের সম্পর্কে যা জানা যায় তার একটি প্রাথমিক ছক এখানে দেওয়া প্রাসঙ্গিক হবে। অবশ্য এখানে একটা কথা বলে রাখা দরকার। তিব্বতী গ্রন্থটির বিভিন্ন সংস্করণে সিদ্ধনাম ও তাঁদের দেশনাম সর্বত্র এক নয়। বর্তমান তালিকায় আমরা যে-সংস্করণ অনুসরণ করেছি তারই ভিত্তিতে নামগুলি ব্যবহার করেছি। অনেকে সংশোধিত নাম ব্যবহার করেছেন। যেমন: চত্রপা (চিত্রপা), কুচিপা (কুজ্ঝিপা), লীলপা (লীলাপা) ইত্যাদি।

সিদ্ধদের তালিকা

নাম ও ক্রমসংখ্যা	জাতি ও বৃত্তি	গুরু বা দীক্ষাদাত্রী	দেশ বা বাসস্থান	কাল
১। লূইপা	রাজপুত্র ; মাছের অন্ত্র খেতেন, তাই এই নাম	শুঁড়িনী লোকডাকিনী :	সালিপুত্র	
২। লীলপা	রাজা ; লীলা বা লাস্য না ছেড়েও সিদ্ধি লাভ	যোগী,	দক্ষিণ ভারত	
৩। বিরূপা	প্রথমে ভিক্ষু পরে যোগীর আচরণ	ডাকিনী	ত্রৈযুর	রাজা দেবফলের (? দেবপাল) রাজ্যকালে
৪। ডোম্ভিপা	রাজকুলে জন্ম	মুদ্রা : শূদ্রকুলের কন্যা	মগধ	
৫। শবরিপা	ব্যাধ	আর্য অবলোকিতেশ্বর	মন্ত্রবিক্রম পর্বত দনতি পর্বত	রাজা রত্নফলের রাজত্বে
৬। সরহপা	ব্রাহ্মণ	ডাকিনীর পুত্র	ভারতের পূর্বদিকে রাজ্ঞী নগরের রোলিপা	
৭। কংকরিপা (কংকালপা)	শূদ্রকুল, গৃহস্থ	যোগী	মঘহর, ঘহুরি (মগধ ?)	

৮। মীনপা	জেলে	গুরু মহাদেব	কামরূপ	
৯। গোরক্ষ	গন্ধবণিককুলের তরুণ রাখাল	মহাযোগী অচিন্ত্য	ভারতের পূর্বদিকে	রাজা দেবপালের সময়ে
১০। চৌরঙ্গ	রাজপুত্র	অচিন্ত্য		রাজা দেবপালের কাল
১১। বীণপা	রাজকুল, ঘহুরের (গৌড়ের ?) রাজার একমাত্র সন্তান	যোগী বুদ্ধপা	ঘহুর	
১২। শান্তিপা	বিক্রমশীল/বিকামশীলের ব্রাহ্মণ	কোদালিপা	মগধ	রাজা দেবফলের রাজ্যকালে ও সেঙ্গ (সিংহল ?) দ্বীপের রাজা কবিনের সময়ে
১৩। তন্তিপা	তাঁতি	গুরু জালন্ধরপা	সেন্ধনগর	
১৪। চমরিপা	মুচি	ভিক্ষুযোগী	পূর্বভারতের বিষ্ণুনগর	
১৫। খড়্গপা	শূদ্রকুল, কৃষিজীবী পেশায় চোর	জোকি চরপটি (যোগী চরপত্রি ?)	মগধ	
১৬। নাগার্জুন	ব্রাহ্মণ	তারাসিদ্ধি প্রাপ্ত	কাঞ্চীর অন্তর্গত কাহোর	দক্ষিণ দিকের রাজা সালভন্দর কাল

নাম ও ক্রমসংখ্যা	জাতি ও বৃত্তি	গুরু বা দীক্ষাদাত্রী	দেশ বা বাসস্থান	কাল
১৭। কাহ্নপা	কায়স্থ	ডাকিমা ও জালন্ধরপা	রাজা দেবপাল প্রতিষ্ঠিত সোমপুরীর ভিক্ষু	
১৮। কর্ণরিপা বা আচার্য আর্যদেব	প্রব্রজ্যিতদের উপাধ্যায়	নাগার্জুন	নলেন্দ্র (নালন্দা) বিহার	
১৯। থকনপা/থগনপা	নীচকুল ; সর্বদা মিথ্যা কথা বলতেন	ভিক্ষুগুরু	পূর্বভারত	
২০। নারোপা	শুঁড়ির ঘরে জন্ম ; কাঠ বিক্রি পেশা	তিল্লোপা	সালপুত্র	
২১। শলিপা	শূদ্র	ভিক্ষু	বিঘস্থর	
২২। তিল্লোপা	রাজপুরোহিত	নারোপা	ভিগুনগর (? বিষ্ণুনগর)	
২৩। চত্রপা	পুঁথি নিয়ে ভিক্ষা করতেন	যোগী	সেন্ধনগর	
২৪। ভদ্রপা	ধনী ব্রাহ্মণ	যোগী	মণিধর	
২৫। দুখণ্ডি	ঝাড়ুদার ভিখারী	যোগী	গন্ধপুর	
২৬। অজোকো	গৃহস্থের ছেলে ; অলস	যোগী	সালিপুত্র (পাটলিপুত্র)	
২৭। কলপ	অত্যন্ত সুপুরুষ	যোগী	রাজপুরী	
২৮। ধোম্বিপা	ধোপার ছেলে	যোগী	সালিপুত্র	

২৯।	কংকণ	রাজা ; হাতের কংকণ নিয়ে ধ্যান করলেন	যোগী	বিষ্ণুনগর	
৩০।	কম্বলপা	রাজা ও ডাকিনীর পুত্র	ডাকিনী	কংকরম (কাংড়া ?)	
৩১।	দিংকপা (ঢেঁকিপা)	ব্রাহ্মণ ও রাজমন্ত্রী	লূই	সালিপুত্র, ঔদেশ জইন্তপুর	
৩২।	ভদ্ধেপা	পটুয়া,	আচার্য কৃষ্ণাচার্য	শ্রাবস্তী	
৩৩।	তন্ধেপা	জুয়াড়ী, শূদ্রকূলে জন্ম	যোগী	কৌশাম্বী	
৩৪।	কুকুকুরিপা	ব্রাহ্মণ পরে যোগী	ডাকিনী	কপিলসত্র (কপিলাবস্তু)	
৩৫।	কুচিপা : পিঠে কুঁজ ছিল	জাতিতে শূদ্র, চাষের কাজ করতেন	নাগার্জুন	কহরি	
৩৬।	ধমপা	ব্রাহ্মণ, ধর্মনিষ্ঠ	যোগী	বিক্রমস্থর (পুর ?)	
৩৭।	মহিপা	পালোয়ান	যোগী	মগধ	
৩৮।	অচিন্ত	গরীব কাঠুরে	যোগী কম্বল	ধনিরূপ	
৩৯।	বভহি	রাজকুল	যোগী	ধংজুর	
৪০।	নলিন	রাজকুল, অতি দরিদ্র, পদ্মের মৃণাল সংগ্রহকারী	যোগী	সালিপুত্র	
৪১।	ভুস্কু	রাজকুল ; প্রথমে ভিক্ষু পরে রাজার পরিচারক ও		নলেন্দ্র নালন্দা	রাজাদেবফল

নাম ও ক্রমসংখ্যা	জাতি ও বৃত্তি	গুরু বা দীক্ষাদাত্রী	দেশ বা বাসস্থান	কাল
	মৃগশিকারী বা ব্যাধ			
৪২। ইন্দ্রভূতি	সমবোলের রাজা	গুরু লাবপা	ওরজন দেশের সমবোল	
৪৩। মেকোপা	মুদিবংশে জন্ম	যোগী	বংগল	
৪৪। কোটলিপা/-কোদালিপা	কোদাল নিয়ে কাজ করেন	শান্তিপা	রামেশ্বর	
৪৫। কংপরিপা	কামার	যোগী	সালিপুত্র	
৪৬। জালন্ধর	ব্রাহ্মণকুলে জন্ম কিন্তু সামান্য মানুষ	ডাকিনী	নগরখোদথ (নগরকোট)	
৪৭। রাহুল	শূদ্রকুল	যোগী	কামরূপ	
৪৮। ধর্মপা	পণ্ডিত/ব্যাখ্যা বিশারদ	ডাকিনী	বোধিনগর	
৪৯। ধোকরি	পাত্র নিয়ে ভিক্ষা চাইতেন	যোগী	সালিপুত্র	
৫০। মেধিনী/মেদিনী	চাষী	যোগী	সালিপুত্র	
৫১। পংকজ	ব্রাহ্মণ পুত্র,	নাগার্জুন		
৫২। ঘণ্টাপা	প্রথমে ভিক্ষুসম্বরপ্রাপ্ত, পরে বেশ্যাকন্যার সংসর্গে		শ্রীনলেন্দ্র ও সালিপুত্র	রাজা দেবফল

		পুত্রলাভ ও সপরিবারে সিদ্ধিপ্রাপ্ত			
৫৩।	যোগিপা/যোকিপা	চণ্ডাল	শরব (?)	ওদন্তপুরী	
৫৪।	চেলুকপা	শূদ্র, সর্বদা নিদ্রাপ্রবণ	যোগী	মঙ্গলপুর	
৫৫।	গোরুর	পাখিশিকারী	যোগী		
৫৬।	লুচিক	মল্ল, জাতে ব্রাহ্মণ	যোগী	বংগল	
৫৭।	নগুণি	এক শূদ্রকুলের অলস কর্মবিমুখ সন্তান	যোগী	পূর্বদেশ	
৫৮।	জয়ানন্দ	রাজার ব্রাহ্মণমন্ত্রী কিন্তু গুহ্যমন্ত্রে সিদ্ধ		বংগল	
৫৯।	পচরিপা	খুব গরীব, পিঠে বিক্রি করতেন	আর্য অবলোকিতেশ্বর	পক/পোতলগিরি	
৬০।	চম্পকপা	রাজা, চম্পকফুলের বিলাসী	যোগী		
৬১।	ভিক্ষণপা	শূদ্র	ডাকিনী	সালিপুত্র	
৬২।	তেলিপা	তেলি	পণ্ডিত ভহণ	সতপুরী নগর	
৬৩।	কুমরিপা	কুমোর	যোগী	জোমনশ্রী	
৬৪।	চপরিপা	যোগী		মগধ	চম্পকের রাজা মহেল

	নাম ও ক্রমসংখ্যা	জাতি ও বৃত্তি	গুরু বা দীক্ষাদাত্রী	দেশবা বাসস্থান	কাল
৬৫।	মণিভদ্রা বা যোগনী বহুড়ি	ধনী গৃহস্থের কন্যা	কুক্কুরিপা	অগরচে সহরের শ্মশান	(মহীপাল ?)
৬৬।	মেখলি } দুই বোন	গৃহস্থের কন্যা, মাঝির দুজন ছেলের বৌ ; ছিন্নমস্তা দুবোন	কাহ্নপা	দেবীকোট	
৬৭।	কনখলা				
৬৮।	কলকল বা কোলাহল	শূদ্র	যোগী	ভিরলি নগরের শ্মশান	
৬৯।	কন্তলি	দর্জি ও ঝাড়ুদারের কাজ করতেন, ভিখারির মতো থাকতেন	ডাকিনী পৈতলি	মণিধর	
৭০।	ধহুলি	শূদ্রকুলের গরীব মানুষ ঘাসের দড়ি বানাতেন	যোগিনী	ধেকর	
৭১।	উড়িলি/উধলি	ধনী বৈশ্য	যোগী কর্ণরিপা	দেবীকোট ; বুদ্ধগয়া	
৭২।	কপাল	শূদ্রকুলের খেটে খাওয়া মানুষ	যোগী কৃষ্ণাচার্য	রাজপুরীর দেশের শ্মশান	

৭৩।	কিরপাল (পাঠান্তরে রাজা কিলপাদ)		যোগী	গ্রহর নগর	
৭৪।	সকর (পাঠান্তরে সাগর)	রাজা ইন্দ্রভূতির পুত্র, সরোবরে পদ্মের মধ্যে জন্ম	যোগী	কাঞ্চী দেশ	
৭৫।	সর্বভক্ষ্য	শূদ্র	সরহ	অভির	রাজা সিংহচন্দ্র
৭৬।	নাগবোধি	জাতে ব্রাহ্মণ, পেশায় চোর	নাগার্জুন	স্বর্ণবিহার ; শ্রীপর্বত	
৭৭।	দারিক	রাজা ইন্দ্রপাল পরে বেশ্যার ভৃত্য হয়েছিলেন বলে দারিক নাম হলো	লূইপা	সালিপুত্র ও শ্মশান	রাজা ইন্দ্রপাল
৭৮।	পুতলিপা	শূদ্রকুলের এক গৃহী, ছবি (হেবজ্রের) নিয়ে ভিক্ষা করতেন	যোগী	বংগল	
৭৯।	পনহ	শূদ্রকুল, মুচির কাজ করতেন	যোগী	গন্ধনগর (পাঠান্তরে সন্ধনগর)	
৮০।	কোকলিপা	রাজা	ভিক্ষু	চম্পারণ, গ্রীষ্মকালে আম্রবনে বাস করতেন	
৮১।	অনংগ	শূদ্র	ভিক্ষু	গরুর (গৌড় ?)	

নাম ও ক্রমসংখ্যা	জাতি ও বৃত্তি	গুরু বা দীক্ষাদাত্রী	দেশ বা বাসস্থান	কাল
৮২। লক্ষ্মীংকরা	রাজকন্যা, রাজা ইন্দ্রভূতির ভগ্নী	কম্বলপা	ঔরজন-এর সিপোল (সম্বল ?) ; বিবাহের পরে লংকাপুরী ও শ্মশানে সিদ্ধিলাভ	
৮৩। সমুদ	নীচকুলের মানুষ সমুদ্র থেকে রত্ন তুলে বিক্রি করতেন (ডুবুরী ?)	যোগী অচিহ্ন	সর্বটির নামে দেশ ; পরে শ্মশান	
৮৪। ব্যালিপা/ব্যাড়িপা	ধনী ব্রাহ্মণ নাগার্জুনের গুরু	দারিমো (বারনারী ?)	অপত্রদেশ	কিলমপ নামে রাজা

সিদ্ধদের নাম

এঁদের বৈশিষ্ট্য সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে প্রথমেই ওঠে নামপ্রসঙ্গ।

সাধারণত—বিশেষ করে উচ্চবর্ণের সমাজে—সন্তানের নামকরণে এখনও দেখা যায় সংস্কৃত শব্দের প্রাধান্য। কিন্তু সিদ্ধদের নামের তালিকা বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে সংস্কৃত বা তৎসম শব্দ নয়, তাঁদের অনেকের নাম বৃত্তিগত বা. পেশাগত। যেমন তন্তিপা: তাঁতি। চমরিপা: চামার। তেলিপা: তেলি। কুমোরিপা: কুমোর। ধোম্বিপা: ধোবী। কংপরিপা: কামার। মেদিনীপা: চাষী।

কিংবা তাঁদের আচার-আচরণ অনুযায়ী নামকরণও চোখে পড়ে। যেমন, লূইপা: মাছের অন্ত্র খেতেন বলে এ হেন নাম। বীণপা: বীণা বাজাতেন। থকণপা বা থগনপা: লোক ঠকাতেন বা মিথ্যা কথা বলতেন। শলিপা: শেয়ালের বা নেকড়ে বাঘের ডাকে ভয় পেতেন। অজোকো বা অযোগ্য: অলস প্রকৃতির লোক। এক গৃহস্থ পুত্র; তাঁর নাম নগুণি অর্থাৎ যাঁর কোন গুণ নেই। কুক্কুরীপা: কুকুর নিয়ে চলতেন। দিংকপা: ধান কুটতেন (ঢেঁকিতে ?)। দারিকপা: বেশ্যার ভৃত্য, দোর সামলাতেন। এমনি সব নাম সিদ্ধদের। এগুলি সত্যই ব্যক্তিগত নাম কিনা, এ প্রশ্ন নিশ্চয়ই অবান্তর নয়।

সিদ্ধ বলে যাঁদের প্রসিদ্ধি তাঁদের দ্বিতীয় বৈশিষ্ট্য: বহু যুগের ওপারে দাঁড়িয়ে তাঁরা যেন এ যুগের কবির ভাষায় বলতে চেয়েছেন,

'বৈরাগ্য সাধনে মুক্তি'—সে তাঁদের নয়।

যার যে কাজ সে কাজ সম্পূর্ণ সার্থক করেই তাঁরা সিদ্ধ হয়েছেন: নিজের পেশাকে ছাড়েন নি, সংসার ছেড়ে বনবাসেও যান নি, প্রব্রজ্যা, উপসম্পদা গ্রহণ করে মঠে মন্দিরে, সংঘারামে আশ্রয়ও খোঁজেন নি। সিদ্ধদের মধ্যে তাই প্রায় সবাই একান্ত বৃত্তিজীবী। এখানে কথাটা আরও বিশদ করে বলতে চাই। যেমন শবরিপা: ব্যাধ। মীনপা: জেলে। গোরক্ষপা: গরুর রাখাল। তন্তিপা: তাঁতি। চমরিপা ও পনহপা: চামার। খড়্গপা: চোর। নারোপা: শুঁড়ি। ছত্রপা: ভিক্ষুক। ভদ্ধেপা: চিত্রকর। অচিন্ত্যপা: কাঠুরে। মেকোপা: মুদী। কোটলিপা বা কোদালিপা: কোদাল দিয়ে মাটি কোপান। যোগিপা: চণ্ডাল। গোরুরপা: ব্যাধ বা পাখি মারেন। পচরিপা: পিঠে বিক্রেতা। কন্তলিপা: দর্জি। সরহপা: শর তৈরি করেন।

এঁরা বেশির ভাগই নীচু জাতের মানুষ। চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে কুড়ি জনকে তো স্পষ্ট করে শূদ্র বলা হয়েছে। একমাত্র বিরূপাকেই দেখি প্রথম পর্বে সংঘারামের বৌদ্ধভিক্ষুরূপে। তবে বিহারে বসে মদ মাংস খাওয়ার অপরাধে তিনি ভিক্ষুসংঘ

থেকে বিতাড়িত হলেন অবিলম্বে; যদিও তারপরে তাঁর মদ খাওয়ার মাত্রা বেড়েই চলল।

এঁদের দুচারজনকে যে রাজা বা রাজপুত্র বলা হয় নি তা নয়, তবে সিদ্ধ হতে গিয়ে প্রথমেই তাঁদের শ্রেণীচ্যুত, জাতিচ্যুত হতে হয়েছে। যেমন দিংকপা গুরুতে ছিলেন বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ মন্ত্রী; সিদ্ধিলাভের জন্য কিন্তু তাঁকে মদ বিক্রি করতে হয়েছে, ধান কুটতে হয়েছে। কেন? তাঁর কাহিনীতে পরিষ্কার বলা হয়েছে, ব্রাহ্মণত্বের অহংকার চূর্ণ করবার জন্যই তাঁকে দিয়ে এসব হীন কাজ করানো। রাজা ইন্দ্রপাল সিদ্ধ পদবাচ্য হবার জন্য বারনারীর দাসত্ব গ্রহণ করেছেন, এই বারনারীরই পা ধুয়েছেন, সারা শরীর মালিশ করেছেন; তাই সিদ্ধ পদবাচ্য হবার পর তাঁর নাম হলো দারিকপা—"দরোয়ান" (?)।

সিদ্ধদের গুরু

কিন্তু কারা এঁদের গুরু ছিলেন? সিদ্ধির জন্য এঁদের দীক্ষাই বা কারা দিয়েছেন? সেখানেও দেখা যাবে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণ বা শাস্ত্রজ্ঞ বৌদ্ধাচার্যের হদিশ মেলে না; তার বদলে এঁদের দীক্ষা ডাকিনী বা 'যোগী'দের কাছে।

ওড্ডিয়ান রাজ ইন্দ্রভূতি ও তাঁর বোন লক্ষ্মীংকরা। বলা হয়ে থাকে আচার্য পদ্মসম্ভব এই ইন্দ্রভূতিরই পুত্র। তিব্বতরাজ ঠি-স্রোং-দে-চান (খ্রীঃ 755-797)-এর আমন্ত্রণে বৌদ্ধাচার্য শান্তরক্ষিত ও কমলশীলের সময়ে পদ্মসম্ভবও তিব্বতে যান, পত্নী মন্দরবাও তাঁর সঙ্গে তিব্বতে গিয়েছিলেন।

ইন্দ্রভূতি ও লক্ষ্মীংকরার গুরু ছিলেন সিদ্ধ কম্বলপা। সিদ্ধ অচিন্তপার গুরুও এই কম্বলপা। আবার সিদ্ধ অচিন্তপার তিন শিষ্য—সিদ্ধ গোরক্ষপা, সমুদপা, চৌরঙ্গপা। কিন্তু এ হেন কম্বলপা, যাঁর শিষ্য-পরম্পরায় এত জন সিদ্ধর তালিকা—তাঁকে দীক্ষা দিয়েছিলেন কে?

তাঁর দীক্ষাদাত্রী কিন্তু এক ডাকিনী—সে ডাকিনী আবার তাঁর নিজের মা। আপাত দৃষ্টিতে তিনি রাজরাণী বলেই উল্লিখিত, কিন্তু রাজরাণীর সংসারধর্ম ছিল তাঁর বাইরের আবরণ। রাজপ্রাসাদের বাইরে গোপনে ডাকিনীচর্যাই ছিল তাঁর আসল সাধনা। পুত্রকে রাজকাজে বিমুখ করে তিনিই তাঁকে নিয়ে যান সাধনার পথে।

তন্তিপা ও কাহ্নপার গুরু জালন্ধরপা। তাঁর দীক্ষাও এক ডাকিনীর কাছে। কুক্কুরীপার দীক্ষাদাত্রীও এক ডাকিনী আর মণিভদ্রা ছিলেন এই কুক্কুরীপারই শিষ্যা। দিংকপা ও দারিকপার গুরু লূইপা ; লূইপার দীক্ষাও এক ডাকিনীর কাছে। ভিক্ষণপা, ধর্মপা, কন্তলিপা—এঁদেরও ডাকিনীর কাছেই দীক্ষা। সিদ্ধ বলে প্রসিদ্ধ চুরাশিজনের জীবনী থেকে দেখা যায় প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে কুড়ি জন সিদ্ধর দীক্ষাদাত্রী ছিলেন ডাকিনী। কারা এই ডাকিনী ?

ব্রিফল্ট-এর বৃহদাকার গ্রন্থ (R. Briffault, *The Mothers*) পড়লে দেখা যাবে, পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মের প্রতিষ্ঠাপর্বে যাদের ডাইনী বলে নির্যাতনের শিকার করা হয়েছে, প্রাচীনতর মাতৃতান্ত্রিক সমাজ ও ধর্মাচরণে তাঁদেরই একচ্ছত্র অধিকার। তাহলে কি এ প্রশ্ন তোলা যায় যে সিদ্ধ আন্দোলনের মূলেও মাতৃ-তান্ত্রিক ধর্মের একটা ইংগিত খোঁজা অবাওর নয় ?

যাই হোক, এ হেন ডাকিনীদের কাছে দীক্ষা নেবার প্রথম ও প্রধান শর্ত ছিল, শিষ্যদের জাতপাতের ধারণা ভুলতে হবে, শ্মশানে-মশানে যত্র-তত্র থাকতে হবে, ভাল ও মন্দ খাদ্যের বিচার ছেড়ে পচা ও বাসি খাবার খেতে হবে।

এই সিদ্ধদের সময়ে—অর্থাৎ পাল রাজাদের আমলে—প্রধানত রাজবংশের পৃষ্ঠপোষকতায় পূর্বভারতে নালন্দা, ওদন্তপুরী, বিক্রমশীল, সোমপুরী প্রভৃতি বিহার বৌদ্ধধর্ম-চর্চার কেন্দ্ররূপে দেশে-বিদেশে যখন কীর্তিত হয়েছে তখন এই অখ্যাত, কুখ্যাত ডাকিনীরা শ্মশানে, পথের ধারে, শুঁড়িখানায় বসে বৌদ্ধ শাস্ত্রে ও ধর্মে অনুরাগ দেখিয়েছেন—এই সিদ্ধান্ত অবিশ্বাস্য হয়ে দাঁড়ায় না কি ?

দীক্ষাদাত্রী হওয়া দূরের কথা, নারীর প্রাধান্য বা সমানাধিকার কি বৌদ্ধধর্মে কোনো সময়ে ছিল ? বুদ্ধদেবের কাল থেকে মহাপ্রজাপতি গৌতমী ও আনন্দের কাহিনী তো অজানা নয় ! বুদ্ধদেবের পালিকা মাতাকে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশের অনুমতি দিয়েছিলেন বলে আনন্দকে গঞ্জনা সহ্য করতে হয়েছিল। বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করতে হলে প্রথমেই সংসার ত্যাগ করে, নারীসংগ ছেড়েই প্রব্রজ্যা ও উপসম্পদা গ্রহণ করার নিয়ম ; তবে সংঘারামে দীক্ষা ও আশ্রয়লাভ সম্ভব। তাই ডাকিনীদের সঙ্গে বৌদ্ধধর্মের সম্পর্ক খোঁজা কষ্টকল্পনা নয় কি ?

শিষ্যদের দীক্ষা দেবার সময়ে ডাকিনীদের প্রথম কথা : যে যা কাজ করছো, তা ছেড়ো না, বরং আরও ভালো করে করো—তারই মধ্যে সত্যের সন্ধান। তুলনায় পরবর্তী কালের ভাষায় তাঁরা জানতেন আর মানতেন,

'চাষি খেতে চালাইছে হাল
তাঁতি বসে তাঁত বোনে,
জেলে ফেলে জাল—
বহুদূর প্রসারিত এদের বিচিত্র কর্মভার
তারি 'পরে ভর দিয়ে
চলিতেছে সমস্ত সংসার।'

যোগীদের কথা

ডাকিনী ছাড়াও চুরাশি সিদ্ধর জীবনীতে আর এক ধরনের গুরুরা এসেছেন, যাঁদের বলা হয়েছে যোগী।

লীলাপা সিদ্ধদের তালিকায় দ্বিতীয়, তাঁর কাহিনী অনুসারে—

দক্ষিণ ভারতের এক রাজা এক সময়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। ভিনদেশী এক যোগী সেই সময়ে তাঁর কাছে এলেন।

তাঁকে দেখে রাজা বললেন, 'দেশে দেশে ভ্রমণ করে আপনি ক্লিষ্ট হয়েছেন।'

'আমি কিছু কষ্ট ভোগ করছি না, কিন্তু আপনি নিজেই ক্লিষ্ট। রাজ্য হারাবার ভয়ে, প্রজাদের অসন্তোষের আশংকায় আপনি সর্বদাই বিব্রত। আমি আগুনে লাফিয়ে পড়লেও পুড়ব না, বিষ খেলেও মরব না। রসায়নের সিদ্ধি আমার আছে।'

তাঁর কথা শুনে রাজার শ্রদ্ধা হলো। কিন্তু শুধু লীলাপাই নন, মোটের উপর চুরাশি জন সিদ্ধের মধ্যে একত্রিশ জন সিদ্ধকে এই যোগীরা সিদ্ধির পথ দেখিয়েছেন। এঁদের মধ্যে লীলাপা ছাড়াও আছেন, কংপরিপা, চমরিপা, শলিপা, ছত্রপা প্রমুখ সিদ্ধ। এই সিদ্ধদের আবার শিষ্যরাও ছিলেন।

সব মিলিয়ে সিদ্ধদের এক বিরাট দল এই যোগীদের কাছে তাঁদের সিদ্ধির জন্য প্রত্যক্ষভাবে বা সম্প্রদায়-পরম্পরায় ঋণী।

কারা এই যোগী? আমাদের আকরগ্রন্থ থেকেই দেখা যাবে, এঁরা কোন বাঁধাপথের পথিক নন। কখন যে কোথা থেকে হঠাৎ এসে এঁরা হাজির হচ্ছেন, তার হদিশ পাওয়া ভার। যখন যার যেখানে দরকার, প্রয়োজন বুঝে এঁরা তার পাশে এসে দাঁড়াচ্ছেন। ভদ্রসমাজের বাইরে ছায়ার মতো এঁদের গতিবিধি। শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত এঁরা নন। বৌদ্ধ, জৈন, শৈব, ব্রাহ্মণ—কোন ধর্মের এলাকাতেই এঁদের ফেলা যাবে না। যদিও এঁদের দু'চার জনকে প্রথমে যোগী পরে ভিক্ষু বলা

হয়েছে, তবুও এঁদের আচার-আচরণ, ধরণ-ধারণ থেকে স্পষ্টই বোঝা যায় বৌদ্ধ-ধর্মের নীতি-নিয়মের ধারে কাছেও এঁরা যান নি। নিষিদ্ধ মদ্য, মাংস, মৈথুন—কোনও কিছুতেই এঁদের বিরাগ নেই।

যেমন ধনী ব্রাহ্মণ গৃহস্থ ভদ্রপার কাহিনী :

মণিধর নামের এক দেশে এক ব্রাহ্মণ অগাধ ধনসম্পদ ও অসংখ্য অনুচরসহ (ভোগসুখে) বাস করছিলেন।

একদিন তাঁর অনুচররা স্নান করতে গেল, তিনি নিজ গৃহেই থাকলেন। এমন সময় এক যোগী তাঁর কাছে এসে আহার চাইলেন।

ব্রাহ্মণ (যোগীকে) বললেন, 'তুমি অশুচি, আমার গৃহ অপবিত্র করবে না, চলে যাও এখান থেকে। আমার অনুচর ও অন্যরাও পছন্দ করবে না, চলে যাও।'

যোগী বললেন, 'অশুচি কাকে বলে ?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যাদের দেহ অস্নাত, বসনহীন, নরকপালধারী, যারা অপবিত্র খাদ্য খায়, নীচকুলের যারা, তারাই অশুচি। শীঘ্র অন্যত্র যাও।'···

পরে কিন্তু ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা হলো।···ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি যদি এখানে ধর্ম শ্রবণ করি তাহলে আমার অনুচর ও অন্যরাও আমার উপর বিরক্ত হবে। আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই আমি যাবো। কোথায় আপনি থাকেন ?'

'আমি শ্মশানে থাকি। মদ ও শূকরমাংস নিয়ে সেখানে এসো।'

ব্রাহ্মণ বললেন : 'আমি ব্রাহ্মণ, মদ ও শূকর মাংসের নাম উচ্চারণ করাও আমার অনুচিত, কী করে আমি তা নিয়ে যাব ?'···যোগী বললেন, 'উপদেশ যদি চাও, তাহলে এগুলি নিয়ে আসবে।'···ছদ্মবেশে বাজারে গিয়ে ব্রাহ্মণ মদ ও শূকর মাংস কিনলেন আর শ্মশানে গিয়ে যোগীকে সেগুলি পরিবেশন করলেন। যোগী কিছুটা নিজে খেলেন, বাকিটা ব্রাহ্মণকে খেতে দিলেন।···তারপর তাঁর জাতের অহঙ্কার দূর করবার জন্য ব্রাহ্মণকে ঝাড়ুদারের কাজে লাগালেন।

সমাজের বাইরে, লোকালয় থেকে দূরে বাস করতেন এই অজ্ঞাতপরিচয় যোগীরা ; সংসারী মানুষের কাছে তাঁরা ছিলেন একান্তই উপেক্ষিত, অস্পৃশ্য। অথচ রাজা-রানী, রাজপুত্র-রাজকন্যা, ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ও তত্ত্বজ্ঞ পণ্ডিত, ধনী গৃহস্থ থেকে শুরু করে বিশেষত চামার, শুঁড়ি, কামার, কুমোর, তেলি, তাঁতি, চাষাভুষো পর্যন্ত সমাজের সব ধরনের মানুষ এঁদের গুরু বলে মেনেছেন, পরম ভক্তিভরে এঁদের কাছে দীক্ষা ও উপদেশ নিয়েছেন, নিয়ে সিদ্ধ হয়েছেন। কিন্তু কারা এই সিদ্ধ ?

সিদ্ধ শব্দের তাৎপর্য ব্যাখ্যার অভাব নেই। তিব্বতী তর্জমায় কিন্তু কোনও রকম বাগাড়ম্বর না করে খুব সোজাসুজি বলা হয়েছে ‘ডুপ্‌থোব” অর্থাৎ সিদ্ধ বা সিদ্ধিলাভ করতেন যাঁরা। এই প্রসঙ্গে অষ্টসিদ্ধির একটি তালিকা আমরা পাই : খড়্গা, অঞ্জন, পাদলেপ, অন্তর্ধান, রসরসায়ন, খেচর, ভূচর, পাতালসিদ্ধি।

অনেক সময় চুরাশি সিদ্ধদের এই সব অলৌকিক কার্যকলাপে পারদর্শী বলে বর্ণনা করা হয়েছে।

সিদ্ধদের সংখ্যা

সিদ্ধদের সম্পর্কে আর একটি বিতর্কিত প্রশ্ন, তাঁদের সংখ্যা। প্রধান প্রধান তিব্বতী সূত্রে চুরাশি জন সিদ্ধর নাম থাকলেও অন্যরা এই সংখ্যাকে কখনও বা আশি, কেউ বা ছিয়াত্তর, একজন পঞ্চাশ আবার একজন পঁচাশি বলেছেন। চুরাশি— এই সংখ্যা নিয়ে বহু গবেষণা হয়েছে। বৌদ্ধশাস্ত্র গ্রন্থে কখনও চুরাশি হাজার ধর্মস্কন্ধ, চুরাশি হাজার স্তূপ ইত্যাদির উল্লেখ আছে। বাগচী অবশ্য এই সংখ্যাটির কোনও গূঢ় তাৎপর্য আছে বলে মনে করেন নি, তিনি মন্তব্য করেছেন, “We simply do not know why the number was 84 and not anything else.”[4]

সিদ্ধদের ভাষা

কিন্তু কী ভাষায় কথা বলেছেন এই সিদ্ধরা আর তাঁদের গুরু ডাকিনী ও যোগীরা ? সে ভাষা নিশ্চয়ই পণ্ডিতী ভাষা নয়। সাধারণ মানুষের মধ্যে তাদের সঙ্গে মুখের ভাষায় কথা বলা—বিশেষ করে গান রচনা করা—এই তাঁদের কাজ ছিল। মোনডুপ শেরব তাই স্পষ্ট করেই বলেছেন, ভারতের চম্পারণের মহাগুরু অভয়দত্তশ্রীর কণ্ঠকলস থেকে উদ্ভূত অর্থাৎ মুখ থেকে শুনে চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী লেখা। অর্থাৎ লিখিত কোন গ্রন্থের অনুবাদ নয়, একেবারেই মৌখিক ঐতিহ্যের ফসল।

সিদ্ধরা তাঁদের ভক্ত শিষ্যদের কাছে যা বলেছেন তাও দেবভাষা সংস্কৃতে নয়, পুঁথির লেখায় বাঁধা পড়েনি সে উপদেশ। সাবেকি শিক্ষার সুযোগ-বঞ্চিত সমাজের

তথাকথিত নীচের তলার এই নিরক্ষর মানুষগুলি যেভাবে জীবন কাটাতেন, যাদের মধ্যে ও যেখানে থাকতেন, আর যে কথাগুলি তাঁরা বলেছেন—সাধু ভাষায় সংস্কৃতে তা উচ্চারিত হওয়া কোনোমতেই সম্ভব কি ? অথচ টীকা ছাড়াও তন্ত্রের অজস্র গ্রন্থ এই সিদ্ধদের নামে সংস্কৃতে লিপিবদ্ধ হয়েছে ![5] মূল গ্রন্থের দুরূহ জটিল তত্ত্বকে সহজ সরল করে ব্যাখ্যার জন্যই টীকা বৃত্তি প্রভৃতির অবতারণা। আর এখানে দেখা যাচ্ছে উলটপুরাণ। মুখের কথার সহজ দোহা ও গানের উপর শাস্ত্রের নানা রকম কচকচি আরোপ করে তাকে সাধারণ মানুষের নাগালের বাইরে নিয়ে যাবার পাকাপোক্ত ব্যবস্থা! মুনিদত্তর সংস্কৃত ও কর্ম-ঠিনলেপার তিব্বতী ভাষায় লেখা টীকা তার প্রমাণ।

সিদ্ধদের রচিত চর্যাগীতির ভাষা সম্পর্কে সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় বলেছেন, The language of the *caryas* is the genuine vernacular of Bengal at its basis. It belongs to the early or old NIA Stage.[6] এই ভাষা নিয়ে পণ্ডিত মহলে বহু আলোচনা হয়েছে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর মতামত অনেকেই জানেন। তিনি এই প্রসঙ্গে বলেছেন, গানগুলি সন্ধ্যা ভাষায় লেখা এবং সন্ধ্যা ভাষা মানে আলো-আঁধারী ভাষা। বিধুশেখর শাস্ত্রী তাঁর 'সন্ধ্যা ভাষা' প্রবন্ধে এ সম্পর্কে বিস্তৃত অভিমত দিয়েছেন।[7] আঁলোচনা করেছেন মুহম্মদ শহীদুল্লাহ,[8] প্রবোধচন্দ্র বাগচী,[9] সুকুমার সেন,[10] শশিভূষণ দাশগুপ্ত,[11] মণীন্দ্রমোহন বসু,[12] D Snellgrove,[13] Per Kvaerne[14] প্রমুখ দেশবিদেশের পণ্ডিতরা।

প্রশ্ন উঠেছে চর্যার ভাষা, সিদ্ধদের ভাষা—এ কি সত্যিই বাংলাভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন ? বিরুদ্ধতা[15] করেছেন অন্য পণ্ডিতরা। বলেছেন বাংলা নয়, এ ভাষা হিন্দী ; কেউ দাবি করেছেন, এ ভাষা ওড়িয়া।[16]

কিন্তু ভাষার প্রাদেশিকত্ব নিয়ে এই বিতর্ক শুরু করলে বোধহয় একটি প্রাথমিক সত্যকেই অস্বীকার করা হয়। কেননা এ কথা তো আমাদের সকলেরই জানা, আর মেনে নেওয়াই বোধহয় ভালো যে আজ থেকে হাজার বছর আগে বাংলাদেশ বলতে এক বৃহৎ বঙ্গকেই বোঝাতো। There seems to have been an unbroken connection between Bihar, Bengal, Kalinga and the Andhra country, racially and linguistically.[17]

তবুও চর্যার ভাষা নিয়ে আলোচনা প্রসঙ্গে প্রচলিত একটি সিদ্ধান্ত সম্পর্কে সংশয় জাগে।

হরপ্রসাদ শাস্ত্রী বলেছেন, "তাই আমরা দীপংকর শ্রীজ্ঞানকে বাঙ্গালী বলিয়া

ধরিয়া লইয়াছি। তাঁহার অনেকগুলি সংকীর্তনের পদ ছিল। একখানির নাম 'বজ্রাসন বজ্রগীতি', একখানির নাম 'চর্যাগীতি', একখানির নাম 'দীপংকর শ্রীজ্ঞান ধর্মগীতিকা'। আমার এই কথা যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বঙ্গ-সাহিত্যের সৌভাগ্য বড় কম ছিল না। এত বড় প্রকাণ্ড পণ্ডিতও মাতৃভাষার পদ রচনা করিতে কুণ্ঠিত হইতেন না।"[১৪]

দীপংকর শ্রীজ্ঞান বাঙালী ছিলেন নিঃসন্দেহেই, কিন্তু এই রচনাগুলি তিনি যে বাংলায় লিখেছিলেন সে সম্পর্কে সন্দেহের কারণ আছে। তিব্বতী অনুবাদ পদ্ধতির সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে, তাঁরা জানেন, অনুবাদের প্রথমে বা শেষে (পুষ্পিকায়) অনুবাদক লিখে জানান যে 'জ্যাগর কেদদ্‌'—অর্থাৎ ভারতীয় ভাষায়। তাই সংস্কৃতে গ্রন্থটির ভারতীয় নাম, তারপরে 'বোই কেদদ্‌' অর্থাৎ তিব্বতী ভাষায় তার অনুবাদ। যেখানে এই বিশিষ্ট রীতিটি অনুপস্থিত, সেখানেই মূল গ্রন্থটি সংস্কৃতে লিখিত কিনা সে সন্দেহ থেকে যায়। কিন্তু শাস্ত্রী মহাশয় দীপংকরের সে তিনটি রচনার উল্লেখ করেছেন, সেখানে এই রীতি লঙ্ঘিত হয় নি, গ্রন্থারম্ভে ও গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় গ্রন্থগুলির সংস্কৃত নাম দেওয়া হয়েছে, আর অনুবাদে দেখা গেছে সে এইগুলি বিশুদ্ধ মহাযান মতের রচনা ছাড়া অন্য কিছু নয়।[১৫]

চর্যার রাগরাগিণী

চর্যার রাগরাগিণী প্রসঙ্গেও এখানে সামান্য কিছু বলা দরকার। প্রাচীন বাংলা ভাষায় সিদ্ধদের রচিত গানের মধ্যে যে অংশ উদ্ধার করা গেছে তার রাগরাগিণী নিয়ে গবেষকরা আলোচনা করেছেন। এ প্রসঙ্গে "সঙ্গীত পারিজাত", "ভারতীয় সঙ্গীতের ইতিহাস" বিশেষ করে ত্রয়োদশ শতকে শার্ঙ্গদেবের রচনা "সঙ্গীত রত্নাকরে" বহু তথ্য পাওয়া যায়। গ্রন্থটির ইংরেজি ও বাংলা অনুবাদ হয়েছে।

এ ছাড়াও আলোচনা করেছেন স্বামী প্রজ্ঞানানন্দ তাঁর গ্রন্থ *A History of Indian Music*-এ (Role of Bengal in the domain of Music)।

লণ্ডন স্কুল অভ্‌ ওরিয়েণ্টাল এ্যাণ্ড আফ্রিকান স্টাডিজ-এর অধ্যাপক আর্নল্ড বাকে নেপালে মোট বাইশটি গানের সন্ধান পান। শশিভূষণ দাশগুপ্ত লণ্ডনে সেই গানগুলি শোনেন, চর্যাপদের সঙ্গে এই গানগুলির সাদৃশ্য দেখে তিনি নিজে আবার নেপালে গিয়ে মোট আটানব্বইটি গান সংগ্রহ করেন। অধ্যাপক বাকে-র সংগৃহীত

একটি গানের অনুরূপ গান পরবর্তী কালে নীলরতন সেনের *Early Eastern NIA Versification* গ্রন্থেও স্থান পেয়েছে।

তেঙ্গুর সংকলনে কাণেরিগীতিকা, কাহ্নপাদগীতিকা, মাতৃচেটগীতিকা, নাড়পাদ-গীতিকা, লূইপাদগীতিকা, ডোম্বিগীতিকা, বিরূপাগীতিকা, কম্বলগীতিকা ইত্যাদি নামে বহু-সংখ্যক হ্রস্বদীর্ঘ গীতিকা তিব্বতী অনুবাদে সংরক্ষিত হয়েছে। কিন্তু চর্যাগানের সঙ্গে এগুলির বিশেষ পার্থক্য আছে। চর্যাগানগুলি বেশির ভাগই পরিমিত পঙ্‌ক্তিতে বাঁধা। 'বৌদ্ধগান ও দোহা'র ছেচল্লিশটি গানের মধ্যে চল্লিশটি গানই দশ পংক্তির।

সংগীতবিদ্‌দের বিচারে চর্যার গানগুলির অধিকাংশেই দেশীয় রাগরাগিণীর সুর দেওয়া হয়েছে। চর্যার অধিকাংশ গানে টীকাকারের নির্দেশ 'গৌড় রাগে গেয়'। কেউ কেউ সন্দেহ প্রকাশ করেছেন যে চর্যারচয়িতারা রাগরাগিণী নিয়ে বিশেষ মাথা ঘামান নি। যেমন প্রথম ও সাতচল্লিশ সংখ্যক চর্যায় কোন্ রাগে গাইতে হবে, তার নির্দেশ নেই। চর্যার যে পুঁথিটি পাওয়া গেছে, তাও সংকলন। টীকায়ও পুঁথিটিতে রাগরাগিণীর নির্দেশ বলে সেখানে যা আছে তা সম্ভবত টীকাকারদেরই সংযোজন। পরবর্তী যুগের বাংলা কাব্য ও সঙ্গীতের ধারায়—গীতগোবিন্দ, শ্রীকৃষ্ণকীর্তন, বৈষ্ণব পদাবলী, লোকসংগীত ও বাউলগান—চর্যাগানের প্রভাবে কতটা প্রভাবিত হয়েছে, তা স্বতন্ত্র গবেষণার বিষয়।

কালপরিচয় বা সময়সীমা

'চর্যাগীতিকোষ', 'চতুরশীতি-সিদ্ধপ্রবৃত্তি' ও অন্য তিব্বতী সূত্রে লূইপাকে প্রথম সিদ্ধ বলা হয়েছে ; রাহুল সাংকৃত্যায়ন কিন্তু সরহকে আদি সিদ্ধ বলেছেন।

সরহ আদি সিদ্ধ কি না এ নিয়ে মতভেদ থাকলেও, সিদ্ধদের মধ্যে তাঁর সমধিক প্রসিদ্ধি নিয়ে সন্দেহ নেই ; বিভিন্ন আলোচনায় তার পরিচয় পাওয়া যায়।

দশম খ্রীস্টাব্দেই যে সরহ দেশবিদেশে অসাধারণ খ্যাতি অর্জন করেছিলেন এ পরিচয় আমরা আগেই পেয়েছি। তাছাড়া কর্ম-ঠিনলেপা বলছেন, 'মধ্য তিব্বতের ঙারিতে পৌঁছে অতীশ সেখানে সরহর দোহা প্রচার শুরু করলেন ; যখন তিনি সরহর দোহা তর্জমা করে 'যজ্ঞাগ্নির বা কী প্রয়োজন ? কী প্রয়োজন নৈবেদ্যের ?'—

এইসব বলতে লাগলেন, তখন শিষ্য ডোম-তোনপা তাঁকে নিরস্ত করলেন। অতীশ এতে খুব খুশি হন নি।'[২০] যাই হোক, ঘটনাটি ভূমিকায় একবার বললেও অতীশের জীবদ্দশাতেই (A.D. 982—1054) যে সরহ প্রাচ্যের বিদ্বজ্জন-সমাজে কতটা প্রাধান্য পেয়েছিলেন, সে কথা বোঝাবার জন্যই এই প্রসঙ্গের পুনরুল্লেখ।

সিদ্ধদের কালনির্ণয় একটি বিশেষ জটিল সমস্যা, সন্দেহ নেই। লূইপা, নারোপা তিলোপা, জালন্ধরপা, দারিকপা প্রভৃতির কাল নির্ণয়ের প্রচেষ্টা দেশবিদেশের বহু গ্রন্থে পাওয়া যায়। সে বিষয়ে বিস্তৃত উল্লেখের সুযোগ বা স্থান আমাদের বর্তমান আলোচনায় নেই। আমরা তাই শুধু কয়েকজন প্রখ্যাত পণ্ডিতের মতামত এখানে উপস্থিত করছি :

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মতে সিদ্ধদের আবির্ভাবকাল 950—1100.[২১]

প্রবোধচন্দ্র বাগচীর মতে, দশম থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দ।[২২]

মুহম্মদ শহীদুল্লাহও সরহ, তিলোপা, নারোপা ইত্যাদি সিদ্ধদের কালনির্দেশ করেছেন।[২৩]

ধর্মবীর ভারতী[২৪] এ বিষয়ে বিভিন্ন পণ্ডিতের মতামত অনুসরণ করে সিদ্ধদের আনুমানিক কালনির্ণয় করেছেন : সরহপা, লূইপা প্রভৃতি সমকালীন সিদ্ধগণ 800—875.

মৎস্যেন্দ্র প্রভৃতি সিদ্ধগণ 875—925.

গোরখ, জালন্ধর কাহ্নপা প্রভৃতি 925—1000.

তিলোপা, নারোপা, মৈত্রীপা প্রভৃতি 1000—1100.

সিদ্ধদের কালনির্ণয়ের প্রয়াস করেছেন তিব্বতের খ্যাত-অখ্যাত বহু ঐতিহাসিক। এঁদের মধ্যে বু-তোন রিনৃছেন ডুপ, গোয় লোচাবা শোন নু পাল, জোনাং তারনাথ কুনগাঞিনপো, সুমপা খেনপো এশে পালজোর—এই চারজন ঐতিহাসিক সর্বপ্রসিদ্ধ। এখানে স্থানাভাবে এঁদের মতামত উদ্ধৃত করা সম্ভব নয়, সুযোগ পেলে গ্রন্থান্তরে সিদ্ধদের কালনির্ণয় প্রসঙ্গটি বিস্তৃতভাবে আলোচনার প্রয়াস করবো।

দক্ষিণ ভারতে সিদ্ধ আন্দোলন

সিদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে দক্ষিণ ভারতের কথা বাদ দেওয়া যায় না। 'চতুরশীতি-

সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-তেই বলা হয়েছে, লুইপা ও শান্তিপা রামেশ্বর গেলেন, বিরূপা দক্ষিণ ভারত থেকে পূর্ব ভারতে এলেন, লীলপা দক্ষিণ দেশে যাত্রা করলেন, ইত্যাদি।

তাছাড়া অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে দক্ষিণ ভারতে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রভাব আজো বিলুপ্ত হয়নি। বিশেষ করে এই কথাটি মনে রেখে জনৈক আধুনিক গবেষক মন্তব্য করছেন :

> The Siddhas of Tamilnadu are certainly not an isolated and unique body of freethinkers, but an integral part of a pan-Indian tradition.[25]

কাল-বিচারের দিক থেকে একটা ধারাবাহিকতা অনুমানেরও সুযোগ আছে।

উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধ আন্দোলনের সবচেয়ে গৌরবময় যুগ আনুমানিক অষ্টম থেকে দ্বাদশ খ্রীস্টাব্দ, দক্ষিণ ভারতে প্রখ্যাত তামিল সিদ্ধদের কাল দশম থেকে পঞ্চদশ খ্রীস্টাব্দ। তবে এখনও তামিলনাদে সিদ্ধদের যথেষ্ট প্রভাব আছে। উত্তর-পূর্ব ভারতেও নামান্তরের আড়ালে তা আছে কী না, এ প্রশ্ন হয়তো অবান্তর হবে না। অন্তত একটি বিষয়ে কোন সন্দেহের অবকাশ নেই। দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধদের মধ্যেও সামাজিক ও মতাদর্শগত বিপ্লবী মনোভাব অস্পষ্ট নয় :

> The two most typical features of the religious conceptions of the Tamil Siddhas are anti-ritualism, the denial of current religious practices, and the denial of *bhakti*...
>
> The anti-ceremonial, anti-ritual tone of the Tamil Siddha texts is universal, very strong and the first feature to strike us when we read them...[26]
>
> If there is one feature which is truly common to all Tamil Siddha poets irrespective of other possible differences, it is their radical social attitude. All Tamil Siddha poets raise a protest against caste and casteism. This is an extremely important and relevant feature ; however it should not be misinterpreted. The Siddhas were not social revolutionaries, aiming at a radical structural change of the Hindu society. They disregarded, ignored and despised the social fabrics of their times, and some

of them, for instance, Pattirakiri, dreamt of a future age when there would be no caste.[27]

তামিলনাদে কয়েক শতক আগের এক প্রাচীন মহিলা কবি বলেছেন, মানুষের মধ্যে দুটি মাত্র জাতি আছে—মহৎ বা উদার এবং নীচ বা অনুদার।

সিদ্ধ শিববাক্কিয়ার বলেন, 'দেবতা কি পাথরে আছে?…মন্দিরই বা কী? অবগাহনের সরোবরই বা কী? মূর্খরা পূজা করে মন্দিরে, সরোবরে। কিন্তু চিত্তেই আছে দেবালয়, চিত্তেই আছে সরোবর।'

সরহের প্রবল প্রতিবাদের কণ্ঠই কি ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে ওঠে না এই উক্তির মধ্যে?

প্রসঙ্গত বলা যায় যে আজকের কর্ণাটকেও সিদ্ধদের পরিচয় পাওয়া যায়। উত্তর কর্ণাটকের একটি জেলায় স্থড়াগাড়ু সিদ্ধদের বাস। এই সিদ্ধরা ভিক্ষা করে, শ্মশানে ডোমের কাজ করে, দুচার জন চাষবাস করে, লেখাপড়ার সঙ্গে তাদের সম্পর্ক নেই বললেই চলে।

দক্ষিণ ভারতের ঐতিহ্য অনুসারে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রধান নায়ক বলতে পঁচিশ জন। তাঁদের একটি তালিকা এখানে দেওয়া হলো। এই তালিকা থেকেই দেখা যাবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের মতো এঁদের অধিকাংশই সমাজে হীনবৃত্তির মানুষ। তবে বিশেষ চিত্তাকর্ষক বিষয় এই যে এই তালিকার পঁচিশ জন সিদ্ধের মধ্যে তিনজন চীনা, দুজন সিংহলী ও একজন এমনকি মিশর দেশের বলে উল্লিখিত।

তামিল সিদ্ধদের তালিকা

নাম	জাতি ও বৃত্তি	বাসস্থান
১। অকত্যীয় (অগস্ত্য)	কৃষিজীবী	অনন্তচয়নম্
২। অকপ্পেই	কৃষিজীবী	অলকরমালাই
৩। অড়কান্নর	চীনাত্তু আচারি (অর্থাৎ চীনদেশ থেকে আগত গুরু)	অলকরমালাই
৪। ইটাইক্কটর্	পশুপালক	তিরুবন্নামলই

৫। কমলমুনি	মন্দিরে ঢাকী	তিরুভারু
৬। করুউরর	কারিগর	কারুব্দ
৭। কলিঙ্কিনাটর্	চীনাত্তু আচরী (অর্থাৎ চীনদেশ থেকে আগত গুরু)	কাঞ্চীপুরম্
৮। কুটম্পায়ী	পশুপালক	মায়ুর্ম্
৯। কঙ্কানর্	কানাড়ার পশুপালক	তিরুপতি
১০। কোরক্কর্	দস্যু	পেরুর (কোবাই)
১১। চট্টেনাটর্	সিংহলী	তিরুবরংকম্
১২। চুন্তরনানন্তর্	কৃষিজীবী	মার্তুন্নই
১৩। ধন্বন্তরী	ব্রাহ্মণ পুরোহিত	বৈত্‌তিমারর কোয়িল
১৪। তিরুমূলর্	কৃষিজীবী	তিল্লাই চিতাম্পরম্ (চিদাম্বরম্ ?)
১৫। তেরাইয়র্	ব্রাহ্মণ	পোতিকাইমলাই
১৬। নান্তি	ব্রাহ্মণ	কাশী (বারাণসী)
১৭। পতঞ্চলীয়র্	দস্যু	রাজেশ্বরম্
১৮। পামপট্টি	উত্তর ভারতীয়	ভিরুত্তাচলম্
১৯। পুণ্যটীচর্	কানাড়া পশুপালক	নাংকুনেরি
২০। পুলস্তিয়র্	সিংহলী	ইয়ালাপপানম্
২১। পুনাইক্কর্	মিশর দেশের	মিশর
২২। পোকর্	চীনদেশের কুমোর	পলনি
২৩। মচ্ছমুনি	ধীবর	তিরুপপরংকুংরম্
২৪। বামতেবর্	বেদজ্ঞ গুরু	অলকরমলাই
২৫। ওয়ান্তমীকর্	শিকারী ব্যাধ	এট্টিককুটি

তবে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের রচনায় প্রচুর বৌদ্ধ ধারণা ও শব্দ পাওয়া যায়, কিন্তু তামিল সিদ্ধদের রচনায় পাওয়া যায় শৈবধর্মের বিভিন্ন শব্দ বা পদ। এর কারণ কী ?

এ প্রশ্নের উত্তর খুব কঠিন নয়। বৌদ্ধধর্মের ক্রমপরিবর্তনের শেষ পর্যায়ে উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের আবির্ভাব ; বজ্রযান, মন্ত্রযান, কালচক্রযান, সহজযান যে নামেই সেই যুগের বৌদ্ধধর্মকে অভিহিত করা হোক না কেন, পরিবেশ ও সময়ের প্রভাব সমসাময়িক সিদ্ধদের চিন্তাভাবনায় সংক্রামিত হতে বাধ্য। তাই তাঁদের

রচনায় সুপরিচিত বৌদ্ধ শব্দগুলির অনুপ্রবেশ ঘটেছে, বহুক্ষেত্রে তাঁদের অজ্ঞাতসারে বিপরীতধর্মী মানসিকতা সিদ্ধদের রচনায় আরোপিত হয়েছে। একই ঘটনা ঘটেছে দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধদের ক্ষেত্রেও; কিন্তু সেখানে বৌদ্ধ নয়, শৈবধর্মের প্রাধান্যের ফলে তামিল সিদ্ধদের অগ্রগণ্য সিদ্ধ শিববাক্কিয়ার 'নমোশিবায়ম্' লিখেছেন। শৈবধর্মের গোঁড়া ভক্তরা কিন্তু এই স্তুতিবচনে ভোলেন নি, তাঁরা শিববাক্কিয়ার বা অন্য সিদ্ধদের লেখা যা কিছু পেয়েছেন, প্রচণ্ড বিদ্বেষে সেগুলিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজে পুড়িয়ে নষ্ট করেছেন।

উত্তর-পূর্ব ভারতে সিদ্ধদের রচনাবলীকে এভাবে ধ্বংস করবার চেষ্টা হয়েছিল কিনা আমরা সঠিক জানি না। কিন্তু বিকৃত, অবক্ষয়িত বৌদ্ধধর্ম সিদ্ধমতবাদকে আচ্ছন্ন ও আত্মসাৎ করবার যে প্রাণপণ চেষ্টা করেছে, সিদ্ধদের নামে প্রচারিত রচনাবলীতে তার ভূরি ভূরি প্রমাণ আছে।

তবে কোন্ মতাদর্শের ভিত্তিতে পূর্ব ও দক্ষিণ ভারতের সিদ্ধরা সমাজচেতনায় এক বিশাল পরিবর্তনের সূচনা করেছিলেন, জনগণের ভাষায় সাহিত্য সৃষ্টি করেছিলেন, অত্যাচারিত জনমানসে শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে সংগ্রামে সংঘবদ্ধ হবার প্রেরণা দিয়েছিলেন? এবারে তার মূল অনুসন্ধান করা যাক।

সর্বভারতীয় এই ব্যাপক আন্দোলনের মৌলিক উপাদানগুলি এখানে সংক্ষেপে একত্র করা হলো:

১। প্রচলিত কঠোর সামাজিক অনুশাসন ও জাতিবৈষম্যের বিরুদ্ধতা

২। ধর্মীয় আচার অনুষ্ঠান, মন্ত্রতন্ত্র, যাগযজ্ঞ বর্জন

৩। ধর্মশাস্ত্রে যে সব বৃত্তি নিন্দনীয় সেই সব বৃত্তির নিম্নশ্রেণীর মানুষেরাই সমাজের নেতা হচ্ছেন—যেমন উত্তর-পূর্ব ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের নেতৃস্থানীয় সিদ্ধদের মধ্যে জেলে-জোলা-চাষী-তাঁতী-ব্যাধ ইত্যাদি

৪। কাম সাধনা ও আনুষঙ্গিক গান ইত্যাদিকে প্রশ্রয় দান

৫। মাদকদ্রব্যাদির যথেচ্ছ ব্যবহার—পূর্ব ভারতে মদ ও দক্ষিণ ভারতে আফিং-এর প্রাচুর্য

৬। ঈশ্বরের চরণে প্রার্থনা-আবেদন-নিবেদন নয়, দৈহিক প্রক্রিয়ার মধ্য দিয়েই—নরনারীর মিলনের মধ্য দিয়ে—দেহমনের অলৌকিক ক্ষমতা ও অমরত্ব প্রাপ্তি। এ যোগকে পতঞ্জলির যোগ বা যোগাচারীদের যোগের সঙ্গে কোনও মতেই এক পর্যায়ে ফেলা যাবে না।

সিদ্ধদের জীবনের পরিণতিও কিন্তু বেশ কৌতূহলজনক। মোক্ষ, মুক্তি, নির্বাণ

এঁরা কেউই চান নি, জীর্ণবাসের মতো পার্থিব এই দেহকে ত্যাগ করে চলে যাবার কথাও এঁরা কেউ ভাবেন নি। তাই তাঁরা প্রায় সবাই অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের শেষে সশরীরে খসর্পণ (বৌদ্ধমতে স্বর্গবিশেষ) বা খেচরে গেছেন, আর এখানে তাঁদের কাহিনীও শেষ হয়েছে।

অবশ্যই তাঁদের বাণীতে অনেক সময় গূঢ় রহস্য, বা চলতি কথায় আজকাল আমরা যাকে বলি mysticism, তার সন্ধান পাওয়া যায়। কিন্তু মনে রাখতে হবে, বিশেষত মধ্যযুগে কৃষক আন্দোলনের পটভূমিতে এই মিষ্টিসিজম-এরও একটা বিশেষ ভূমিকা থাকাই স্বাভাবিক। এঙ্গেলস (F. Engels) যেমন বলেছেন,[২৬]

> Revolutionary opposition to feudalism lasted throughout the middle ages. It took the shape of mysticism, open heresy or armed insurrection, all depending on the conditions of the time. As for mysticism, it is well-known how much the sixteenth century reformers depended on it.

ষোড়শ শতকের ইউরোপের কৃষক বিদ্রোহ সম্পর্কে এঙ্গেলস এ উক্তি করেছেন; মধ্যযুগের ভারতবর্ষে অষ্টম থেকে থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে সিদ্ধদের মতাদর্শ সে যুগের কোন কৃষক-বিপ্লবের প্রেরণা দিয়েছিল কিনা, এ বিচার ভবিষ্যতের গবেষণার বিষয়।

পরিশেষে আরও একটি প্রশ্ন উত্থাপনের প্রলোভন হয়। সিদ্ধদের দৈহিক অমরত্ব লাভের আকাঙ্ক্ষার সঙ্গে চীন দেশের 'তাও' মতবাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখা যায়। 'তাও'-ধর্মীদের অমরত্বলাভের প্রসঙ্গে বলা হয়েছে[২৭] :

> Immortality is a matter that has concerned the Taoists for more than two thousand years....the ultimate aim of which is to be "wafted up into heaven into broad daylight"...Taoist conceives of immortality in the Inner Elixir or *mei-tan*...which can be met in the present life...
>
> Taoist alchemy does not present a doctrine of universal salvation ; each person must obtain salvation through his own efforts towards realising immortality. It is the individual's responsibility to seek out a master from whom he may receive

explanations of and initiation into the obscure doctrines of the ancient canons.

চীনের এই 'তাও' ধর্মের বৈপ্লবিক ভূমিকার কথা জোসেফ নীড্‌হাম (Joseph Needham) তাঁর গ্রন্থে বিস্তৃতভাবে আলোচনা করেছেন।[৪০] প্রসঙ্গত দক্ষিণ ভারতে সিদ্ধদের তালিকায় তিনজন চীনা সিদ্ধর অন্তর্ভুক্তি, উত্তর-পূর্ব ভারতের সিদ্ধদের যোগী বা ডাকিনীর কাছে দীক্ষা ও উপদেশ গ্রহণ, রসায়ন-সিদ্ধি, কর্মাবসানে সশরীরে খসর্পণে (স্বর্গ বিশেষ) যাত্রা প্রভৃতি চীনের 'তাও' ধর্মের সঙ্গে ভারতের সিদ্ধ মতাদর্শের সাদৃশ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয় না কি ? এ বিষয়ে পূর্ণতর গবেষণা হলে হয়তো সিদ্ধ আন্দোলনের উপরে ভবিষ্যতে নূতন আলোকপাত সম্ভব হবে।

কলকাতা

অলকা চট্টোপাধ্যায়

ভূমিকার পাদটীকা

1. Roerich G. N., *The Blue Annals*, Calcutta 1949, pp. 843-845.
2. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, দোহাকোষ (হিন্দী), পাটনা 1957, p. 26.
3. তেঙ্গুরে তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত এই গ্রন্থটির প্রথম স্তবকটি অন্যান্য অনুবাদকরা বাদ দিয়েছেন।
4. Bagchi P. C., *Indological Studies*, Visvabharati 1982, p. 70.
5. পরিশিষ্ট দ্রষ্টব্য।
6. Chatterjee S. K., *ODBL* I, pp. 115-62 দ্রষ্টব্য।
7. *Indian Historical Quarterly*, Vol IV. Calcutta 1928, pp. 287-296.
8. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ, 1) *Les chants Mystique*, Paris 1928, pp. 33-35.
   2) *Buddhist Mystic Songs*, Dacca 1960, p. 3.
9. প্রবোধচন্দ্র বাগচী, "Some Aspects of the Buddhist Mysticism of Bengal" *The Cultural Heritage of India*, Vol 1. 1937, pp. 310-13. প্রবোধচন্দ্র বাগচী ও শান্তিভিক্ষু শাস্ত্রী 'চর্যাগীতিকোষ', শান্তিনিকেতন 1956, Preface, pp. xii-xiii.
10. সুকুমার সেন, *Indian Linguistics*, Vol IX-X 1944-1948 pp. 30-133.
11. শশিভূষণ দাশগুপ্ত, *Obscure Religious Cults*, Calcutta 1946 3rd Rev. Ed. 1969, pp. 3-5.
12. মণীন্দ্রমোহন বসু, চর্যাপদ, কলকাতা 1965, ভূমিকা, পৃ. ৪/০
13. D. Snellgrove, *The Hevajratantra*, Pt. II. p. 97 ; ib. pt IX p. 99.
14. Per Kvaerne, *An Anthology of Buddhist Tantrik Songs*, Oslo 1977, pp. 37-60.
15. রাহুল সাংকৃত্যায়ন, পুরাতত্ত্ব নিবন্ধাবলী, প্রয়াগ 1937, পৃ. ১৬৭।
    Subhadra Jha, *The Foundation of the Maithili Language*, London 1958, pp. 32-36.
    ধর্মবীর ভারতী, সিদ্ধ-সাহিত্য, প্রয়াগ 1955.
16. রায়বাহাদুর অতিবল্লভ মহান্তি, উৎকল সাহিত্যকা সংক্ষিপ্ত ইতিহাস, পাটনা 1951, p. 3. মায়াধর মানসিংহ, *History of Oriya Literature*, New Delhi 1962, ch. IV.

17. S. K. Chatterjee, *op. cit.*, pp. 67-68.

18. 'বৌদ্ধগান ও দোহা', পৃ. ২২ ।

19. Chattopadhyaya Alaka, *Atisa and Tibet*, Calcutta 1967, pp. 505 ff.

20. Guenther H. V., *The Royal Songs of Saraha*, London 1969, pp. 15-16.

21. Chatterjee S. K, *History of Bengal*, vol. I Dacca. 1943, p. 384; cf. *ODBL* I, p. 123.

22. Bagchi P. C. *op. cit.*, p. 71.

23. Shahidullah M. *Les chants Mystiques de Kanha et de Saraha*, Paris 1928, pp. 25 ff. Cf. *Buddhist Mystic Songs*, Dacca 1960, pp. iii-ix.

24. Bharati Dharmavir, *Siddha Sahitya* (Hindi), Allahabad 1955, p. 45.

25. Kamil V. Zvelebil, *The Poets of the Powers*, London 1973, p. 24.

26. *ib.* p. 63.

27. *ib.* p. 69.

28. Engels Fredrick : *The Peasant War in Germany*, Moscow 1957 ed, p. 98.

29. Michael Saso and David W. Chappell Ed, *Buddhist and Taoist Studies*, University of Hawaii 1977, p. 55.

30. Needham Joseph, *The Grand Titration*, London 1969, pp. 20 ff. *Science and Civilisation in China*, vol. 2, Cambridge, 1965, pp. 33 ff.

ভূমিকার উত্তরকথন

সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত বিপ্লব

সিদ্ধ আন্দোলন প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন বারবার আমার মনে উঠেছে। লেখিকা ও প্রকাশক উভয়ের বিচারেই এই ভূমিকার সঙ্গে আমার প্রশ্নটা সংযোজন করা অপ্রাসঙ্গিক হবে না। অবশ্যই আমার প্রশ্নর দায়দায়িত্ব একান্তই আমার। লেখিকার নয়।

আমার প্রশ্ন : সিদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে কৈবর্ত বিপ্লবের কোনো সম্পর্ক-সন্ধান কি একান্তই অবান্তর হবে ? উভয়ের মধ্যে দেশ-কালের একটা সান্নিধ্য রয়েছে : দেশের যে-অঞ্চলে এবং যে-যুগে সিদ্ধ আন্দোলন বিস্তৃতি লাভ করেছিলো মোটের উপর সেই অঞ্চলেই এবং সেই যুগের স্বল্প ব্যবধানে ঘটেছিলো কৈবর্ত বিপ্লব। কিন্তু শুধু এইটুকুর নজির থেকে উভয়ের মধ্যে সম্পর্ক খুঁজতে যাওয়া কাকতালীয়তার মতো শোনাবে। তবুও প্রশ্নটা একেবারে অবান্তর বলে বিবেচনা করার বিরুদ্ধে অন্য একটা কারণ আছে। সংক্ষেপে বলতে পারি, মতাদর্শগত কারণ। একটা বিরাট গণ-অভ্যুত্থানের জন্যে মতাদর্শরও জমি তৈরি হওয়ার কথা। সিদ্ধদের আন্দোলন প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে এবং হয়তো দীর্ঘদিন ধরে এ জাতীয় কোনো জমি প্রস্তুত করেছিলো কিনা—সে-জিজ্ঞাসা কি একান্তই অবান্তর হবে ?

প্রথমে কৈবর্ত বিপ্লব প্রসঙ্গে কয়েকটি প্রাথমিক কথা বলে নেওয়া যাক। হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'রামচরিত' বলে বইটি আবিষ্কার ও সম্পাদনা করবার পর দেশের ঐতিহাসিক মহলের বেশ কিছুটা টনক নড়েছিলো। মানতেই হলো, পাল-আমলের শেষাশেষি, একাদশ শতকে, সেকালের বৃহৎবঙ্গে রীতিমতো বড়ো রকমের একটা প্রজাবিপ্লব ঘটেছিলো। তার পুরোধায় যাঁরা ছিলেন সাধারণভাবে তাঁদের নাম কৈবর্ত। এই কারণে ইতিহাসের বইতে ঘটনাটির নাম কৈবর্ত বিপ্লব। এখনো

বিশেষত উত্তরবঙ্গে কৈবর্ত জাতি বা উপজাতি বিলুপ্ত হয়নি। জীবিকাবৃত্তির দিক থেকে আজ তাঁরা প্রধানত কৃষক ও জেলে হলেও অন্তত একাদশ শতকের বিপ্লবের পরিধি ও শক্তি থেকে অনুমান হয় যে সেকালের প্রায় সব রকম তথাকথিত নীচু শ্রেণীর মানুষ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তাই গণবিপ্লব শব্দটা আজ অনেকের কাছে অপ্রীতিকর হলেও কৈবর্ত অভ্যুত্থানের অন্য বর্ণনা অবান্তর হবার আশঙ্কা।

সেকালের বৃহৎবঙ্গে পাল রাজবংশের দাপট অবশ্যই সুবিদিত। বিরাট সেনাবাহিনী বাদ দিয়ে অমন দাপটের ব্যাখ্যা খোঁজা নিষ্ফল। 'রামচরিত'-এর লেখক সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্যই রাজবংশের অভ্যন্তরীণ বিবাদের কথা তুলেছেন। রাজা বিগ্রহপালের তিন ছেলে। তার মধ্যে (দ্বিতীয়) মহীপাল বাকি দু'ভাইকে—স্থরপাল আর রামপালকে—বন্দী করে রাজশক্তি দখল করেছিলেন। রাজশক্তি দখল নিয়ে এ জাতীয় প্রাসাদ-কলহে বিস্ময়ের কারণ নেই। ক্ষমতা দখলের এরকম নজির দেশবিদেশের ইতিহাসে দেদার রয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের কারণটা অন্যত্র। গণ-অভ্যুত্থানের শক্তি। সে শক্তি এমনই প্রবল যে মহীপালের বিশাল সৈন্যবাহিনীও তার চোট সামলাতে পারলো না; বিদ্রোহীদের তীর-ধনুক বর্শা-বল্লমের খোঁচায় ছত্রভঙ্গ হলো এবং স্বয়ং মহীপালও পার পেলেন না। প্রজাদের হাতে নিহত হলেন।

সন্ধ্যাকর নন্দী অবশ্য সাঁটে বলেছেন, এভাবে মার খাওয়াটার আসল কারণ মহীপালের নির্বুদ্ধিতা, হঠকারিতা আর অপটুতা। এ জাতীয় সহজ-সরল ব্যাখ্যাতেই যাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে চান, তাঁরা থাকুন। অন্যরা কিন্তু গণবিপ্লবের শক্তিটা আরো স্পষ্টভাবে বুঝতে চাইবেন। সন্ধ্যাকর নন্দীরই অন্যান্য বিবরণ থেকে তা আঁচ করা কঠিন নয়। তাঁর প্রধান বক্তব্য, মহীপালের পর রামপাল শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহটা দমন করেন। কিন্তু রামপাল বুঝেছিলেন, শুধুমাত্র পাল রাজাদের সেনাবাহিনীর পক্ষে তা সম্ভব নয়। তাই নানা দুর্গম পথ ঘুরে তিনি আরো অন্তত ডজন দেড়েক ছোটো বড়ো বিভিন্ন রাজা ও সামন্তদের সহায়-সাহায্য সংগঠিত করেন এবং শেষ পর্যন্ত এদেরই মিলিত চেষ্টায় বিদ্রোহ দমন করেন। এর থেকে বিদ্রোহের শক্তিটা অনুমান করা যায়। ভারতীয় ইতিহাসে এমন বিরাট গণবিপ্লবের নজির অবশ্যই বেশ কিছুটা বিস্ময়কর।

এই প্রাথমিক কথাটা মনে রেখে আমার মূল জিজ্ঞাসার দিকে এগুবার চেষ্টা করবো। কোনো দেশে কোনো কালে এ জাতীয় বড়ো রকম গণবিপ্লবের কথা

ভাবতে গেলে মতাদর্শ প্রসঙ্গে একটা প্রশ্ন না-তুলে পারি না। কেননা, দেশ-বিদেশের ইতিহাসে অজস্র নিদর্শন আছে যে গণবিপ্লবের একটা প্রতিষেধক বলতে মতাদর্শ—অবশ্যই এমন মতাদর্শ যা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে শাসক সম্প্রদায়ের নিরাপত্তার সহায়ক হতে পারে। কিংবা, কথাটা একটু ঘুরিয়ে বললে বোধহয় বুঝতে সুবিধে হবে। সমাজে যে-মানুষদের উপর শ্রমের প্রত্যক্ষ দায়িত্ব—যাঁদের মাথার ঘাম পায়ে না-পড়লে পুরো সমাজব্যবস্থাই অচল হবার কথা—তাঁদের তুলনায় পরশ্রমজীবী শাসক সম্প্রদায়ের মানুষ সংখ্যার বিচারে নগণ্য। তাই সমাজের বৃহত্তম অংশের লোকেরা যাতে মুখ বুঁজে শ্রমের দায়িত্বটা নিতে রাজি থাকেন শাসক-সম্প্রদায়ের পক্ষ থেকে তার অনেক আয়োজন অনিবার্য। লেঠেল থেকে শুরু করে পাইক-পেয়াদা তো বটেই। কিন্তু শুধুমাত্র পাইক-পেয়াদার বাহুবলই পর্যাপ্ত নয়। আরো একটি উপকরণ ইতিহাসে প্রসিদ্ধ। সংকীর্ণ অর্থে তাকে অনেক সময় ধর্মবিশ্বাস আখ্যা দিলেও ব্যাপক অর্থে মতাদর্শগত শক্তি বলায় বাধা নেই। শ্রমিকসাধারণের চেতনায় নানা লাগসই বিশ্বাস গেঁথে দিতে পারলে তারা মোটের উপর মুখ বুঁজেই থাকবে ; বেয়াড়া প্রশ্ন তুলবে না ; নিজেদের উৎপাদনের পুরোটা বা অন্তত প্রধান অংশটার ভাগীদার অপরে কেন হবে—এহেন একান্ত অপ্রীতিকর প্রশ্ন মাথাতেই আসবে না। রাজশক্তির নিরাপত্তার জন্যে তাই সেনাবাহিনী ছাড়াও মতাদর্শগত শক্তির একটা ভূমিকা মানতে হয়, যদিও রাজশক্তির প্রচারকেরা সাধারণত ঐশী অনুমোদনের দোহাই দেখিয়েই মতাদর্শটাকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করার আয়োজন করেন। আমাদের দেশের আইনকারেরা যেমন বলতেন, নিছক দাসত্বের অধিকার ছাড়া শূদ্রদের আর কোনো অধিকার থাকতেই পারে না, কেননা স্বয়ং সৃষ্টিকর্তা ঠিক এই কথাটি মনে রেখেই শূদ্র বলে মানুষগুলো সৃষ্টি করেছিলেন। কথাটাকে আরো একটু পোক্ত করবার জন্যে আমাদের দার্শনিক মহলে অবশ্য কর্মফল নিয়ে ঢালাও আলোচনা আছে। শুধু দাসত্বের অধিকার নিয়ে শূদ্রকুলে যার জন্ম তা তো তারই পূর্বজন্মের কর্মফল : তখন পাপ কাজ করেছিলে, এখন তার মূল্য না চুকিয়ে উপায় কী ? তাই এর জন্যে আর কাউকে দায়ী করতে যেও না। দায়ী বলতে তুমি এবং শুধু তুমিই। কর্মফলের মতো অমন সহজ সরল তত্ত্ব অবশ্য বিদেশের দার্শনিকদের বা আইনকারদের মাথায় আসেনি। কিন্তু আইসোক্রেটিস-প্লেটো-পলিবিয়াস (Isocrates, Plato, Polybius) থেকে শুরু

করে নানা দার্শনিক নানাভাবে শাসনশক্তির সংরক্ষণে মতাদর্শগত হাতিয়ারের উপযোগিতা স্বীকার করতে কুণ্ঠা বোধ করেননি।

পাল রাজাদের মধ্যে ব্যক্তিগতভাবে কে কতোটা সত্যিই ধর্মপ্রাণ ছিলেন তা বিচারের বাস্তব উপকরণ সত্যি বলতে আমাদের জানা নেই। জানা থাকলেও বর্তমান জিজ্ঞাসায় খুব একটা ইতরবিশেষ হতো না। কেননা এটুকু জানা আছে যে বিরাট সৈন্যবাহিনী গড়ে তোলা ছাড়াও তাঁরা মতাদর্শের শক্তিটাকে অবজ্ঞা করেননি। তারই খাতিরে সারা রাজ্য জুড়ে বড়ো বড়ো বিহার, মঠ, মন্দির গড়ে তোলার আয়োজন করেছিলেন এবং তার জন্যে—এবং সেখানকার বাসিন্দা ধর্মপ্রচারকদের সব উপকরণের জন্যে—দেদার খরচ করতে দ্বিধা করেননি। প্রচলিত মতে অবশ্য পাল রাজারা মহাযান বৌদ্ধধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। মহাযানের কয়েকটা মূল কথা বলতে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন (বা প্রাণীমাত্রেরই পরম হিতসাধনের সংকল্প), মহাকরুণাময় অবলোকিতেশ্বরের পূজোপাঠ। অবশ্যই তার সঙ্গে কর্মফলও—যদিও উৎপন্নক্রম, সম্পন্নক্রম প্রভৃতির আলোচনা তুলে মতটা ঢের বেশি জমকালো করবার আয়োজন। তবে পাল রাজারা শুধু বিশুদ্ধ মহাযানেরই সমর্থক ছিলেন কি না—এবিষয়ে ঐতিহাসিক মহলে প্রশ্ন উঠেছে। ওঠবার কথাও। ব্রাহ্মণ্যধর্মের—বিশেষত যাগযজ্ঞের ব্যাপারে—তাঁরা নেহাত উদাসীন ছিলেন না। তারনাথের বর্ণনায় তাই বিক্রমশীল বিহারে "বলি আচার্য", "হোম আচার্য" প্রভৃতির প্রায় রাজকীয় বর্ণনা। এবং তারনাথ ফলাও করেই বলছেন, পাল রাজবংশের পরমায়ু যাতে সুদীর্ঘ হয় এই আশায় স্বয়ং ধর্মপাল এমনই এক বিশাল যজ্ঞের আয়োজন করেন যার জন্যে নিদেনপক্ষে নগদ ন'লক্ষ দু'হাজার রৌপ্যমুদ্রা খরচা হয়। পুরো ব্যাপারটা যাঁরা ধর্মপালের ধর্মপরায়ণতার নিদর্শন বলে প্রমাণ করতে চান তাঁদের সঙ্গে তর্ক তুলে লাভ নেই। আসল উদ্দেশ্যটা যদি পাল রাজবংশের পরমায়ু বাড়াবার কল্পনা না-হতো তাহলে তাঁদের যুক্তি হয়তো তুলনায় নিষ্কণ্টক হতে পারতো।

যাই হোক, একদিকে মহাযানের মর্মার্থ, অপর দিকে জমকালো যাগযজ্ঞের আয়োজন। একদিকে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন, অবলোকিতেশ্বরের মহিমা, উৎপন্নক্রম-সম্পন্নক্রমের বিদগ্ধ পরিভাষায় কর্মফলবাদ ইত্যাদি মহাযান তত্ত্বের প্রচার। অপর দিকে "বলি আচার্য", "হোম আচার্য"—এমনকি প্রায় দশ লাখ নগদ খরচা করে এমনই এক মহাযজ্ঞের আয়োজন যে ভয়ে-ভক্তিতে সাধারণ

মানুষের চিন্তা-চেতনা একেবারে স্তম্ভিত হয়ে থাকার কথা। কিন্তু যাগযজ্ঞের কথাটা না-হয় বাদই দিলাম। মহাযানের মূল তত্ত্বগুলির উপরই দৃষ্টি আবদ্ধ রাখা যাক। মৈত্রী, করুণা, অবলোকিতেশ্বর ইত্যাদি। শুধু ব্যক্তিবিশেষের মুক্তি বা নির্বাণের সাধনা নয়, দুনিয়ার সমস্ত প্রাণীরই মুক্তি। এই মৈত্রী ও করুণা কতোটা গভীর হবার কথা আচার্য অসঙ্গ-র জীবনীপ্রসঙ্গে মহাযানীদের একটা উপাখ্যান থেকেই তা আন্দাজ করা যেতে পারে। একবার নাকি তাঁর চোখে পড়লো, একটা ঘেয়ো কুকুরের গায়ে অনেক পোকা পড়েছে, পোকাগুলো কুকুরটার শরীর থেকেই নিজেদের আহার্য সংগ্রহ করছে। মৈত্রী ও করুণায় বিহ্বল আচার্য অসঙ্গ সমস্যায় পড়লেন : পোকা সাফ করে কুকুরটাকে বাঁচাতে গেলে পোকাগুলোর কী দশা হবে? ওগুলো তো না-খেয়ে মারা পড়বে! কুকুরটাকে বাঁচাতে হবে; পোকাগুলোকেও! তাই করুণাময় আচার্য নিজের শরীর কেটে, কুকুরটার গা থেকে পোকাগুলো তুলে নিজ দেহের ক্ষতস্থানে সযত্নে আশ্রয় দিলেন। মহাকরুণার অবতার অবলোকিতেশ্বর সন্তুষ্ট হলেন। ঘেয়ো কুকুরের প্রতিভাস ছেড়ে আচার্য অসঙ্গর কাছে প্রত্যক্ষদর্শন দিলেন। প্রাণীমাত্রেরই হিতসাধনের আদর্শ প্রচারে এই রকম নানা গালগল্প।

এসবের কথা মনে রাখলে একটা প্রশ্ন উঠতে বাধ্য। জনসাধারণের মনে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন বা জগৎসংসারের সর্বপ্রাণীর মুক্তির সংকল্প গ্রহণ— ইত্যাদির কথা সার্থকভাবে প্রচারিত হলে মোটের উপর পরিস্থিতিটা দাঁড়াবে কী রকম? ওরা তো হাঁটু গেড়ে জোড়হাতে মাথা হেঁট করে মহাকরুণাময় অবলোকিতেশ্বরের কাছে প্রার্থনায় তন্ময় হবে; ওদের চিন্তাচেতনায় আর কোনো জীবনাদর্শেরই জায়গা থাকবে না।

গ্রীক রাজনীতিবিদ্ আইসোক্রেটিস (Isocrates) বলেছিলেন, সাধারণ মানুষের পক্ষে এ-ভাবে মাথা নোয়াতে শেখাটা রীতিমতো কার্যকরী, কেননা মাথা নোয়াতে শেখবার অভ্যাসটা একটু পোক্ত হলে শাসকের পায়েও তাদের পক্ষে মাথা নোয়াবার প্রবণতা থেকে যাবে; মাথা তুলে রুখে দাঁড়ানোর সম্ভাবনাটাই সুদূরপরাহত হবে।

কথাগুলো মনে রেখে পাল-আমলের শেষাশেষি পরিস্থিতিটা ভেবে দেখা যেতে পারে। রাজশক্তির পক্ষ থেকে মৈত্রী, করুণা, বোধিচিত্ত উৎপাদন প্রভৃতি মহাযানী জীবনাদর্শ প্রচারের বিরাট বিপুল আয়োজন। বড়ো বড়ো মঠ মন্দির বিহার সংঘা-

রাম প্রভৃতির ধ্বংসাবশেষ তার সাক্ষী হয়ে রয়েছে। অপর দিকে কিন্তু এক বিরাট গণ-অভ্যুত্থান—এমনই বিশাল তার শক্তি যে প্রথম চোটে রাজশক্তি মার খেলো এবং শেষ পর্যন্ত তা দমন করবার জন্যে পালরাজাদের নিজস্ব সেনাবাহিনীর সাধ্যে কুলোলো না; আশপাশের শাসকশক্তির দ্বারস্থ হতে হলো।

তার মানে, সে-আমলের সাধারণ শ্রমজীবী মানুষ সত্যিই জোড় হাতে অনন্ত করুণার আধার অবলোকিতেশ্বরের পায়ে মাথা কোটেনি; তীর-ধনুক বর্শা বল্লমের দিকে হাত বাড়িয়েছিলো। সন্ধ্যাকর নন্দীর বর্ণনায় কখনো বা মোষের পিঠে চেপে এ-জাতীয় অস্ত্র হাতে নিয়েই রাজসেনার হাতি-ঘোড়ার পালকেও উৎখাত করে ছেড়েছিলো।

তাহলে সোজা কথায় মানতেই হবে যে শাসক-সম্মত মতাদর্শ প্রচারের বহরটা যতো বড়োই হোক না কেন, সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্যে তার মোহ অন্তত স্থায়ী হয়নি। কিন্তু অতো বড়ো একটা গণ-আন্দোলনের পিছনে কোনো রকম পাল্টা মতাদর্শের প্রেরণা ছিলো না—এমনতরো কথা কল্পনা করাও কি সহজসাধ্য? দেশ বিদেশের কৃষক-বিপ্লবের কথা যেটুকু জানা আছে তা থেকে বরং অনুমান হয় যে একটা পাল্টা মতাদর্শের প্রেরণা ছাড়া কায়েমী স্বার্থ-সম্মত মতাদর্শের প্রভাব কাটিয়ে কৃষক-অভ্যুত্থান সম্ভব হয়নি।

বিদেশের ইতিহাসে তার অনেক নজির আছে। দেশের ইতিহাসেও নজির খোঁজা নিষ্ফল হবে না। মৈমনসিংহের কৃষক বিদ্রোহের নায়করা নিজেদের বাউল বলে পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। বাউল নিয়ে অবশ্যই বিস্তর গবেষণা হয়েছে এবং হচ্ছেও। তাই এঁরা কোন্ অর্থে বাউল ছিলেন বর্তমানে সে-প্রশ্নে প্রবেশের অবকাশ আমাদের নেই। কিন্তু যে-অর্থেই হোক-না-কেন, তা যে শাসক-সম্মত কোনো মতাদর্শ হতেই পারে না, কৃষক বিদ্রোহটাই তার চরম প্রমাণ। কিংবা, সাম্প্রতিক কালে বন্ধুবর অমলেন্দু গুহ আসামের কৃষকবিদ্রোহ নিয়ে এক চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখেছেন; পড়ে জানলাম, এই বিদ্রোহের নায়কেরা যে-মতাদর্শ থেকে প্রেরণা পেয়েছিলেন তাকে বৈষ্ণব আখ্যা দিতে চেয়েছিলেন। এখানেও বৈষ্ণব কথাটাকে প্রচলিত প্রেম-ভক্তির মতাদর্শ বলে গ্রহণ করবার সুযোগ নেই। কিন্তু এ-হেন আখ্যা গ্রহণ করবার একটা চিত্তাকর্ষক তাৎপর্য মানতে হবে। বৈপ্লবিক মতও কখনো প্রচলিত ধর্মমতের মুখোস খুঁজতে পারে। মধ্যযুগে য়ুরোপের ছোটো বড়ো প্রায় সব

কৃষি-অভ্যুত্থান খৃস্টধর্মেরই মুখোস পরেছিলো। কিন্তু মুখোসই। খৃস্টধর্মের পাণ্ডা-পুরোহিতের বিচারে তার নায়কেরা কি এদের সত্যিই খৃস্টান বলে মেনেছেন ?

সেকালের বৃহৎবঙ্গে সিদ্ধ বলে যে আন্দোলনের প্রসিদ্ধি তাও মোটের উপর একই ভাবে প্রচলিত বৌদ্ধধর্মের মুখোস খুঁজেছিলো কিনা—এ প্রশ্ন অবান্তর নয়। অন্তত বৌদ্ধধর্ম-সম্মত নানা পারিভাষিক শব্দ এঁদের রচনা ও জীবনী থেকে খুঁজে বের করা কঠিন নয়। কিন্তু স্বীকার করতেই হবে, প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ আচার্যরা যে-অর্থে পারিভাষিক শব্দ নিয়ে দীর্ঘবিস্তৃত দার্শনিক আলোচনা তুলেছেন তা সিদ্ধদের প্রসঙ্গে গ্রহণ করা সহজসাধ্য নয়। ভূমিকায় সরহ-র দোহা থেকে যেটুকু অংশ উদ্ধৃত হয়েছে পাঠকেরা তার উপর চোখ বোলালেই হয়তো কথাটা স্বীকার করবেন, যদি না-অবশ্য তাঁদের মনে এমন সংস্কার বদ্ধমূল হয় যে এই সিদ্ধ আন্দোলনও ভারতে বৌদ্ধধর্মেরই শেষ সংস্করণ। কিন্তু এই সংস্কারের আলোচনায় ফেরবার সুযোগ পরে হবে।

আপাতত আমার মূল জিজ্ঞাসাটা সংক্ষেপে উল্লেখ করার সুযোগ তৈরি হয়েছে।

প্রথমত, পাল আমলের শেষাশেষি সেকালের বৃহৎবঙ্গে এক বিশাল ও পরাক্রম কৃষকবিদ্রোহ বা গণবিদ্রোহ ঘটেছিলো।

দ্বিতীয়ত, সাধারণ সিদ্ধান্ত হিসেবে স্বীকার করার সুযোগ আছে যে এজাতীয় গণ-আন্দোলনের পিছনে একটা মতাদর্শগত শক্তির প্রভাব থাকাই স্বাভাবিক; তা না মেনে দেশ-বিদেশের প্রখ্যাত গণ-অভ্যুত্থানের ব্যাখ্যা খোঁজা কঠিন। এই মতাদর্শ প্রচলিত কোনো ধর্মবিশ্বাসের মুখোস পরতেও পারে; অন্তত মধ্যযুগে তাইই হবার কথা। কিন্তু সেই ধর্মবিশ্বাসের প্রচলিত বিদগ্ধ কোনো সংস্করণ পাল্টা মতাদর্শের প্রকৃত প্রাণবস্তু হওয়া অসম্ভব।

কথা দুটো স্বীকার করলে একটা প্রশ্ন না-উঠে পারে না। কৈবর্ত বিপ্লবের প্রেরণা আমরা কোন্ মতাদর্শের মধ্যে সন্ধানের প্রয়াস করবো ? দেশান্তরের বা কালান্তরের দিকে এগুতে যাওয়া অবশ্যই অবান্তর নয়। তবু আপাতত না-হয় তা না-ই বা করা যাক। পক্ষান্তরে প্রশ্ন হলো : দেশ-কালের মোটামুটি একই পটভূমিতে কি আমরা এমন কোনো মতাদর্শের পরিচয় পাই যার মধ্যে একটা পাল্টা মতের অন্তত আভাস খোঁজার সুযোগ আছে ? আমার মনে হয়েছে যে তা অসম্ভব নয়। একই পাল আমলে দেশের একই অঞ্চলে বাস্তবিকই একটা প্রবল কিন্তু পাল্টা মতাদর্শের

পরিচয় চোখের সামনে রয়েছে। সিদ্ধ আন্দোলন। তাই সিদ্ধ আন্দোলনের সঙ্গে কৈবর্ত বিপ্লবের সম্পর্ক প্রসঙ্গে প্রশ্ন একেবারে অবান্তর হবে না।

নীহাররঞ্জন রায় এবং রামশরণ শর্মার মতো প্রখ্যাত ঐতিহাসিকদের কাছে প্রশ্নটা পেশ করবার সুযোগ ঘটেছিলো। রামশরণবাবুর মন্তব্যটা তুলনায় কিছুটা কট্টর : 'সরাসরি সম্পর্কের কোনো নজির না-দেখানো পর্যন্ত আপনার বক্তব্যে ঐতিহাসিকদের সাড়া পাবেন না।'

যুক্তিটা নিশ্চয়ই ভাবিয়ে তোলে। কিন্তু ভাবতে গিয়ে প্রথম মনে হয়েছে, সরাসরি নজির বলতে ঠিক কী হতে পারে ? কৈবর্ত বিপ্লবের কোনো নায়কের মুখে সিদ্ধবিশেষের নাম বা সিদ্ধ-সম্মত উপদেশ ? এ-হেন নজির খুঁজতে যাবার উপায় নেই। কৈবর্ত বিপ্লব প্রসঙ্গে যেটুকু তথ্য আমাদের অন্তত প্রধানতম সম্বল, তা আসলে চাটু-পটু কবি সন্ধ্যাকর নন্দীর 'রামচরিত'। চাটু-পটু, কেননা রামপালের মাহাত্ম্যবর্ণনই গ্রন্থটির একমাত্র উদ্দেশ্য এবং এই উদ্দেশ্যে লেখক রামপালকে 'রামায়ণ'-এর স্বয়ং রামচন্দ্রের সঙ্গে সমগোত্রীয় করতে চেয়েছিলেন। কবির কাছে রাজা রামপালের প্রধানতম কীর্তি বলতে কৈবর্ত বিপ্লব দমন। এই কারণেই কৈবর্ত বিপ্লবের প্রসঙ্গ। কিন্তু বিপ্লবীদের পক্ষ থেকে কৈবর্ত বিপ্লবের কোনো সংস্করণ বা বিবরণ আমরা পাইনি। পাবার কথাও নয়, আশাও নেই। এবং কৈবর্ত বিপ্লবের কোনো রকম কৈবর্ত-সংস্করণের ঐকান্তিক অভাব থেকেই বোঝা যায় তার নায়কেরা কোন্ মতাদর্শের প্রেরণা পেয়েছিলেন—বা, তাদের বৈপ্লবিক আন্দোলনের পেছনে কোন্ মতাদর্শ প্রত্যক্ষ বা অন্তত পরোক্ষভাবে বৈপ্লবিক চেতনার উপাদান জুগিয়েছিলো—তার সরাসরি কোনো হদিশ খুঁজতে যাওয়া নিষ্ফল।

পক্ষান্তরে, সিদ্ধ আন্দোলনের দৃষ্টিকোণ থেকে কৈবর্ত বিপ্লবের সঙ্গে কোনো সরাসরি সম্পর্কের নজির খুঁজতে যাওয়া অনেকাংশে অবান্তর হবে। কেননা আমাদের যুক্তি নিশ্চয়ই এই নয় যে সিদ্ধদের বৈপ্লবিক ডাকে সাড়া দিয়েই শ্রমজীবীরা বর্শা বল্লম হাতে বিপ্লবে সামিল হয়েছিলেন। আমাদের যুক্তি শুধু এই : কৃষকরা যে মাথা হেঁট করে করজোড়ে অবলোকিতেশ্বরের অপার করুণায় বিহ্বল হয়ে থাকেননি বা রাজশক্তির পক্ষ থেকে প্রচারিত এবং অতএব রাজশক্তি-সম্মত—বিচিত্র মতাদর্শের মোহ কাটিয়ে বিপ্লবের পথে এগুতে পেরেছিলেন—এই পুরো ব্যাপারটা বুঝতে গেলে অন্তত অর্থাপত্তি হিসেবে স্বীকার করা প্রয়োজন যে কোনো এক পাল্টা মতাদর্শ বৈপ্লবিক চেতনার ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিলো। এ কথা না মানলে

বৈপ্লবিক চেতনার ব্যাখ্যা পাওয়া যায় না। যেমন, দিনে না-খেয়েও দেবদত্ত বলে ব্যক্তিটি দিব্যি হৃষ্টপুষ্ট হচ্ছে এজাতীয় ঘটনার ব্যাখ্যা খুঁজতে গেলে মানতে হয় : লোকটি রাতে খায়। অতএব সেকালের কোনো বিরোধী মতাদর্শের রীতিমতো ব্যাপক প্রচার ও প্রভাব স্বীকার করার তাগিদটা থেকেই যায়। এবং সেকালের এ-হেন কোনো ব্যাপক মতাদর্শের সন্ধানে এগুলে সিদ্ধ আন্দোলন ছাড়া আর কোন্ আন্দোলনের কথা ভাববার সুযোগ আছে ?

প্রশ্নটার প্রাসঙ্গিকতা আরো বেড়ে যাবার কারণও আছে। যে-অঞ্চলে এই প্রজাবিদ্রোহ মোটের উপর সেই অঞ্চলেই সিদ্ধ আন্দোলন তুঙ্গে উঠেছিলো। কেননা, দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত সিদ্ধ আন্দোলনের ঢেউ পৌঁছেছিলো এ কথা স্বীকার করলেও অস্বীকার করার উপায় নেই যে উত্তর ভারতের বিশেষত পালশাসনের অন্তর্ভুক্ত অঞ্চলেই সিদ্ধ আন্দোলনের আসল প্রসার ও ব্যাপ্তি।

যতোদূর মনে পড়ে, দেশ-কাল দুদিক থেকেই সিদ্ধ আন্দোলন ও কৈবর্ত বিপ্লবের সান্নিধ্য নীহাররঞ্জনকে বেশ একটু ভাবিয়ে তুলেছিলো। স্বভাবসিদ্ধ উৎসাহ দিয়েই তিনি বলেছিলেন, জিজ্ঞাসাটা যখন জেগেছেই তখন একটু তলিয়ে দেখবার চেষ্টায় বাধা কী ?

আমার ব্যক্তিগত বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে অবশ্যই একটা বড়ো রকমের বাধা ছিলো। ভাষাজ্ঞানের বাধা। কেননা, সিদ্ধ আন্দোলনের পর্যাপ্ত পরিচয় পাবার জন্যে তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত পুঁথিপত্র পড়তে হবে। বাংলায় বা সেকালের বৃহৎ বঙ্গের ভাষায় সংরক্ষিত যতোটুকু উপকরণ তা অবশ্য উপেক্ষণীয় নয়। কিন্তু তিব্বতী ভাষায় সংরক্ষিত উপকরণের তুলনায় তা যৎসামান্য। এই কারণেই স্বয়ং হরপ্রসাদ শাস্ত্রী 'হাজার বছরের পুরাণ বৌদ্ধ গান ও দোহা'-র ভূমিকাতেই বলেছেন, চর্যা গানের পদকর্তা সিদ্ধদের প্রসঙ্গে পর্যাপ্ততর জ্ঞানের জন্যে তিব্বতী চর্চার বিশেষ প্রয়োজন।

অতএব ডক্টর শ্রীমতী অলকা চট্টোপাধ্যায় (আমার স্ত্রী বলেই এবার থেকে নামটা শুধু অলকা বলেই উল্লেখ করবো) যখন 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র মূল তিব্বতী সংস্করণটির একটা অনুলিপি সংগ্রহ করে বাংলা অনুবাদের উৎসাহ দেখালো, তখন আমিও কম উৎসাহিত হইনি। নিজে তিব্বতী ভাষায় অজ্ঞ হলেও তিব্বতী থেকে অনুবাদ নিয়ে অলকার সঙ্গে কাজ করবার অভিজ্ঞতা আমার আছে : ওরা যখন তিব্বতী থেকে তারনাথ রচিত 'ভারতে বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস' ইংরেজিতে

তর্জমা করে তখন নীহাররঞ্জনই তার সম্পাদনার দায়িত্ব আমাকে দিয়েছিলেন। সম্পাদনা প্রসঙ্গে অলকার সঙ্গে কাজ করতে গিয়ে তিব্বতী সাহিত্যের কিছুটা ধারণা হয়েছিলো। প্রতি ছত্রের একেবারে আক্ষরিক অনুবাদ দাবি করেছিলাম, কেননা আমার ধারণায় তা বাদ দিয়ে সম্পাদনার কাজে ফাঁকি থাকবার আশঙ্কা। এবং তখনই দেখেছিলাম, বিশেষত লামা চিম্পার অনুগ্রহে তিব্বতী থেকে আক্ষরিক অনুবাদের দক্ষতা অলকা আয়ত্ত করতে পেরেছে। তাই ওকে বললাম, 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র আক্ষরিক অনুবাদ তৈরি করতে পারলে আমারও একটা জিজ্ঞাসার কিনারা খোঁজার কাজে লাগবে।

দীর্ঘ দিনের প্রচেষ্টায় অলকা একটা আক্ষরিক অনুবাদ দাঁড় করাতে পারলো। প্রসঙ্গত বলে রাখতে পারি, এই অনুবাদ বিশেষত একটা কারণে রীতিমতো কঠিন ব্যাপার। তেঙ্গুর সংগ্রহের অন্যান্য অজস্র বই-এর মতো এই বইটাও যদি কোনো মূল সংস্কৃত বই-এর তিব্বতী সংস্করণ হতো তাহলে সমস্যাটা হয়তো তুলনায় কম হতো। কেননা, তার জন্যে 'মহাব্যুৎপত্তি' থেকে শুরু করে একালের নানা অভিধান রয়েছে; তাই তিব্বতী শব্দের হুবহু সংস্কৃত প্রতিশব্দর জন্যে মাথা খুঁড়তে হয় না। কিন্তু চম্পারণের অভয়দত্তশ্রী মুখেমুখে যা বিবৃত করেছিলেন তাই অবলম্বন করে জনৈক তিব্বতী লেখক আলোচ্য বই রচনা করেছেন। এই অভয়দত্তশ্রী বলে ব্যক্তিটি ঠিক কে ছিলেন তা অবশ্যই আমাদের জানা নেই। মোটের উপর শুধু এটুকু জানা আছে যে মহান সংস্কৃতবিদ্ বলে তাঁকে মনে করবার কোথাও কোনো নজির নেই। তাই মনে করার অবকাশ থাকে তাঁর মৌখিক বিবরণটা সেকালের স্থানীয় ভাষায় হওয়া অসম্ভব নয়। তিব্বতী অনুবাদকদের কাছে সংস্কৃত ভাষা যতোটা সড়োগড়ো সেকালের বৃহৎবঙ্গে চালু লৌকিক ভাষা তা হওয়ার সম্ভাবনা কম। অবশ্য 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' বলে বই-এর মূল তিব্বতী সংস্করণ যাঁর রচনা, অভয়দত্তশ্রীর প্রতি তাঁর ভক্তির সীমাপরিসীমা ছিলো না। তাই সাধ্যমতো চেষ্টা তিনি নিশ্চয়ই করেছিলেন। কিন্তু স্থানীয় ও লৌকিক ভাষায় অতোটা দখল তিব্বতী কোনো লেখকের পক্ষে হয়তো তেমন সহজসাধ্য হবার কথা নয়। তাই কিছু শব্দ হয়তো তাঁর বোধগম্যই হয়নি, কিছু কথা হয়তো আন্দাজে লেখা। তার নিখুঁত বা একেবারে আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ নানা সমস্যার সৃষ্টি করতে বাধ্য। তবুও শেষ পর্যন্ত অলকা গোটা বইটারই সাধ্যমতো একটা আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ তৈরি করলো; তারপর অল্পবিস্তর মাজাঘষা করে বর্তমান তর্জমা প্রকাশে অগ্রসর হয়েছে।

অনুবাদটা পড়ে পাঠকদের কাছে প্রথমটায় কিছুটা অদ্ভুত লাগবার আশঙ্কা। সিদ্ধ আন্দোলনের নায়কদের জীবনকথার সংকলনই বই-এর মূল অভিপ্রায়, সন্দেহ নেই। কিন্তু জীবনকথা বলতে আমরা আজকাল যা বুঝি সেরকম নয়। পক্ষান্তরে অলৌকিক কাহিনীতে এমন ঠাসা যে পুরো বিবরণই প্রায় আষাঢ়ে গল্পের মতো মনে হতে পারে। তাই শুরুতেই বেশ ভাবিয়ে তোলে। অমন রাশিকৃত অলৌকিক কাহিনী থেকে সিদ্ধ আন্দোলনের বাস্তব উপাদান সত্যিই কি উদ্ধার করা সম্ভব হবে?

কিন্তু লোকসংস্কৃতি নিয়ে যাঁদের চর্চা, তাঁরা হয়তো উল্টো কথাই বলবেন। অমন অলৌকিক কাহিনীর ছড়াছড়ি না-থাকলেই বরং এই সিদ্ধদের 'লোকনায়ক বলে গ্রহণ করতে কিছুটা দ্বিধার সুযোগ থাকতো। সমাজের পিছিয়ে-পড়া চাষা-ভুষোর একটা প্রবণতাই হলো, যাঁদের তাঁরা লোকনায়ক বলে মেনেছেন তাঁদের কেন্দ্র করে রকমারি অলৌকিক কাহিনীর কল্পনা। এজাতীয় অলৌকিক কাহিনীর উপাদান কতোটা যে ইচ্ছাপূরণ তার আলোচনা মনোবিজ্ঞানীরা করবেন। কিন্তু বিশেষজ্ঞদের বিশ্লেষণ বাদ দিয়েও একটা সাদামাটা কথা মনে রাখা যায়। সমাজের নীচু মহলের বৃহৎ জনতাকে যাঁরা মুক্তির পথ দেখাবেন তাঁদের পক্ষে কি সোজা সাদামাটা মানুষ হওয়া সম্ভব? নাকি, তাঁদের অসামান্য মানুষ বলেই কল্পনার প্রবণতা? নিশ্চয়ই তাঁরা একেবারে অসামান্য, অসাধারণের কোঠায় পড়বেন; তাঁদের শক্তি-সামর্থ্যও নিছক লৌকিকের চেয়ে অনেক বেশি; এমন কি প্রকৃতির সহজ সাধারণ নিয়ম-কানুনই তাঁদের সহায় সম্বল নয়—অলৌকিক শক্তি তাঁদের সহায় হয়।

জ্যাক লিন্‌সে-র লেখা 'সংস্কৃতির সংক্ষিপ্ত ইতিহাস'-এর (Jack Lindsay, *A Short History of Culture*) প্রথম সংস্করণ থেকে একটা চিত্তাকর্ষক নমুনা তোলা যায়। রুশ বিপ্লবের ঠিক পরেরই ঘটনা। উজবেক, তাজিক প্রভৃতি অঞ্চলে তখনো সাধারণ পশুপালক ও কৃষিজীবীরা নেহাতই অনগ্রসর ও শিক্ষাবঞ্চিত মানুষ; হয়তো পাল আমলের কৈবর্তদেরই কাছাকাছি। তাঁদের কাছে খবর পৌঁছুলো লেনিন নামের এক লোকনায়ক বঞ্চিত জনগণকে মুক্তির পথে টেনেছেন। এ-হেন লোকনায়ক বঞ্চিত কৃষকদের কাছে নিশ্চয়ই যেসে তেসে কেউ হতে পারেন না। উজবেকিস্থান ও তাজিকিস্থানের পশুপালক ও কৃষকসাধারণের মধ্যে তাই লেনিনকে নিয়ে কতোই না উপকথা, তার মধ্যে অলৌকিক কাহিনী দিব্বি খাপ খেয়ে যায়।

“একটি উজবেক কাহিনীতে তাই দেখা যায়, মুক্তির স্বপ্ন সত্য হওয়ার আগে,

লেনিনকে একটা চাঁই পাথর গড়াতে হয়েছিল ; তারপরে উত্তর দিতে হয়েছিল তিনটি ধাঁধার : সবচেয়ে শক্তিশালী কে, সবচেয়ে সুখী কে, সবচেয়ে দুঃখী কে ? (উত্তর : যিনি সবচেয়ে প্রাজ্ঞ, সবাই যাকে ভালোবাসে ; যিনি সবচেয়ে সম্মানীয়, সবাই যাকে ভালোবাসে ; দুঃখী সেইই যাকে কেউ ভালোবাসে না)। একটি তাজিক-কাহিনীতে দেখি, লেনিনকে পথে খুন করার জন্য বড়োলোকরা ভাড়া করলো এক গুণিনকে। লেনিন তখন "উত্তরের বড়ো শহর"-এর দিকে চলেছেন, সেখানকার দাস-হয়ে-যাওয়া লোকরাই প্রথম জাগবে। সব ধরনের কু-যাদু খাটানো হলো, লেনিনকে কিন্তু রক্ষা করলো প্রকৃতির বিভিন্ন শক্তি, পথ দেখালো পশুপাখিরা। "পাহাড় তাঁকে ছায়া দিলো তাপ থেকে, সূর্য কমিয়ে দিলো তার তেজ, পাথরগুলো যাতে না বেশি গরম হয়ে যায়, আর লেনিনের পায়ে না ব্যথা লাগে। যখন তাঁর তেষ্টা পেলো, আকাশ ঝরালো বৃষ্টি। যখন তাঁর খিদে পেলো, ব্যাজার (ভোঁদড়-জাতীয় নিশাচর প্রাণী) এনে দিলো খাবার, হরিণী দিলো নিজের দুধ।" জঙ্গলের কাঁটা-ঝোপগুলো সরে গেলো একপাশে, জোনাকি পথ দেখালো রাতে। গুণিন যখন মিথ্যে আগুন জ্বাললো, পথ দেখাতে সামনে উড়ে চললো উডকক (এক জাতের পাখি)। এই সব কিছুরই কেন্দ্রে আছেন লোকনায়ক (Culture-hero)-রূপী লেনিন, তিনি নিয়ে আসছেন শান্তি আর সমৃদ্ধি :

> অন্ধকার থেকে লেনিন গড়ে তুললেন ফলের বাগান
> মৃত্যু থেকে জীবন ;
> মিলিতভাবে এইসব যোদ্ধার চেয়েও
> তিনি ছিলেন আরও শক্তিশালী।
> কারণ হাজার বছরে তারা যা ধ্বংস করেছিল,
> তিনি একাই গড়ে তুললেন ছ বছরে।"

লোকনায়কদের নিয়ে অনেক উপকথা—এমনকি অলৌকিক কাহিনী গড়ে ওঠে ; বঞ্চিত সাধারণ শ্রমজীবীদের মধ্যে স্বতঃস্ফূর্তভাবেই গড়ে ওঠে। তার মানে নিশ্চয়ই যুক্তিটা এই নয়, যাঁদের ঘিরে অলৌকিক কাহিনীর উৎপত্তি তাঁরা সকলে অনিবার্যভাবেই লোকনায়ক। কেননা, শাসক-পরিবেশেও অলৌকিক কাহিনীর উৎপত্তির ঝুড়িঝুড়ি নজির আছে। কিন্তু তার নজির বর্তমান আলোচনার বিরুদ্ধে যুক্তি হিসেবে দাঁড় করানো যুক্তিবিদ্যারই ধোপে টেঁকবে না। বর্তমানে বক্তব্য শুধু এই যে সিদ্ধ প্রসঙ্গে অলৌকিক কাহিনীর নজির দেখেই পিছু হঠবার কারণ নেই।

বরং লোকমানসে সিদ্ধ প্রসঙ্গে অতিপ্রাকৃত কাহিনীর প্রাচুর্য না থাকলেই সন্দেহের অবকাশ থাকতো এই সিদ্ধরাই গণ-বিপ্লবের চাহিদা মেটাবার মতো একটা পাল্টা মতাদর্শের জমি সত্যিই তৈরি করেছিলেন কিনা।

'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র বস্তু-নিষ্ঠায় সন্দেহের আসল কারণ কিন্তু অন্যত্র। যে-চুরাশি জন সিদ্ধর উল্লেখ করা হয়েছে, তাঁদের নামগুলো মূলতই বৃত্তিগত। ভূমিকায় এবিষয়ে বিস্তৃত আলোচনা আছে। তার সঙ্গে আরো কিছু কথা যোগ করার সুযোগ থাকতে পারে। তাঁত বুনতেন বলে তাঁতি-পা। কিন্তু সমাজে তাঁতি বলতে নিশ্চয়ই একটি মানুষ নয়। অনেকেই তো তাঁত বুনতেন। বৃত্তির বিচারে কি সকলকেই তাঁতি-পা বলা হবে? আলোচ্য বইতে সিদ্ধ হিসাবে তাঁতি-পা এক এবং অদ্বিতীয় জনৈক সিদ্ধ। কিন্তু এই সিদ্ধটির ব্যক্তিনামের কোনো রকম হদিসই নেই। তাহলে কি অনুমান করতে হবে, তাঁর কোনোকালে কোনো রকম ব্যক্তিনাম ছিলো না? এ-হেন অনুমান স্পষ্টতই কষ্টকল্পনার পরিচায়ক। পক্ষান্তরে অনায়াসেই ভাবা যেতে পারে, সিদ্ধ পদবাচ্য হবার আগে নামান্তরে তাঁর কোনো পরিচিতি ছিলো; সিদ্ধ হিসেবে পরিচয় ও প্রতিষ্ঠা পাবার পর শুধু তাঁতি-পা বলেই তাঁর উল্লেখ। ব্যক্তিনামটা সিদ্ধনামের পিছনে ঢাকা পড়ে গেলো।

ধর্মচর্চার মহলে ব্যক্তিনাম খুইয়ে নামান্তর গ্রহণের নজির অবশ্যই নতুন কিছু নয়। দীক্ষা বা অভিষেক লাভের আগে জন্মগত নাম, পরে দীক্ষালব্ধ নাম। খুব প্রচলিত একটা দৃষ্টান্ত মনে পড়ে। অতীশের জন্মগত নাম ছিলো চন্দ্রগর্ভ। তন্ত্র-সাধনায় দীক্ষিত বা অভিষিক্ত হবার ফলে নাম হলো জ্ঞানগুহ্য বজ্র। আবার তন্ত্র-সাধনার পথ ছেড়ে মহাযান ধর্ম গ্রহণের পর নাম হলো দীপঙ্কর।

'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-র পদেপদেই দেখা যায়, কোনো ডাকিনী বা "যোগী"র কাছে সিদ্ধটি অভিষেক লাভ করলেন। বিবৃতিকারের মতে সাধারণত অবশ্যই তা তন্ত্রবিশেষে দীক্ষা বা অভিষেক: "হেবজ্র" বলে তন্ত্রমতে দীক্ষা, "হয়গ্রীব" বলে তন্ত্রমতে অভিষেক—এমনি রকমারি নামের তন্ত্রমতের কথা। এ-হেন হরেক রকম নামের তন্ত্রমতের বিশিষ্ট সাধনপদ্ধতিতে যাঁরা বিশ্বাসী তাঁরা অবশ্য বিশিষ্ট তন্ত্র-নামের বৈশিষ্ট্য নিয়ে আলোচনা করবেন এবং করেছেনও। সেকালের তিব্বতী মহলে এবং একালের বিদ্বানমহলেও ভূরিভূরি নমুনা আছে। তন্ত্রমত বলতে কতো রকম এবং রকমারি তন্ত্রমতের বৈশিষ্ট্য মেনে নিলেও এ-বিষয়ে 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'-তে মোটের উপর একরকম যেন কিম্ভূতকিমাকার জগাখিচুড়ির বর্ণনা চোখে

পড়ে। তার একটা কারণ, "যোগী" বা "ডাকিনী"র কাছে অভিষেক পাবার পর সব সিদ্ধই মোটামুটি একই রকম উপদেশ পাচ্ছেন বলে মনে হয় : নিজের বৃত্তিটার প্রতিই আরো মন দাও, তার প্রত্যেক বৈশিষ্ট্যেরই গভীর অর্থ খুঁজে পাবে আর তাই বুঝতে পারবে ঐ বৃত্তির উৎকর্ষের মধ্যেই তোমার সিদ্ধির নির্দেশ আছে। অর্থগুলো কষ্টকল্পনার পরিচায়ক বলে যদি বিবেচিত নাও হয় তাহলেও কিন্তু অভিষিক্ত নামগুলোর কথা ভাবতে গেলে অবাক লাগতে বাধ্য। তাঁতি রয়ে গেলো তাঁতি হয়েই এবং তার অভিষিক্ত নামটার মধ্যে তন্ত্রে প্রচলিত পরিভাষার কোনো নামগন্ধও রইলো না। অভিষিক্ত নামও তাঁতিই থেকে গেলো। তাহলে অভিষেক বলে ব্যাপারটাই অবান্তর হয়ে যাবার দশা হবে না কি? এবং অভিষেকটাই যদি অবান্তরের কোঠায় পৌঁছুবার উপক্রম করে তাহলে অভিষেকান্তে প্রাপ্ত উপদেশটারই বা প্রাসঙ্গিকতা কতোটা বাকি থাকে? তা কি শুধু এই যে সমাজের যে-অবস্থাতেই থাকো না কেন এবং যা-ই তোমার বৃত্তি হোক না কেন, তাকে কোনো অর্থেই হীন বলে ভেবো না। ধর্মপ্রচারকেরা অবশ্যই অনেক উচ্চাঙ্গ তত্ত্বকথা বলেন ; কিন্তু সত্যের সারমর্ম নিজের তথাকথিত হীন বৃত্তির মধ্যেই খুঁজে পাবে। তার মানে, বৃত্তিটাই আসল ; তত্ত্বকথার রাশি প্রক্ষেপমাত্র।

তাছাড়াও আর একটা ব্যাপার রীতিমতো অদ্ভুত মনে হয়। বিচিত্র নামের তন্ত্রমতে অভিষেক হলেও তার পর যে-উপদেশ পাওয়া যাচ্ছে তাও যেন একরকম ছকে বাঁধা মহাযানমতের কমবেশি জোলো সংস্করণ। বিশিষ্ট তন্ত্রমতটির স্বীকৃত বৈশিষ্ট্যের যেন ছিটেফোঁটাও নেই—হেবজ্র, হয়গ্রীব প্রভৃতির নামগন্ধও খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। পুরো ব্যাপারটাই বেশ কিছুটা গোলমেলে। সন্দেহ হয়, সমাজের নানা বৃত্তির নানা শ্রমজীবীর মধ্যে একটা পাল্টা মতাদর্শের প্রচার চলেছিলো। সমাজের উপরতলার শাসক সম্প্রদায় যে-সব জীবিকা-উপায়কে হেয় ও হীন বলে প্রচার করতে চেয়েছিলো সেই জীবিকা-উপায় বা বৃত্তিগুলিকেই প্রকৃত মর্যাদা দেবার প্রয়াস এই পাল্টা মতাদর্শটির মূল কথা। ফলে তাঁতি-জোলা-জেলে-চাষা-কামার-কুমোর সকলের মধ্যেই একটা আত্মবিশ্বাস ও বৃত্তিগত প্রত্যয় সৃষ্টির প্রয়াস। তারই ফলে রাজশক্তির পক্ষ থেকে হাজারো উপায়ে শ্রমিক মানুষগুলোকে শাসক-স্বার্থের সহচর মতাদর্শের মোহে দাবিয়ে রাখবার চেষ্টা নিষ্ফল হবার উপক্রম। আত্মপ্রত্যয় নিয়ে এই মানুষগুলোই মাথা তুলে দাঁড়াতে শুরু করলো। সহজ সাধারণ জীবনে এ জাতীয় প্রত্যয় সৃষ্টি করতে পারলে একটা বৈপ্লবিক পরিস্থিতির

সম্ভাবনা গড়ে উঠতে পারে। চম্পারণের অভয়দত্তশ্রী যিনিই হোন না কেন, সিদ্ধ প্রসঙ্গে তাঁর বিবৃতি ও বর্ণনার মধ্যে তাই এক রকম সচেতন বা অচেতন মতবিকৃতি অনুমানের সুযোগ থেকে গিয়েছে। সিদ্ধদের নামগুলো ঐকান্তিক ভাবে বৃত্তিগত (তাও নিন্দিত নীচু শ্রেণীর বৃত্তি) হয়েই রইলো কী করে ? গ্রন্থে এই প্রশ্নের উত্তর নেই। বরং তিনি মহাযানতত্ত্ব যতোটুকু বুঝেছিলেন তারই সঙ্গে রকমারি নামে প্রসিদ্ধ তন্ত্র সাধনার যেন তালগোল পাকিয়ে পুরো আন্দোলনটারই একটা আধা-মনগড়া সংস্করণ রচনার চেষ্টা করেছেন। সিদ্ধদের ঐকান্তিক বৃত্তিগত নাম পালটাবার উপায় ছিলো না। কিন্তু তাদেরই ঘাড়ে আধা-মহাযানী আর আধা-তান্ত্রিক কোনো রকম মতাদর্শ চাপিয়ে দেবার সুযোগ ছিলো। 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' কি তারই নমুনা ? যদি তাইই হয় তাহলে বইটির অসামান্য গুরুত্ব মানতে হবে। একটা প্রকাণ্ড গণ-অভ্যুত্থানের মতাদর্শগত প্রস্তুতি কী ভাবে ধামা-চাপা যেতে পারে তারই নমুনা বলে সন্দেহ হয় না কি ?

আরো হাঙ্গামা বাধিয়েছেন সিদ্ধদের মূল রচনার টীকাকারেরা। মূল রচনা বলতে যে একজাতীয় গান—সম্ভবত সেকালের লোকসংগীত—একথা মনে করার বিরুদ্ধে বাধা কম। কিন্তু কাদের কানে পৌঁছে দেবার জন্যে গান ? নিশ্চয়ই চাষা-ভূষোদের। গানের ভাষাতেই তার চরম প্রমাণ। আধুনিক পণ্ডিতেরা অবশ্যই এই ভাষা নিয়ে বিস্তর আলোচনা করেছেন। অনেক বিতর্কও হয়েছে। বাংলা না হিন্দী না উড়িয়া—এ জাতীয় প্রশ্ন তুলে অনেক সময় প্রাদেশিক মনোভাবের প্রশ্রয় দেবার নজিরও সন্দেহ হয়। ভাষাতত্ত্বে আমার অধিকার যৎকিঞ্চিৎ। অতএব এই বিতর্কে নাক গলানোর চেষ্টা নিরাপদ হবে না। কিন্তু একটা কথা তোলার প্রলোভন অবশ্যই থেকে যায়। গানের ভাষাটার নাম যা-ই দেওয়া হোক না কেন, তা যে সেকালের সাধারণ শ্রমজীবীদের বোধগম্য ও মুখের ভাষা এবিষয়ে সন্দেহের অবকাশ থাকতে পারে না। কিন্তু টীকা-ভাষ্যকারেরা করলেন কী ? ওই চাষাভূষোর সহজ সরল গানের উপর গুরুগম্ভীর সংস্কৃতে টীকা-ভাষ্য রচনা করে তারই নিগূঢ় জটিল ও অর্ধবোধ্য—এবং অনেক সময় এমনকি অবোধ্য—দার্শনিক মতামত চাপিয়ে দিতে চাইলেন। সাদামাটা কথায়, প্রকৃত অর্থে টীকা-ভাষ্যর আসল আদর্শ ও উদ্দেশ্যের ঠিক বিপরীত। কঠিন বিষয়কে সহজে বোঝাবার উদ্দেশ্যেই টীকা ভাষ্যর রচনা। সহজ সরল বক্তব্যকে কঠিন তত্ত্বজালে বাঁধার প্রয়াসকে আর যা-ই বলুন টীকা-ভাষ্য বলবার কোনো সুযোগই নেই। তাই সন্দেহ হয়, ভাষ্যকারেরা

শ্রমিক-সাধারণের মুখের ভাষায় রচিত লোকসংগীতের উপর মহাযান ও অনেক সময় বিচিত্র তন্ত্রসম্মত বহু তত্ত্ব চাপিয়ে দেবার চেষ্টা করে পুরো সিদ্ধ আন্দোলনেরই একটা কিম্ভূতকিমাকার সংস্করণ রচনা করতে চেয়েছেন। সন্দেহ হয়, আধুনিক বিদ্বানদের মধ্যে এই ভাবে বেশ কিছুটা বিভ্রান্তি সৃষ্টি করায়ও অল্পবিস্তর সফল হয়েছেন। শুধু তাই নয়। তিব্বতের পরবর্তী ধর্মপ্রচারকেরাও আরেকভাবে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করেছেন। রকমারি তন্ত্রগ্রন্থের সঙ্গে লেখক হিসেবে সিদ্ধবিশেষের নাম জুড়ে দিয়েছেন। তুলনায় দায়িত্বশীল তিব্বতী ঐতিহাসিকদের রচনা থেকেই কারসাজিটা আন্দাজ করার সুযোগ আছে। তেঙ্গুরে সরহ-র রচনা বলে রকমারি তন্ত্রগ্রন্থ রয়েছে। অথচ দায়িত্বশীল তিব্বতী ঐতিহাসিকরাই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছেন যে সরহর প্রকৃত রচনা বলতে কিছু দোহার সংকলন। তাঁদের কথা মানলে আরো মানতে হবে, সরহর নামের সঙ্গে সংযুক্ত তন্ত্রগ্রন্থগুলো আর যাইহোক সরহর রচনা নয়। মেকি টাকা বাজারে আসল টাকা বলে চালাবার চেষ্টার মতো।

কিন্তু ঢের বড়ো বিভ্রান্তির সৃষ্টি করেছেন টীকা-ভাষ্যকারেরা। সিদ্ধদের রচনা চর্যাপদগুলির সঙ্গে হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মুনিদত্ত রচিত ভাষ্যও প্রকাশ করেছেন। অবশ্যই চর্যাপদগুলির প্রকৃত পাঠ নিয়েই পরবর্তী বিদ্বানেরা শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে একমত হতে পারেননি। অনেকেই পাঠান্তরের প্রস্তাব করেছেন। তার কারণ নিয়ে আলোচনায় প্রবেশ করার এখানে সুযোগ নেই। কিন্তু একটা কথা তুলতেই হয়। পাঠান্তর স্বীকার করলেও গানগুলির একরকম সাদামাটা মানে দাঁড় করানো যায়। আধুনিক বিদ্বানদের লেখাতেই এহেন সাদামাটা মানে দেওয়া আছে। কিন্তু মুনিদত্ত রচিত ভাষ্যটির গোলকধাঁধায় ঢুকলে সবকিছুই তালগোল পাকানো এক অর্থহীনতার গহ্বরে পড়তে হয়। ভাষ্যটি সংস্কৃতে লেখা। তাই সংস্কৃতে পারদর্শী অধ্যাপক মৃণালকান্তি গঙ্গোপাধ্যায়ের সঙ্গে এই ভাষ্য নিয়ে বসেছিলাম। প্রথম গোটা দশেক চর্যাপদের ভাষ্য আলোচনা করার পর তাঁর ধৈর্য ধরে রাখা কঠিন হলো। এক একটা গানের পুরো ভাষ্যটা পড়বার পর তাঁকে প্রশ্ন করলাম : মোদ্দা কথাটা তাহলে কী দাঁড়ালো ? মৃণাল বললেন, কী জানি ; তন্ত্রটন্ত্রর গূঢ় অর্থ নিয়ে আমার তেমন চর্চা নেই ; কিন্তু সাধারণ বুদ্ধিতে তো একরকম আবোলতাবোল বলেই মনে হচ্ছে ; আগাগোড়া সব কথা মিলিয়ে একটা কোনো সামঞ্জস্যপূর্ণ অর্থ তো খুঁজে পাচ্ছি না। আসলে পুরো ভাষ্যগ্রন্থটি এই রকমই। মুনিদত্ত রকমারি

"আগম" উদ্ধৃত করেছেন, রকমারি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতও উল্লেখ করেছেন ; কিন্তু সবটা মিলে কী দাঁড়ায়—কিংবা একান্তই কোনো অর্থ দাঁড়ায় কিনা—এ বিষয়ে কোনো স্পষ্ট কিছু বোঝা কঠিন। স্বীয় পাণ্ডিত্য প্রদর্শনে ভাষ্যকারের এমন অদম্য উৎসাহ যে অর্থসঙ্গতির ব্যাপারটা শেষ পর্যন্ত গৌণ হবার যোগাড় !

ভাষ্য নিয়ে এত হট্টগোল বলেই এখানে একটা প্রশ্ন না তুলে পারছি না। কার জন্যে লেখা এই ভাষ্য ? গানগুলো তো সেকালের বৃহৎবঙ্গের সাধারণ লোকের মুখের ভাষায় রচিত। উদ্দেশ্যও নিশ্চয়ই এহেন সাধারণ মানুষের কানে পৌঁছে দেওয়া। তারা নিশ্চয়ই নিজেদের মতো করেই বুঝবে—এই উদ্দেশ্যেই রচনা। কিন্তু তারই ব্যাখ্যায় এ-হেন ভাষ্য কার জন্যে লেখা ? নিরক্ষর চাষাভুষো তো দূরের কথা, সংস্কৃত ভাষা বেশ কিছুটা রপ্ত থাকলেও এবং ভারতীয় দর্শন প্রসঙ্গে বেশ কিছুটা ধারণা থাকলেও ভাষ্যের সব কথা বুঝে পুরো গানের সামগ্রিক কোনো তাৎপর্য—অর্থাৎ মূল গানের সঙ্গে সম্পর্কিত তাৎপর্য—নির্ণয় করা যদিই বা সম্ভব হয় তাহলেও তা ঢের ঢের সাধনা-সাপেক্ষ ব্যাপার হবে। তবে একটা কথা বুঝতে খুব বেগ পেতে হয় না। যেন-তেন প্রকারে গানগুলির মধ্যে মহাযান ধর্ম ও দর্শনের কিছু কথা গুঁজে দিতে পারলেই ভাষ্যকার খুশি, তার সঙ্গে পরবর্তীকালের তন্ত্র-সম্মত আরো কিছু কথা জুড়ে দিতে পারলে তো আরো খুশি।

কিন্তু ভাষ্যকার পদে পদে বাধাও পেতে বাধ্য হয়েছেন। একটা সহজ সরল কথা খুঁড়ে মহাযানের কোনো গূঢ় তত্ত্ব আবিষ্কার করাও সহজ ব্যাপার নয়। এই কারণেই ভাষ্যকার "সন্ধ্যা ভাষা"র প্রসঙ্গে নিরাপত্তা খুঁজেছেন। "সন্ধ্যা ভাষা" কাকে বলে তা নিয়ে আধুনিক বিদ্বানেরা বেশ কিছু আলোচনাও করেছেন। কিন্তু মোদ্দা কথাটা এই যে একটা শব্দের সাধারণ সাদামাটা অর্থ বাদ দিয়ে তারই পিছনে লুকোনো কোনো তত্ত্ব খোঁজা সম্ভব। চর্যাপদ এহেন সন্ধ্যা ভাষায় লেখা। তাই তার সাদামাটা অর্থ গ্রহণ করায় বাধা আছে।

ভাষ্যকার মুনিদত্ত এখানে অবশ্য একটা প্রশ্ন সযত্নে এড়িয়ে গেছেন। এ জাতীয় সাংকেতিক ভাষার তাগিদটা কী হতে পারে ? ঠগীদের মধ্যে একরকম সাংকেতিক ভাষার তাগিদটা বোঝা যায়। ধরা পড়বার ভয় এড়িয়ে যাবার এক কৌশল। কিন্তু পাল আমলের যে-সমাজে যে-তত্ত্ব প্রচার করতে পারলে রাজসম্মানেরই সম্ভাবনা সেখানে মহাযান-সম্মত ধর্মতত্ত্ব প্রচারের জন্যে এমন একরকম গোপন ও গুহ্য ভাষা ব্যবহারের তাগিদ কেন ? আসল উদ্দেশ্যটা যদি সত্যিই মৈত্রী, করুণা,

বোধিচিত্ত উৎপাদন প্রভৃতিই হয় তাহলে তো তা-ই নিয়েই সরাসরি গান বাঁধবার কথা। ভাষ্যকারের পক্ষেও মাথার ঘাম পায়ে ফেলতে হবে না, রাজশক্তির দিক থেকেও বাধার বদলে অল্পবিস্তর দক্ষিণালাভের আশা। কিন্তু মুনিদত্তর কাছে এসব প্রশ্নই ওঠেনি। শুধু এলোপাতাড়ি বলে চলেছেন, সন্ধ্যা ভাষায় অমুক শব্দ দিয়ে অমুক মহাযানের তত্ত্বই প্রকাশিত হয়েছে।

আসলে সন্ধ্যা ভাষা বলে ব্যাপারটা মুনিদত্তর আবিষ্কার নয়। প্রাচীন কালেই মহাযান-সূত্রে তার উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু মহাযানীরা কেন এমনতরো ভাষা-তত্ত্বের আশ্রয় খুঁজেছিলেন? তাঁদের পক্ষে উদ্দেশ্যটা অপ্রাসঙ্গিক নয়। প্রকৃত বুদ্ধ-বচন হিসেবে প্রাচীনপন্থী স্থবিরেরা যে সব কথা বলতেন তা প্রায় নস্যাৎ করেই মহাযান নাম দিয়ে এবং স্বয়ং বুদ্ধের প্রকৃত অভিপ্রায় হিসেবে নব্য বৌদ্ধরা এই সন্ধ্যা ভাষার কথা চালু করেছিলেন। বুদ্ধবচনের আপাত-অভিপ্রায় ও গূঢ় অভিপ্রায় এক নয়। মহাযানীদের এই ছিলো মূল বক্তব্য। সন্ধ্যা ভাষার তত্ত্বটা তাই তাঁদের পক্ষে স্বাভাবিক। কিন্তু মুনিদত্তর মতো টীকাকারের পক্ষে একেবারেই অবান্তর। চাষাভূষোর সাদামাটা গানকে রাজশক্তি-সমর্থিত মতের বাহক বলে প্রচারের চেষ্টা। মূল বক্তব্যের হুলটাকে ভোঁতা করে দেওয়ার চেষ্টা।

অবশ্যই বুদ্ধ-প্রচারিত প্রকৃত মত স্থবির-সম্প্রদায় প্রচারিত তত্ত্ব না মহাযান তত্ত্ব—তা নিয়েও বিস্তর আলোচনা আছে। এখানে তা নতুন করে পাড়বার সুযোগও নেই, দরকারও নেই। কিন্তু একটা কথা তোলা খুবই প্রাসঙ্গিক। সন্ধ্যা-ভাষার মতো “যান” শব্দটিও মহাযানীদেরই উদ্ভাবন। পুরোনো স্থবিরসম্মত বৌদ্ধ মতকে হেয় করবার উদ্দেশ্যেই এই উদ্ভাবন। তাঁদের দাবি, প্রাচীনপন্থীরা হীন-যানের অনুগামী, নব্যরা মহা-যানের। ধর্মমতের বিবাদ প্রসঙ্গে ব্যাপারটা বুঝতে অসুবিধে হয় না। কিন্তু অসুবিধেয় পড়ি অন্য পরিস্থিতি দেখে। একালের বিদগ্ধ বিদ্বানেরাও এই “যান” শব্দের যেন বেশ কিছুটা যথেচ্ছ ব্যবহার করেছেন। বজ্রযান, মন্ত্রযান, সহজযান—আরো কতো কিছু। বুঝতে অসুবিধে হয়, কেননা এ জাতীয় নামকরণের প্রকৃত সমর্থনটা আধুনিক বিদ্বানমহলের সৃষ্টি বলেই সন্দেহ থেকে যায়।

ধরা যাক: সহজযান। সিদ্ধরা অবশ্যই “সহজ”কেই আদর্শ বলে মেনেছেন। কিন্তু কোথাও নিজেদের—বা তাঁদের কোনো উপসম্প্রদায়কে—সহজযানী আখ্যা দিয়েছেন বলে জানা নেই। বরং স্বয়ং সরহ তাঁর দোহায় “সহজ” শব্দকে যে-

সরলার্থে ব্যবহার করেছেন তা গ্রহণ করলে পুরো সিদ্ধ আন্দোলনের চরিত্রটাই বদলে যায়। কোনো বিশেষ ধর্মমত নয়, ধর্মমতমাত্রতার বিরুদ্ধেই একরকম বিদ্রোহ।

অতএব হরেক রকম "যানে"র কথা পড়েও আমার মূল প্রশ্নটা থেকেই গেলো। কৈবর্ত বিপ্লবের পিছনে সিদ্ধ আন্দোলনের প্রভাব খোঁজা কি একান্তই অবান্তর হবে?

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী

"চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি" গ্রন্থর মূল তিব্বতী থেকে অনুবাদ

অনুবাদ প্রসঙ্গে

বাংলা সাহিত্যের যে কোনও উৎসাহী পাঠকের কাছে চর্যাপদের গুরুত্ব সুবিদিত ; পদকর্তাদের সম্পর্কে কৌতূহলও তাই অনিবার্য। স্বয়ং মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর কাছে এ-কথা অবিসম্বাদিত ছিল বলেই সংকলন গ্রন্থটি প্রকাশ কালে নাতিবিস্তৃত ভূমিকায় তিনি পদকর্তাদের কিঞ্চিৎ পরিচয় দিতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সে পরিচয়ের জন্য ফরাসডাঙার ডাক্তার কোর্দিয়ে-র (P. Cordier) সাহায্য তিনি অপরিহার্য বিবেচনা করেন। তার কারণও আছে।

চর্যাপদের পদকর্তাদের প্রচলিত অভিধা সিদ্ধ—সম্মানার্থে সিদ্ধাচার্য। এক কালে এদেশে তাঁদের প্রবল প্রভাব ছিল। পরবর্তী কালে যে কোনও কারণেই হোক সে প্রভাব ক্রমশঃ ক্ষীণ হয়ে এলেও সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি। বিশেষত তিব্বতী সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে তা টিঁকে থেকেছে এবং এই কারণেই শাস্ত্রী মহাশয় ডক্টর কোর্দিয়ে-এর সহায়তার উপর নির্ভরশীল হতে বাধ্য হন। কেননা পেশায় চিকিৎসক হলেও এই ফরাসী পণ্ডিতের একনিষ্ঠ সাধনা ছিল তিব্বতী চর্চা। তিব্বতী তর্জমায় ভারতীয় গ্রন্থসমূহের সুবিশাল সংকলনগুলির গ্রন্থতালিকার জন্য আজও আমরা মূলতই কোর্দিয়ে-এর উপরই নির্ভরশীল।

কোর্দিয়ে-এর সাহায্যে শাস্ত্রী মহাশয় চর্যাপদের ভূমিকায় মোট তেত্রিশ জন পদকর্তা বা সিদ্ধাচার্যের সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। পরবর্তী গবেষণার বিচারে এঁরা সকলেই সুনির্দিষ্ট অর্থে প্রকৃত সিদ্ধাচার্য ছিলেন কিনা, সে বিষয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে।

তাছাড়া সর্বপ্রসিদ্ধ সিদ্ধাচার্যদের মোট সংখ্যা তুলনায় অনেক বেশি—সাধারণ মতে চুরাশি, যদিও এক বিদেশী বিদুষীর মতে পঁচাশি। কিন্তু সিদ্ধাচার্যদের সংখ্যা চুরাশিই হোক আর পঁচাশিই হোক—এই প্রসঙ্গে সবচেয়ে বড় সমস্যা : এঁদের সম্পর্কে আমাদের ঐতিহাসিক জ্ঞানের সম্বল অতি নগণ্য।

হয়তো এই কারণেই মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন ১৯৩৭ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত তাঁর হিন্দী গ্রন্থ 'পুরাতত্ত্ব-নিবন্ধাবলী'-তে চুরাশি জন সিদ্ধ বা সিদ্ধাচার্যের অতি সংক্ষিপ্ত পরিচয় লিপিবদ্ধ করেন। আর এই উদ্দেশ্যে একমাত্র সম্বল হিসাবে যে গ্রন্থটির উপর তিনি নির্ভর করেন তার নাম : 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি।' গ্রন্থটি বর্তমানে শুধু তিব্বতী ভাষায় পাওয়া যায় এবং এই গ্রন্থ কোনও মূল ভারতীয়

গ্রন্থের প্রকৃত তর্জমা কিনা সে বিষয়েও সন্দেহের অবকাশ আছে। কেননা গ্রন্থশেষে পুষ্পিকায় বলা হয়েছে :

> 'চুরাশি সিদ্ধর বিবরণ ভারতের চম্পারণের মহাগুরু অভয়দত্তশ্রীর মুখনিঃসৃত ভিক্ষু মোনডুপ শেরব (সংস্কৃতে প্রণিধান-সিদ্ধ-জ্ঞান) কর্তৃক অনূদিত।'

এ জাতীয় পুষ্পিকা থেকে অনুমান করা যেতে পারে যে অভয়দত্তশ্রী ভারতের চম্পারণের অধিবাসী ছিলেন এবং তাঁর মুখ থেকে কাহিনী শুনেই মোনডুপ শেরব নামে জনৈক উৎসাহী তিব্বতী অধুনালভ্য গ্রন্থটি রচনা করেন। অভয়দত্তশ্রীর কথা আর বিশেষ কিছু জানা যায় না। ভারতীয় গ্রন্থাবলীর তিব্বতী তর্জমার অন্য কোথাও তাঁর উল্লেখ আমরা পাই না, তাই তিনি খুব উঁচুদরের পণ্ডিত ছিলেন কি না সে-বিষয়ে নিশ্চিত ভাবে কিছু বলা সম্ভব নয়। তবুও চুরাশি সিদ্ধর কাহিনী জানতে হলে আজ আমাদের প্রধান সম্বল এই 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি'।

হয়তো এই কারণেই বিশ্বভারতীতে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী জনৈক তিব্বতী অধ্যাপক সোনামডুব-কে নিযুক্ত করে তিব্বতী হরফে পুরো গ্রন্থটির একটি অনুলিপি প্রস্তুত করান। বিশ্বভারতী গ্রন্থাগারে কাজ করার সময়ে এই অনুলিপিটি আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। এই ব্যাপারে বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের প্রকৃত উদ্দেশ্য জানা না থাকলেও অনুমান করা যেতে পারে যে এটি অনুবাদ করা বা করানো সম্ভবত তাঁর অভিপ্রায় ছিল। এই বিবেচনাই আমার বর্তমান অনুবাদের মূল প্রেরণা—যদিও বলাই বাহুল্য এই কাজে পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী মহাশয়ের তুলনায় আমার যোগ্যতা যৎসামান্য। তবে গ্রন্থটি সযত্নে পাঠ ও পরে অনুবাদ করার সময়ে আমার মনে হয়েছে যে চম্পারণের অভয়দত্তশ্রী উৎসাহভরে এই গ্রন্থটি লিখেছেন বা বিবৃত করেছেন সন্দেহ নেই ; কিন্তু এই বিবরণে বস্তুনিষ্ঠ ঐতিহাসিক তথ্যের চেয়ে ধর্মনিষ্ঠ ভয়ভক্তিই অনেক বেশি প্রাধান্য পেয়েছে। ফলে সিদ্ধদের কাহিনীগুলি এখানে বহুলাংশে অলৌকিক, উদ্ভট কল্পনায় পর্যবসিত হয়েছে। যেমন এখানে মৎস্যজীবীকে সরাসরি মৎস্যজীবী না বলে রাজপুত্র অথচ রাজ্যশাসনে নিরাসক্ত বলে ঘোষণা করার প্রয়াস ; এমন কি অনুরক্ত আত্মীয়স্বজন ও প্রজাবৃন্দ তাঁকে রাজ্যশাসনের দায়িত্বে বেঁধে রাখবার জন্য যে শিকল ব্যবহার করছেন তাও স্বর্ণশৃঙ্খল বলে বর্ণনা করা হচ্ছে। এ জাতীয় বহু অত্যুক্তি দিয়ে সিদ্ধদের মাহাত্ম্য প্রচারই এই গ্রন্থের মূল প্রতিপাদ্য হয়ে উঠেছে। কিন্তু লোকসংস্কৃতির বিচারে অলৌকিক কাহিনীর উদ্ভবও একান্তই অবান্তর নয়। পিছিয়ে-পড়া গ্রামবাসীদের মধ্যে লোকনায়কদের (cultural hero) কেন্দ্র করে অনেক সময় নানা অলৌকিক

কাহিনী গড়ে ওঠে ; তার উপাদান এ-জাতীয় মানুষদের ইচ্ছাপূরণ। ভূমিকায় সাম্প্রতিক ইতিহাস থেকেই একটা চিত্তাকর্ষক নমুনা দিয়েছি : রুশ বিপ্লবের কিছুকালের মধ্যেই তখনো অনগ্রসর তাজিকদের মধ্যে স্বয়ং লেনিন প্রসঙ্গে কী রকম অলৌকিক উপকথা গড়ে উঠেছিলো! সিদ্ধদের প্রসঙ্গেও মোটের উপর লোকমানসের একই প্রতিক্রিয়া অনুমান-সাপেক্ষ কী না—এই প্রশ্ন কি একান্তই অবান্তর হবে ? যদি না হয়, তাহলে হয়তো স্বীকার করার সুযোগ থাকবে যে লোকমানসে এই সিদ্ধরাই এক অর্থে পিছিয়ে-পড়া মানুষদের প্রকৃত মুক্তির পথিকৃৎ হিসাবে স্বীকৃত হয়েছিলেন। স্বভাবতই ভূমিকায় এ-বিষয়ে কিছুটা আলোচনা তুলতে হয়েছে।

তাই অনুসন্ধিৎসু পাঠক যদি শুধুমাত্র সাবেক আধ্যাত্মিক ধারণাতেই ঠেকে যান তাহলে গ্রন্থটির মূল্যায়ন অসম্পূর্ণ এমন কি ভ্রান্ত হবার আশঙ্কাও থেকে যায়। কেননা আমার ধারণায় অভয়দত্তশ্রীর অনেক অবাস্তব উক্তির পিছনেও একটা মূল্যবান ঐতিহাসিক ইঙ্গিত লক্ষ্য করা যায়। মোটের উপর সিদ্ধ হিসাবে যাঁরা এককালে এক বিশাল আন্দোলনের নায়ক ছিলেন, তাঁরা না ছিলেন সমাজের উপরতলার মানুষ, না উঁচুদরের পণ্ডিত মহলের মধ্যমণি। বরং তাঁরা প্রায় সবাই সাধারণ জেলে-রাখাল-ব্যাধ-কামার-কুমোর-ধোবা-তেলি-তাঁতি-চাষী-চণ্ডাল— সমাজের তথাকথিত নিম্নশ্রেণীর মানুষ। এঁদের আস্তানা বলতে সেকালের প্রসিদ্ধ মঠ-মন্দির-বিহার ছিল না, পক্ষান্তরে শুঁড়িখানা, শ্মশান, নদীর তীর, জঙ্গলের মধ্যে গাছের তলায় ছিল এঁদের বসবাস। সঙ্গিনী—ও এমন কি দীক্ষাদাত্রী—গ্রহণ করতেন এমন সব নারীকে, সমাজ যাঁদের কখনই অভিজাত বলে মনে করেনি। তাঁদের মধ্যে গণিকা ও শুণ্ডিনীরও উল্লেখ চোখে পড়ে। বিদ্যাবুদ্ধির দিক থেকে সিদ্ধরা ছিলেন নিরক্ষর দেশবাসীর কাছাকাছি, অন্তত খুব একটা উচ্চাঙ্গের দার্শনিক গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ছিলেন বলে প্রমাণ মেলে না।

অথচ এ-বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই যে পালযুগের শেষভাগে সেকালের বৃহৎবঙ্গ থেকে শুরু করে দক্ষিণ ভারত পর্যন্ত এ হেন মানুষরাই এমন একটা আন্দোলনে সামিল হয়েছিলেন, যার গুরুত্ব উপেক্ষা করা সমাজের উঁচু মহলের পক্ষেও সম্ভব হয়নি। সে আন্দোলনকে সামাজিক, বা এমন কি 'ধর্মবিশ্বাসের মুখোসপরা' কোনও এক ধরণের গণ-আন্দোলন বললে বিশেষ অত্যুক্তিও বোধহয় হবে না। অবশ্যই শুধুমাত্র অভয়দত্তশ্রীর বর্ণনাটুকুর উপর নির্ভর করে আমাদের পক্ষে আজ আন্দোলনটির স্বরূপ অনুমানের পূর্ণ সুযোগ নেই ; তার জন্য তিব্বতী

তর্জমায় সংরক্ষিত আরও বিভিন্ন গ্রন্থ এবং আধুনিক ঐতিহাসিকরা অন্যান্য যে সব প্রাসঙ্গিক তথ্যাদি সংকলন ও বিশ্লেষণ করেছেন, সেগুলিরও পরীক্ষা-নিরীক্ষা প্রয়োজন। বর্তমান গ্রন্থের ভূমিকায় আমরা এ জাতীয় একটা প্রয়াস করেছি; আমাদের বিশ্বাস সিদ্ধদের রচনা যতটুকু আমাদের কাছে পৌঁছেছে তার মর্মার্থ বোঝার জন্য অতি বিদগ্ধ, সূক্ষ্ম, ও পল্লবিত দার্শনিক তত্ত্বের চেয়ে এই আন্দোলনটির স্বরূপ বোঝার চেষ্টা তুলনায় অনেক বেশি প্রাসঙ্গিক। এই গ্রন্থের ভূমিকায় তাই দেখাবার চেষ্টা করেছি যে পদকর্তাদের রচনার মর্ম উদ্ধারের কাজে মুনিদত্তর বহুপ্রচারিত টীকাটিও আমাদের পক্ষে সহায়ক না হয়ে বরং কিছুটা বাধা হয়েই দাঁড়ায়। আমাদের বক্তব্যের সমর্থনে আমরা সরহপাদের প্রখ্যাত 'দোহা কোষ'-এর পূর্ণাঙ্গ ও আক্ষরিক অনুবাদ ভূমিকায় ব্যবহার করেছি।

এখানে 'চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি' ও তার এই বাংলা অনুবাদ সম্পর্কে আরও দু-একটি কথা বলা দরকার।

প্রথমত, আপাতদৃষ্টিতে আজগুবি ও অলৌকিক কাহিনীর সংকলন বলে মনে হলেও অভয়দত্তশ্রীর গ্রন্থটি সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে সে যুগের সাধারণ মানুষ ও তার সমাজ—বিশেষ করে ব্যাপক সিদ্ধ-আন্দোলনের স্বরূপ বোঝার চেষ্টা করা যায় না। তাই এই অনুবাদ। স্বভাবতই এই অনুবাদের উদ্দেশ্য সাধ্যমতো আক্ষরিক। ফলে অনেক সময় লেখা সুখপাঠ্য হয়নি। কারণ ভাষার লালিত্য সংযোজনার স্বাধীনতার চেয়ে তার যথার্থতার প্রতিই এখানে সতর্ক দৃষ্টি রাখা হয়েছে।

প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যায় যে রবিনসন (J. B. Robinson) নামে জনৈক লেখক এই গ্রন্থটির একটি ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেছেন। বইটির নামকরণ তিনি করেছেন, The Buddha's Lions। এই অদ্ভুত নামকরণের কারণ কিন্তু তিনি ব্যাখ্যা করেননি—এর থেকেই বোঝা যায় যে অনুবাদের নামে তিনি প্রচুর স্বাধীনতা দেখিয়েছেন।

সারনাথ থেকে হিন্দীতেও সম্প্রতি আরেকটি অনুবাদ প্রকাশিত হয়েছে। এই অনুবাদের সঙ্গে তিব্বতী শাস্ত্র ও সাহিত্যবিশারদ—তিব্বতী যাঁদের মাতৃভাষা—এমন পণ্ডিতদের সম্পর্ক আছে বলেই স্বাভাবিকভাবে অনুবাদটি তুলনায় অনেক বেশি মূল্যবান। কিন্তু মূল গ্রন্থের যে কটি সংস্করণ আমার হাতে পৌঁছেছে, সেগুলির সঙ্গে খুঁটিয়ে মেলাবার চেষ্টা করে মনে হয়েছে এই হিন্দী অনুবাদটি অল্পবিস্তর ব্যাখ্যামূলক, আক্ষরিক নয়। বোধহয় একালের পাঠকদের বোঝবার ও বোঝাবার সুবিধার জন্যই হিন্দী অনুবাদক এই পন্থা অবলম্বন করেছেন। তবুও অকপটে

স্বীকার করছি যে আমার নিজের বাংলা অনুবাদটি পরিমার্জনার জন্য নানাভাবে আমি হিন্দী অনুবাদকের কাছে কৃতজ্ঞ। অবশ্য আমি ব্যক্তিগতভাবে যথাসম্ভব আক্ষরিক অনুবাদেরই পক্ষপাতী। তাই এই হিন্দী অনুবাদের গুরুত্ব স্বীকার করেও আমার মনে হয়েছে বিশেষত বাঙালী পাঠকদের জন্য গ্রন্থটির একটি বাংলা সংস্করণ উপেক্ষণীয় হবে না। এখানে বলে রাখা ভালো, আক্ষরিক অনুবাদের জন্যই বাংলার সঙ্গে হিন্দী অনুবাদের কমবেশি পার্থক্য থেকে গিয়েছে।

পরিশেষে, পাঠকদের সুবিধার জন্য আরও কয়েকটি কথা বলা দরকার।

ভারতীয় শব্দ, বিশেষত নাম ব্যবহারের সময় তিব্বতী লেখকরা কখনও তার আক্ষরিক প্রতিশব্দ দেবার চেষ্টা করেন, কখনও বা তিব্বতী হরফে হুবহু মূল শব্দটি দিয়েছেন। বিশেষত দ্বিতীয় ক্ষেত্রে—তিব্বতী হরফে ভারতীয় নাম থাকলে—এই অনুবাদে নামটির আগে একটি তারকাচিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অবশ্য তিব্বতী অনুবাদক মোনড়ুপ শেরব-এর লেখনীতে তিব্বতী হরফে ভারতীয় নাম অনেক সময়েই সঠিক বা অবিকৃতভাবে লিপিবদ্ধ হয়নি। যেমন নালন্দার জায়গায় নলেন্দ্র, বিক্রমশীলের জায়গায় বিকামশীল তিনি বারবার লিখেছেন। কখনও বা একই স্থান-নাম দুভাবে তিনি লিখেছেন। বর্তমান শ্রীলংকার উল্লেখে কখনও পরিষ্কার তিব্বতী হরফে লংকাপুরী পাওয়া যাচ্ছে; কখনও বা তিব্বতী হরফে সিঙ্গ বা সিঙ্গল লিখে তারপর দ্বীপের তিব্বতী শব্দ লিং তিনি ব্যবহার করেছেন।

আমার অনুবাদে তিব্বতী গ্রন্থে যা আছে, কোনও বদল না করে তাই রাখা হয়েছে, শুধু কোথাও কোথাও প্রয়োজন বোধে প্রশ্নবোধক চিহ্ন আর অতিপরিচিত নামগুলিকে ব্র্যাকেটে দেওয়া হয়েছে সঠিকভাবে।

তিব্বতী গ্রন্থে যেখানে বৌদ্ধশাস্ত্রসম্মত যোগদর্শনের পাণ্ডিত্যপূর্ণ পারিভাষিক শব্দ বর্তমান, সেখানে অনুবাদে ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা সংযোজন করলে হয়তো পাঠকের কিছুটা সুবিধা হতো। কিন্তু আমার বিচারে এ জাতীয় পারিভাষিক শব্দ সিদ্ধ-সাহিত্য ও সিদ্ধ-আন্দোলনের উপরে অল্পবিস্তর প্রক্ষিপ্ত বলে বিবেচিত হওয়ায়—ব্যাখ্যামূলক পাদটীকা আমি সাধ্যমতো বর্জন করেছি। অসঙ্গ প্রমুখ বৌদ্ধ দার্শনিকদের যোগ-প্রসঙ্গে ধ্যান-ধারণার বিস্তৃত বিবরণ গ্রন্থান্তরে প্রাপ্য। বিশেষত সে বিষয়ে যে পাঠকের প্রধান উৎসাহ তিনি অবশ্যই নলিনাক্ষ দত্ত প্রমুখের উচ্চাঙ্গ আলোচনা পড়ে দেখবেন।

চতুরশীতি-সিদ্ধ-প্রবৃত্তি

মঙ্গলাচরণ

সদ্‌গুরুদের প্রণাম।

ত্রিকাল বুদ্ধদের, গুরুপরম্পরায় প্রয়াত গুরুদের ও পরমসিদ্ধিপ্রাপ্ত আমার গুরু অভয়শ্রীর চরণ*পদ্মে কায়-বাক্-চিত্ত এই তিন সহযোগে প্রণাম করছি।

তারপর *গুরু *লূইপা ইত্যাদি চুরাশি সিদ্ধদের সত্য বিবরণ লিখব।

*লূইপা

এখন তাহলে *গুরু *লূইপার কাহিনী : মাছের অন্ত্র খেতেন বলে তাঁর নাম হয়েছিল *লূইপা।

এক যে ছিলেন রাজা। রাজ্য তাঁর কুবেরের মতো, আর প্রাসাদ তাঁর সোনা-রূপো মণি-মুক্তায় অলংকৃত।

তাঁর তিন পুত্র। রাজা মারা গেলে কোন্ রাজপুত্র রাজ্যধারণ করবেন, একদিন জ্যোতিষী ডেকে এই গণনা করানো হলো। জ্যোতিষী বললেন, মধ্যম পুত্র রাজা হলে রাজ্য শক্তিশালী হবে, প্রজারাও সুখী হবে। এই রকম আরও বিবিধ মঙ্গলের কথা বলায় পিতা তাঁকেই রাজ্যভার দিলেন। বড় ভাই, ছোট ভাই এবং প্রজারাও তাঁকেই অভিষেক দিতে চাইলেন। কিন্তু (মধ্যম পুত্রের রাজা হবার) ইচ্ছা না থাকায় তিনি পালাবার চেষ্টা করলেন। বড় ভাই, ছোট ভাই ও প্রজারা সবাই মিলে তখন তাঁকে সোনার শিকল দিয়ে বেঁধে রাখলেন। প্রহরী ও কারারক্ষককে সোনা রূপো ঘুষ দিয়ে রাতে সেলাই করা পোষাক পরে (অর্থাৎ সাধারণ বেশে) চলে গেলেন, পথপ্রদর্শককেও সোনা ইত্যাদি পুরস্কার দিয়ে রাজা *রামল-র দেশ *রামেশ্বরে তিনি পৌঁছলেন।

(রাজপুত্র) কিংখাবের আসন ছেড়ে *কৃষ্ণসারের আসনে বসলেন ও রাজশয্যা ত্যাগ করে ধূলায় শয়ন করলেন। সুরূপ ও সুদর্শন সেই রাজপুত্রকে দেখে সকলে তাঁকে নিয়তই খাদ্য ও যা কিছু প্রয়োজন দান করতেন।

তারপর বজ্রাসনে গেলে তাঁকে গ্রহণ করে উপদেশ দিলেন এক ডাকিনী। রাজার নিজের দেশ *সালিপুত্রে গেলেন আর সেখানে তিনি যার-তার-দেওয়া খাদ্য খেয়ে শ্মশানে শুয়ে রইলেন।

তিনি একদিন বাজারে শুঁড়িখানায় গেলেন। শুঁড়িনীদের প্রধানা ছিলেন এক লোক-ডাকিনী। রাজপুত্রকে দেখে তিনি বললেন, 'এই ব্যক্তির চতুঃচক্র সম্পূর্ণ শুদ্ধ হয়েছে, কিন্তু হৃদয়ে রতিমাত্র কুলকল্পনার অশুদ্ধি (এখনও) যায়নি।'

তারপর সেই স্ত্রীলোকটি রাজপুত্রের পাতে পচা খাবার ঢেলে দিলেন। রাজপুত্র সেটা ফেলে দিলেন দেখে ডাকিনী রেগে গিয়ে বললেন, 'খাদ্য-অখাদ্যের বিকল্প তুমি যদি ছাড়তে না পারো, তাহলে তোমার ধর্ম হবে কী করে ?'

বোধির বাধা হয় জেনে রাজপুত্র তখন বিকল্প লক্ষণ ত্যাগ করলেন। জেলেরা

*গঙ্গা থেকে মাছ ধরে তার নাড়িভুঁড়ি মাটিতে ফেলে দিলে তিনি সেগুলি নিয়ে খেতেন। এইভাবে বারো বছর সাধনা করলেন।

মাছের অন্ত্র খেতেন বলে জেলেনীরা তাঁকে *লূইপা বলে ডাকতে লাগলেন। চারিদিকে তিনি *লূইপা নামে খ্যাত হলেন। এই নামে তাঁর সিদ্ধি হল।

এই কাহিনী আবার *দারিকপা ও *দিংকিপার সময়েও বলা হবে।

মহাসিদ্ধ *লূইপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*লীলপা

*গুরু *লীলপার কাহিনী।

দক্ষিণ ভারতের এক রাজা এক সময়ে সিংহাসনে বসেছিলেন। ভিনদেশী এক যোগী সেই সময়ে তাঁর কাছে এলেন।

তাঁকে দেখে রাজা বললেন, 'দেশে দেশে ভ্রমণ করে আপনি ক্লিষ্ট হয়েছেন।'

'আমি কিছু কষ্টভোগ করছি না, কিন্তু আপনি নিজেই ক্লিষ্ট। রাজ্য হারাবার ভয়ে প্রজাদের অসন্তোষের আশংকায় আপনি সর্বদাই বিব্রত। আমি আগুনে লাফিয়ে পড়লেও পুড়ব না, বিষ খেলেও মরব না। রসায়নের সিদ্ধি আমার আছে।'

তাঁর কথা শুনে রাজার শ্রদ্ধা হলো।

'আপনার মতো আমি রাজ্যে রাজ্যে ঘুরে বেড়াতে পারব না। কিন্তু যাতে রাজাসনে বসে ধ্যান করতে পারি, আমাকে এমন এক উপদেশ দিন।'—প্রণাম করে রাজা এই প্রার্থনা জানালেন।

যোগী তখন তাঁকে হেবজ্র অভিষেক দিয়ে একাগ্র সমাধিতে বসালেন।

রাজা, রাণী ও মন্ত্রীদের দ্বারা পরিবৃত হয়ে বান্ধবৃন্দের মধ্যে কিংখাবের তাকিয়া নিয়ে গদিতে বসে সাধনা করতে লাগলেন। লীলা বা লাস্য ইত্যাদির মধ্যে থাকতেন বলে *লীলপা নামে খ্যাত হলেন।

মূল উপদেশটি ডান হাতের আংটিতে রেখে অবিচলভাবে ধ্যান করলেন। যোগী তাঁকে এই অবস্থায় থেকে হেবজ্র দেবগণকে ধ্যান করতে উপদেশ দিলেন।

তিনি একত্রে উৎপন্ন-ক্রম ও সম্পন্ন-ক্রম ধ্যান করলেন। সেই ধ্যানের মধ্যেই বোধির উদয় হলো। *লীলপা মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন ও অভিজ্ঞান ইত্যাদি নানা গুণ সম্পন্ন হলেন।

এই পথে গুরুর উপদেশ, স্বীয় উদ্যম ও পূর্বকর্মের অবশেষ—এই তিনটিকে একত্র করতে পারলে ভোগবিলাস ত্যাগ না করেও মুক্ত হওয়া যায়।

ইনি অপরিমিত প্রাণীহিত করলেন, সর্বত্র *লীলপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন। শেষে তিনি খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *লীলপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*বিরূপা

*গুরু *বিরূপার কাহিনী।

*বিরূপা পূর্বদিকে রাজা *দেবফলের (? দেবপাল) রাজ্য *ত্রৈয়ুর-এ জন্মগ্রহণ করেন।

ভারতের দক্ষিণদিকে (!) *সোমপুরী নামে এক বিহার ছিল। সেখানে এক সহস্র সংঘের এক বিশাল ধর্মসংস্থা ছিল।

*বিরূপা ভিক্ষু ছিলেন, তবুও তিনি অভিষেক গ্রহণ করে বজ্রবরাহীর এক কোটি মন্ত্র দুবার করে জপ করলেন। এইভাবে বারো বছর কাটল। কিন্তু স্বপ্নেও সিদ্ধির লক্ষণ দেখতে পেলেন না। তখন হতাশ হয়ে জপের মালা আস্তাকুঁড়ে ফেলে দিয়ে মনের সুখে তিনি যথেচ্ছভাবে দিন কাটালেন। সন্ধ্যা বেলায় (পূজার সময়) মালা নেই এ খেয়াল হল।

তাঁর হাতে মালা দিয়ে ডাকিনী তাঁকে উপদেশ দিলেন।

'কুলপুত্র, দুঃখ কোরো না। আমি তোমাকে আশীর্বাদ দেবো। বিকল্প লক্ষণ ত্যাগ করার সাধনা কর।'

'চিত্তকে প্রকৃতিতে (সহজে) স্থিত রাখাই বজ্রবরাহীর উপদেশ।
নিজের থাকতেও অন্যের অপেক্ষা করা অতি মূর্খতা ও শিশুত্ব।
চিত্তই চিন্তামণি, তাকে বিকল্প দিয়ে কোরো না আবৃত।
সন্তোষের সঙ্গে এই সাধনাতেই পরমাসিদ্ধি।'

তারপর আরও বারো বছর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন।

ভৃত্য মদ ও মাংস কিনে এনে তাঁকে পরিবেশন করল।

তিনি তারপরে বিহারের সব পায়রা মেরে খেয়ে ফেললেন। পায়রা সব শেষ হয়ে গেলে সংঘের ভিক্ষুরা বললেন, 'আমাদের পূজার স্থানে এদের কে খেয়েছে?'

ভদন্তরা সকলেই বললেন, 'কখনই আমরা খাইনি।' বিহারের সকল প্রকোষ্ঠ অনুসন্ধানের পর *বিরূপার ঘর দেখতে পাঠানো হল। জানলা দিয়ে দেখা গেল, তিনি পায়রার মাংস আর মদ খাচ্ছেন।

সংঘ ঘণ্টা বাজিয়ে সভা ডেকে তাঁকে সেখান থেকে বিতাড়িত করলেন। চীবর ও ভিক্ষাপাত্র মূর্তির সামনে সমর্পণ করে *বিরূপা প্রণাম করে সংঘ ত্যাগ করে গেলেন।

সেই বিহারের পাশে একটা বড় পুকুর ছিল। একজন ভিক্ষু সেখানে *বিরূপাকে দেখে বললেন, 'আপনি কোন পথে যাবেন?'

'আমায় আপনারা তাড়িয়ে দিয়েছেন, আবার পথের কথা জিজ্ঞাসা করছেন কেন?'

এই বলে তিনি পুকুরের জলে পদ্মপাতার উপরে পা রাখলেন। পদ্মগুলি কিন্তু ডুবল না। পদ্ম তুলে বুদ্ধ পূজা করতে করতে তিনি সেইভাবে পদ্মপাতায় পা দিয়ে জল পার হয়ে চলে গেলেন।

*সোমপুরীর সব লোক বিলাপ করতে করতে তাঁর চরণ ধরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'পায়রাগুলি আপনি কেন মারলেন?'

'আমি মারিনি, ওরা আছে'—বলে ভৃত্যকে দিয়ে পায়রার ডানার টুকরোগুলি আনালেন। আচার্য তুড়ি দিতেই সেগুলি আবার পায়রা হয়ে গেল। পায়রাগুলিকে তিনি আগের চেয়েও বড় ও সুন্দর করে দিলেন। সবাই তাদের আকাশে উড়ে যেতে দেখলেন।

তারপর *বিরূপা ভিক্ষুর আচার-আচরণ ছেড়ে দিয়ে যোগীর চর্যা পালন করতে লাগলেন।

*গঙ্গাতীরে গিয়ে তিনি *গঙ্গাদেবীর কাছে খাদ্য পানীয় চাইলেন, *গঙ্গা দিলেন না। রেগে গিয়ে আচার্য দুভাগে *গঙ্গার জল কেটে পার হয়ে গেলেন।

তারপর *কনসত নগরে গিয়ে এক শুঁড়িনীর কাছে মদ কিনলেন। সে তাঁকে বাটিতে মদ ও থালায় ভাত দিল। তিনি তা খেতে লাগলেন আর আড়াই দিন পর্যন্ত সূর্যকে অস্ত যেতে দিলেন না।

রাজা অবাক হয়ে 'এ কার যাদুবিদ্যার ফল!'—বলে শোরগোল তুললেন।

সূর্যদেবী (!) রাজাকে স্বপ্নে দর্শন দিয়ে বললেন, 'এক যোগী আমাকে শুঁড়িনীর কাছে বন্ধক রেখেছে।'

রাজা এবং লোকজনরা সবাই খোঁজ নিলেন। আচার্যর মদের হিসেব করে দেখা গেল, এক কোটি পাত্রের দাম হয়েছে। রাজা সেই দাম দিয়ে দিলেন। *বিরূপা সেখান থেকে অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

তারপর তিনি *ইন্দ্র নামে এক তীর্থিকের দেশে গেলেন। সে দেশে মহেশ্বরের একটি একাশি হাত উঁচু মূর্তি ছিল। তাঁকে বলা হল সেই মূর্তির সামনে প্রণাম করতে।

আচার্য বললেন, 'আমি জ্যেষ্ঠ, কনিষ্ঠকে প্রণাম করা আমার উচিত নয়।'

'না করলে তোমাকে হত্যা করা হবে।' —রাজা আর অন্য সবাই এ কথা বললেন।

আচার্য বললেন, 'প্রণাম করলে আমার পাপ হবে, তাই করছি না।'

'পাপ হলে, সে পাপ আমার হবে।'—রাজা এ কথা বলায় আচার্য হাত জোড় করা মাত্র *মহাদেবের মূর্তি দুটুকরো হয়ে ভেঙে গেল।

অন্তরীক্ষে এক বাণী শোনা গেল, 'আমি শপথ নিচ্ছি আপনার আদেশ শুনব।'

'তাহলে প্রতিজ্ঞা কর।' শপথ নেওয়ায় আবার ভাঙা দেবতার মূর্তি জুড়ে গেল। তখন *মহাদেবের পূজার জন্য সংগৃহীত উপকরণসমূহ আচার্যকে নিবেদন করা হল। সেগুলি দিয়ে অন্য বৌদ্ধদের ভরণপোষণের ব্যবস্থা হল, সেই ব্যবস্থা এখনও প্রচলিত আছে।

আচার্য এর পরে পূর্ব ভারতের *দেবীকোটে গেলেন। সে দেশের সকলে ডাকিনী হয়ে গিয়েছিল। একজন ডাকিনী পথের ধারে বসে ডাকিনী-মন্ত্র প্রয়োগ করত—তাদের ধর্মকর্মের এই ছিল বিধিবিধান।

আচার্য আগেই গিয়ে এক মন্দিরে শুয়ে রইলেন। বাইরে থেকে এক ব্রাহ্মণশিশু তখন সেখানে আসছিল, তার উপরে মন্ত্র ফুঁকে ডাকিনী তাকে ছেড়ে দিল। নগরে গিয়ে সে আহার পেল, কিন্তু শোবার জায়গা তার মিলল না।

তার সঙ্গে এক বৌদ্ধের দেখা হল। সেই বৌদ্ধ ব্রাহ্মণশিশুকে বললেন, 'এ দেশে সবাই ডাকিনী হয়ে গেছে, কেউ মানুষ নেই। এরা সবাই অনিষ্ট করে। তাই, ঐ মন্দিরে গিয়ে থাক।'

এ কথা শুনে ব্রাহ্মণশিশু সেখানে গেল। আচার্য *বিরূপা সেই ব্রাহ্মণকে মন্ত্র ও আশীর্বাদ দিয়ে রাখলেন।

ডাকিনীরা এদিকে একসঙ্গে বসে পূজার কী কী সামগ্রী আছে আলোচনা করছিল। 'আর সবই আছে, শুধু মহামাংস নেই' বলায় তাদের মধ্যে একজন বলল, 'মহামাংসের জন্য আমি দুজন মানুষকে আকর্ষণ করে আনছি।'

'তাহলে নিয়ে এসো'—বলায় সে আশীর্বাদপ্রাপ্ত ব্রাহ্মণশিশুকে আনতে গেল, কিন্তু চেষ্টা করেও আনতে পারল না।

*বিরূপা একটি গাছের উপরে বসে ছিলেন। তাঁকে ধরে আনবার জন্য বার-বার ডাকিনীকে পাঠানো হল, শেষ পর্যন্ত সে গাছশুদ্ধ *বিরূপাকে নিয়ে এল।

ডাকিনীরা তাদের পূজার জন্য যে মদ এনে রেখেছিল *বিরূপা তা সব নিঃশেষ করলেন। *বিরূপাকে হত্যা করবে ঠিক করে ডাকিনীরা তাদের অট্টহাসি হাসল। আচার্য তাঁর বারোটা হাসি হেসে দিলেন আর তাতেই ডাকিনীরা অজ্ঞান হয়ে গেল।

আচার্য তখন ডাকিনীদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করিয়ে শরণগমন করালেন, শপথ নেওয়ালেন :

'আমাকে শ্রদ্ধা করে এমন প্রাণীদের ক্ষতি করবে না। চিত্তোৎপাদন ও শরণগমন করে না এমন প্রাণীদেরও ক্ষতি না ক'রে এক অঞ্জলি পরিমাণ রক্তপান করতে পার। এ-আদেশ অমান্য করলে এই চক্র দিয়ে তোমাদের মাথা কেটে নেওয়া হবে আর উত্তরের যক্ষ তোমাদের রক্তপান করবে।'

এখনো সেই যক্ষ ও চক্রের আকার আকাশে দেখা যায়।

ধর্ম রক্ষা করবার জন্য তাদের প্রতিজ্ঞাবদ্ধ করে আচার্য অন্যত্র চলে গেলেন।

আবার তিনি *দেবীকোটেই ফিরে গেলেন। পথে *মহাদেব ও *উমাদেবী সাড়ে চার লক্ষ মানুষের বাসযোগ্য এমন এক নগরী সৃষ্টি করলেন। ত্রয়ত্রিংশ দেব স্থানের সবগুলি থেকে ভোজ্য এনে *বিরূপাকে তাঁরা এক মহাপূজা নিবেদন করলেন।

*বিরূপা তখন এক শ্লোক রচনা করলেন :

'*সোমপুরী মহাবিহারে—
প্রব্রজ্যা উপসম্পদা ও বিনয়ের শীল
যিনি সম্যক পালন করেছেন ;
পূর্ব কর্মফলের প্রভাবে
অভিষেক, আশীর্বাদ ও উপদেশ
যিনি সম্যক লাভ করেছেন ;

সাধনা করলেন বারো বছর ধরে
কিন্তু স্বপ্নেও এল না তাঁর সিদ্ধির লক্ষণ।
তাই বিরক্ত আর হতাশ মনে মালা ছুঁড়ে
ফেলে দিলেন তিনি।
বচন দান করলেন ডাকিনী,
তার প্রভাবে বৃদ্ধি পেল ধাতুর শক্তি।
সম্যক জানলেন সংসারের স্বরূপ,
আর আচরণ করলেন নির্বিকল্প চর্যা।
তাঁর ভুল বিচার করল অস্তিবাদী সংঘ
তাড়িয়ে দিল তাঁকে সংঘ থেকে।
এদের সকলের ভ্রান্তি দূর করতে
সাধনা করলেন জলে না ডোবার।
গঙ্গার ধারাকে বিপরীত করলেন,
বহুবিধ ভোজন করলেন,
বন্ধক রাখলেন সূর্যকে,
ভোগ করলেন মদ্যাদি
ভাঙলেন তীর্থিক দেবমূর্তি,
দর্পচূর্ণ করলেন তার,
দমন করলেন *দেবীকোটের লোকডাকিনীদের।
*মহাদেব তাঁর মাহাত্ম্য কীর্তন করলেন,
মায়ানগরী সৃষ্টি করে আরাধনা করলেন তাঁর।—
এই সব আচরণ যদি আমি না করতাম
তাহলে লক্ষণযুক্ত ধর্মের বৈশিষ্ট্যের প্রতি
লোকের শ্রদ্ধা কী করে হত?'

—এই বলে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

গুরু *বিরূপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*ডোম্বিপা

*গুরু *ডোম্বিপার কাহিনী।

জন্ম *মগধদেশের রাজকুলে। তিনি হেবজ্রসাধনায় সিদ্ধিলাভ করেছিলেন।

কৃষ্ণাচার্য-র কাছে তিনি অভিষেক ও উপদেশ গ্রহণ করে অক্ষরে অক্ষরে তা পালন করতেন, প্রজাদের একমাত্র সন্তানের মতো ভালবাসতেন।

রাজা ধর্মে প্রবেশ করেছেন—এ কথা সকল মানুষের অজ্ঞাত থাকল। প্রজাদের প্রতি তাঁর আন্তরিক মৈত্রীভাব দেখে সবাই আলোচনা করতে লাগল, 'রাজা কোন্ ধর্ম অবলম্বন করেছেন ?'

রাজা একদিন মন্ত্রীকে বললেন, 'আমাদের এই দেশে চোরের ভয়ে সবাই সন্ত্রস্ত। কর্মদোষে অধিকাংশই দরিদ্র। এদের সবাইকে ভয় ও অভাব থেকে রক্ষা করতে হবে, সেই উদ্দেশ্যে কাঁসার এক বিরাট ঘণ্টা এক বনস্পতির চূড়ায় বেঁধে দাও। কারও ক্ষয়-ক্ষতি বা অভাব দেখলে এই ঘণ্টা বাজানো হবে, না হলে নয়।' রাজার আদেশ অনুযায়ী মন্ত্রী ব্যবস্থা করলেন। ফলে, *মগধে এতকাল যে ভীতি ও অভাব ছিল, তা দূর হল।

অন্য এক সময়ে রাজধানীতে শূদ্রকূলের এক গায়ক দল এসে রাজাকে গীতবাদ্য নিবেদন করল। সেই গায়কদলের মূল গায়কের বারো বছরের মেয়েটি তখনও সংসার ধর্মের বসন পরেনি। সুন্দর আকৃতি, উত্তমবর্ণা, নয়ন-লোভনা সেই কন্যা *পদ্মিনীর সর্বগুণে গুণান্বিতা ছিল।

রাজা সেই নীচ জাতীয় গায়ককে বললেন, 'তোমার এই কন্যাটি আমাকে দাও।'

গায়ক বললেন, 'আপনি *মগধের রাজা, আট লক্ষ নগরের অধিপতি। রাজৈশ্বর্যের অভাব নেই, প্রকৃতই আপনি মহারাজা। আমি নীচজাতীয়, শূদ্র বলে সবাই আমাকে ঘৃণা করে। আপনার এই আদেশ সঙ্গত নয়।'—এই বলে তিনি অনুনয় করলেন।

রাজা কিন্তু তবুও পীড়াপীড়ি করতে লাগলেন। পিতাকে কন্যার দেহের সমান ওজনের সোনা দেওয়ায় পিতাও কন্যাটিকে দান করলেন।

রাজা গোপনে বারো বছর ধরে কন্যাটিকে মুদ্রারূপে ভোগ করলেন, বারো বছর পরে সকলে তা জানলেন।

রাজা নীচকুলের কন্যা গ্রহণ করেছেন *মগধের সর্বত্র একথা রাষ্ট্র হল।

রাজা তখন রাজপুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে শূদ্রাণীর সঙ্গে বনে গেলেন, উভয়ে সেখানে বারো বছর সাধনা করলেন।

কিন্তু রাজপুত্র ও তাঁর পরিষদবর্গ সুষ্ঠুভাবে রাজ্য চালাতে পারলেন না বলে রাজ্য আগের তুলনায় শ্রীহীন হয়ে গেল।

সবাই মিলে পরামর্শ করে সিদ্ধান্ত করলেন যে আগের রাজাকেই খুঁজে এনে রাজত্বে বসানো দরকার।

কয়েকজনকে সেজন্য পাঠানো হল। রাজা যেখানে বাস করছিলেন, সেখানে তাঁরা গেলেন। দেখলেন রাজা একটি বৃক্ষমূলে বসে আছেন। আর সেই কন্যা জল আনতে চলেছেন। সরোবরের জলে পদ্মপাতা ভাসছিল। পদ্মপাতাগুলি জলে না ডুবিয়ে তিনি তাদের নীচে পনেরো মানুষ গভীর তল থেকে জল তুলে নিলেন।

রাজাকে যাঁরা আমন্ত্রণ করতে গিয়েছিলেন, এই দৃশ্য দেখে তাঁরা অবাক হয়ে গেলেন। দেশে ফিরে গিয়ে তাঁরা সবাইকে এই কাহিনী বললেন। রাজ্যের প্রজারা সবাই তাঁদের ফিরে আসবার জন্য অনুনয় জানালেন।

সেই আমন্ত্রণে মাতা-পিতা দুজনে এক নিঃশাবক বাঘিনীর পিঠে চাপলেন, চাবুক করে হাতে নিলেন এক বিষধর সাপ। এই ভাবে তাদের আসতে দেখে সবাই বিস্মিত হয়ে বললেন, 'রাজ্যধারণের যোগ্যতা আপনারই আছে, তাই দয়া করে রাজ্যভার গ্রহণ করুন।'

রাজা বললেন, 'আমি নীচকুলের মানুষ, কী করে আমি রাজত্ব করতে পারি ? তবে উচ্চ ও নীচকুলের বিচার মৃত্যুই একমাত্র দূর করতে পারে। তাই অগ্নিতে আমাদের দাহ কর। তারপর আবার জন্ম নিয়ে তোমাদের কথামত কাজ করব।'

তাঁর কথা শুনে দেশের সব লোক *গোশীর্ষ চন্দনকাঠ দিয়ে তাঁদের দাহ করলেন। অনেক কাঠ ছিল তাই সাত দিনেও আগুন নিভল না।

সেই অগ্নিচিতায় প্রজারা দেখলেন এক সদ্য প্রস্ফুটিত *পদ্মে উজ্জ্বল শিশির-বিন্দুর মতো তাঁরা স্বয়ং উদ্ভূত হলেন আর সপত্নীক হেবজ্রের আকার ধারণ করলেন। এই দৃশ্য দেখে *মগধের সব মানুষের গভীর শ্রদ্ধা হল।

আচার্য *ডোম্বিপা নামে ইনি খ্যাত হলেন। রাজা তখন মন্ত্রী প্রভৃতি সকলকে বললেন, 'আমার মতো যদি আপনারা করতে পারেন, তবেই রাজ্যভার নেব, নইলে নয়।'

তাঁরা হতচকিত হয়ে বললেন, 'এরকম করার ক্ষমতা অন্য কার আছে ? তাই আপনিই সিংহাসনে বসুন।'

রাজা আবার বললেন,

'রাজ্য অতি তুচ্ছ, বহু দোষে দুষ্ট।
ধর্মের রাজত্ব করছি আমি।'

—এই বলে প্রাণীহিতের জন্য খসর্পণে গেলেন।

*গুরু ডোম্বিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*শবরিপা

*গুরু *শবরিপার কাহিনী।

*মন্ত্রবিক্রম নামে এক পর্বতে *শবরিপা নামে এক ব্যাধ ছিলেন। পশুবধই ছিল তাঁর পেশা। জীবিকার জন্য মাংসাশী এই ব্যাধ সর্বদাই বহুসংখ্যক প্রাণী হত্যা করতেন। এইভাবে ক্রমাগত তিনি হিংসার পাপ করে চলেছিলেন।

তাঁকে দেখে আর্য অবলোকিতেশ্বরের করুণা হলো। তাঁকে বিনীত করবার জন্য আর্য স্বয়ং *শবরিপার মতো এক ব্যাধের রূপ নিলেন। সেই ছদ্মবেশে তিনি *শবরিপার কাছে গেলেন।

'আপনি কে?'—*শবরিপা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন।

তিনি বললেন, 'আমিও এক শবর।'

'আপনার দেশ কোথায়?

'অনেক দূরে।'

সেই ছদ্মবেশীকে আসল *শবরিপা জিজ্ঞাসা করলেন, 'একটিমাত্র তীর দিয়ে কটি হরিণকে আপনি মারতে পারেন?'

'তিনশ মারতে পারি।'—ছদ্মবেশী বললেন।

'ওই শরশিক্ষা তাহলে আমাকেও দিন।'

পরদিন সকালে সেই ছদ্মবেশী *শবরিপাকে সঙ্গে নিয়ে এক বিরাট মাঠে গেলেন, সেখানে পাঁচশ মায়া-হরিণ দেখালেন।

*শবরিপা ছদ্মবেশীকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার এই একটি তীর দিয়ে কটি হরিণ মারবেন?'

'পাঁচশ মারব।'

'চারশ ছেড়ে একশ মারুন।'—*শবরিপা বললেন। ছদ্মবেশী একটি তীর

দিয়ে একশ হরিণ মারলেন । একটি হরিণের মৃতদেহ *শবরিপাকে ধরতে দিলেন । *শবরিপা ধরতে পারলেন না । তাঁর অহংকার চূর্ণ হলো ।

ঘরে ফিরে ছদ্মবেশীকে তিনি বললেন, ‘ধনুর্বাণের এই বিদ্যা আমাকে শেখান ।’

ছদ্মবেশী বললেন, ‘এ শিখতে গেলে একমাস মাংস খাওয়া চলবে না ।’

*শবরিপাও প্রাণীহত্যা ও হিংসা ত্যাগ করলেন ।

সাতদিন বাদে ছদ্মবেশী ফিরে এলেন আর *শবরিপার কাছে গিয়ে জানতে চাইলেন তিনি কী খাচ্ছেন ।

‘ফলাহার করছি ।’—*শবরিপা বললেন । ছদ্মবেশী বললেন, ‘সর্বপ্রাণীর প্রতি মৈত্রী ও করুণা ধ্যান দিন ।’

একমাস পরে ছদ্মবেশী আবার এলেন । *শবরিপা বললেন, ‘আমাকে হরিণ শিকারের ধর্মদেশন করুন ।’

ছদ্মবেশী সেখানে একটি মণ্ডল রচনা করে ফুল ছড়িয়ে দিলেন । তারপর *শবরিপা-দম্পতির দুজনকেই সে মণ্ডলটি দেখতে বললেন ; জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কী দেখছেন ?’

মণ্ডলের ভিতরে তাকিয়ে তাঁরা অষ্ট নরক ও আর সেই নরকে তাঁদের দুজনকে দগ্ধ হতে দেখলেন । দেখে তাঁরা খুবই ভীত হলেন । ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে তাঁদের বাক্‌রোধ হলো ।

ছদ্মবেশী বারবার প্রশ্ন করতে লাগলেন, ‘মণ্ডলে কী দেখছেন ?’

তাঁরা তখন প্রাণীদের দগ্ধ হবার নারকীয় দুঃখের কথা বললেন ।

‘ঐখানে জন্ম হবে, তাই ভয় পাচ্ছেন কি ?’

‘ভয় তো পাচ্ছি, কিন্তু পরিত্রাণের উপায় ?’

‘উপায় আছে, কিন্তু সাধন করবার ক্ষমতা কি আছে ?’

‘নিশ্চয়ই পারব ।’ বলায় *শবরিপা দম্পতিকে ধর্মের এই উপদেশ দিলেন :

> ‘জীব হত্যার ক্রিয়ায় বিভিন্ন কর্মফলের উদ্ভব
> তার ফলেই নরকে আপনার জন্ম হবে ।
> একটি প্রাণনাশ জাগায় আরও প্রাণীহত্যার ইচ্ছা—
> তার প্রভাবে হ্রাস পাবে আপনার নিজের আয়ু ।
> ক্ষীণ হবে পুরুষকারের প্রভাব ।
> প্রাণীহত্যা বর্জনে বোধি লাভ হবে
> ফলে অনিচ্ছা জাগবে প্রাণীবধে

সেই প্রভাবে বৃদ্ধি হবে আয়ু
বর্ধিত হবে পুরুষকারের শক্তি ও সৌন্দর্য।
ও সম্মান।'

—ইত্যাদি দশ অকুশলের দোষ ও দশ কুশলের গুণ ব্যাখ্যা করে উপদেশ দিলেন। তার প্রভাবে *শবরিপার সংসারে বৈরাগ্য এল, ধর্মের প্রতি একাগ্র. শ্রদ্ধাযুক্ত হলেন।

তারপর আর্য অবলোকিতেশ্বর তাঁকে উপদেশ প্রদান করে *দনতি পর্বতে ফিরে গেলেন।

নির্বিকল্পের মহাকরুণা বারো বছর ধরে ধ্যান করে তিনি মহামুদ্রার পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন।

উত্তম সিদ্ধি লাভ করে তিনি একদিন মহাকারুণিক ধর্মতা সমাধি থেকে উত্থিত হয়ে আর্য অবলোকিতেশ্বরের সম্মুখে গেলেন।

*শবরিপার পুণ্যের মাহাত্ম্যকীর্তন করে আর্য বললেন,

'কুলপুত্র, তৃণে অগ্নি দাহনের মত
একদেশদর্শী নির্বাণ উত্তম নয়;
প্রাণীহিতের জন্য তুমি সংসারী হও
ও অপরিমিত প্রাণীহিত কর।'

এই উপদেশ পেয়ে *শবরিপা নিজের দেশে গিয়ে বাস করতে লাগলেন; অভিহিত হলেন *শ্রীশবরিপা নামে। ময়ুরপুচ্ছ ধারণ করতেন বলে নাম হলো ময়ুরবসন, পর্বতে সর্বদা থাকতেন বলে গিরিনাথ—এই তিন নামেই তিনি বিখ্যাত হলেন।

মুদ্রা, চর্যাগান ইত্যাদির দ্বারা তিনি ভাগ্যবানদের হিত করলেন।

মৈত্রেয়র (ভবিষ্যৎ বুদ্ধ) শাসন আরম্ভ না হওয়া পর্যন্ত ইনি সশরীরে জম্বুদ্বীপে অবস্থান করছেন।

*গুরু *শবরিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*সরহপা

*গুরু *সরহপার কাহিনী।

জাতিতে ব্রাহ্মণ। পূর্ব ভারতে *রাজ্ঞি (মতান্তরে রাজ্ঞি) নগরীর বিশেষ একটি অংশের নাম ছিল *রোলি। সেখানে এক ডাকিনীর পুত্র তিনি। ব্রাহ্মণ তিনি, তবুও বুদ্ধের ধর্মে তাঁর শ্রদ্ধা হলো। তারপর অগণিত আচার্যের কাছে ধর্ম শ্রবণ করে গুহ্য মন্ত্রের ধর্মে তাঁর বিশ্বাস জাগল। তখন তিনি ব্রাহ্মণ ও বৌদ্ধ এই উভয় সম্বর রক্ষা করে দিনে ব্রাহ্মণ ও রাতে বৌদ্ধধর্মের নিয়ম পালন করতেন।

ব্রাহ্মণরা সকলেই জানতে পারলেন যে তিনি মদ্যপ। ব্রাহ্মণরা সমবেত হয়ে তাঁকে তাড়িয়ে দেবার জন্য রাজা *রত্নফলের কাছে আবেদন জানালেন।

'আপনি রাজা, ধর্মের নিয়মকানুন যে লণ্ডভণ্ড করে তাকে দেশে থাকতে দেওয়া কি সঙ্গত? *রোলি দেশের পনেরো হাজার নগরের মুখ্যব্যক্তি এই *সরহপা কিন্তু মদ্যপান করে, ইনি অধঃপাতে গেছেন, এঁকে তাড়িয়ে দিন।'

রাজা বললেন, 'পনেরো হাজার নগরের প্রধান যিনি তাঁকে বিতাড়িত করা সমীচীন হবে না।'

এই বলে রাজা *সরহের কাছে গিয়ে বললেন, 'আপনি ব্রাহ্মণ, মদ্যপান করা কি আপনার পক্ষে সঙ্গত?'

*সরহ বললেন, 'আমি মদ্যপ নই। সব ব্রাহ্মণ আর লোকজনদের একত্র করুন, আমি শপথ নেব।'

সকলকে সমবেত করা হলে *সরহ বললেন, 'যদি মদ্যপ হই, তাহলে আমার হাত পুড়বে, যদি না হই তাহলে পুড়বে না।'

এই বলে ফুটন্ত ঘি-এর মধ্যে হাত রাখলেন, কিন্তু হাত পুড়ল না!

রাজা বললেন, 'ইনি কি সত্যই মদ্যপান করেন?' ব্রাহ্মণরা একত্রে বললেন, 'সত্যই পান করেন।'

জলন্ত গলিত তাম্র পান করেও মদ্যপায়ীর কিছু হলো না।

ব্রাহ্মণরা আবার সমস্বরে বললেন, 'তবুও উনি মদ খান।'

'যদি জলে প্রবেশ করলে ডুবে যাই, তাহলে আমি মদ্যপ, যদি না ডুবি, তাহলে নই।'

অন্য এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে দুজনে জলে নামলেন; ব্রাহ্মণ ডুবে গেলেন, কিন্তু *সরহ ডুবলেন না।

*সরহ বললেন, 'আমি মদ্যপ নই।'

*সরহ তখন বললেন, 'আমাকে তুলাদণ্ডে ওজন করা হোক। ভারি হলে আমি মদ্যপ নই, হাল্কা হলে মদ্যপ বলে প্রমাণ হবে।'

সেই মতো একদিকে এক মানুষের সমান ওজনের বাটখারা পরপর তিনটি দিয়ে অন্যদিকে *সরহকে বসিয়ে ওজন করা হলো। *সরহ ভারী হলেন। ছটি (মানুষের সমান ওজনের) বাটখারা দিয়েও *সরহ ভারী হলেন।

তখন রাজা ঘোষণা করলেন, 'এরকম ক্ষমতা যাঁর আছে, তিনি যদি মদ্যপান করেন তো করুন।'

এই বলে রাজা ও ব্রাহ্মণরা সকলে তাঁকে প্রণাম করে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

রাজা, রানী ও প্রজাদের তিনটি গীতের মাধ্যমে উপদেশ দিলেন। এই তিনটি 'দোহাত্রয়' নামে খ্যাত হল।

ব্রাহ্মণরা সকলে নিজেদের ধর্মকর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্মে প্রবেশ করলেন। রাজা পরিষদদের নিয়ে সপরিবারে সিদ্ধিলাভ করলেন।

*সরহ তারপর পঞ্চদশবর্ষীয়া এক পাচিকা কন্যাকে নিয়ে অন্য দেশে চলে গেলেন। সেখানে নির্জন স্থানে বসে তিনি সাধনা করতে লাগলেন, পত্নী আহার্যের ব্যবস্থা করতে গেলেন।

এক সময় তিনি মূলোর তরকারি খেতে চাইলেন। মোষের ঘন দুধে মূলো মিশিয়ে পত্নী তাঁকে পরিবেশন করতে গেলেন। *সরহ সমাধিমগ্ন ছিলেন বলে না দিতে পেরে ফিরে এলেন।

*সরহ বারো বছর পরে সমাধি ভেঙে উঠে বললেন, 'মূলোর তরকারি কোথায়?

তাঁর রন্ধনকুশলা পত্নী বললেন, 'বারো বছর তুমি সমাধি থেকে ওঠোনি, মূলোর তরকারি এখন কোথায় পাবে? এখন বসন্তকালে তো মূলো হয় না!'

এ কথা শুনে *সরহ তাঁর স্ত্রীকে বললেন, 'তপস্যার জন্য আমি পর্বতে যাচ্ছি।'

তখন পত্নী বললেন, 'দেহকে নির্জনে রাখলেই, বিবিক্ততা বা নির্জনতা হয় না। চিত্তকে লক্ষণ ও বিকল্প থেকে মুক্ত করতে পারলেই পরম বিবিক্ততা লাভ করা যায়। তুমি বারো বছর সমাধিস্থ ছিলে, তবুও মূলোর চিন্তার মতো সামান্য চিন্তা থেকে মুক্ত হতে পারলে না! তোমার পর্বতে গিয়ে কী লাভ?'

*সরহ এই (কথার) সত্যতা উপলব্ধি করে লক্ষণ ও বিকল্প ত্যাগ করলেন আর মহামুদ্রার গূঢ় অর্থযুক্ত পরম সিদ্ধি লাভ করলেন।

অপরিমিত প্রাণীহিত করে শেষে পত্নীসহ তিনি খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *সরহপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কংকরিপা

গুরু *কংকরিপার কাহিনী।

দেশ *মঘহুর, জন্ম শূদ্রকুলে।

*মঘহুর দেশে সমান বংশের এক গৃহস্থ পরিবার থেকে তিনি পত্নী গ্রহণ করেন। সংসারের ভোগসুখেই তাঁর দিন কাটছিল। মুক্তির পথ, পুণ্যধর্ম ইত্যাদি নিয়ে তিনি চিন্তাভাবনা করতেন না, লৌকিক ক্রিয়াকর্মেই সবসময় ব্যস্ত থাকতেন।

তাঁর পত্নীর মৃত্যু হলো। তিনি তাঁর মৃতদেহ শ্মশানে বহন করে নিয়ে তার কাছে বসে কাঁদতে লাগলেন।

এমন সময় সুবিজ্ঞ এক যোগী এসে তাঁকে বললেন, 'গৃহস্থ, এই শ্মশানে বসে তুমি কী করছ?'

'হে যোগী, আপনি আমার অবস্থা দেখতে পারছেন না? চক্ষুষ্মান বা অন্ধ যে কোন ব্যক্তিই পত্নীবিহনে শ্রীহীন হয়ে যায়। এ সংসারে আমার চেয়ে দুঃখী কে?'

যোগী তখন গৃহস্থকে বললেন, 'জন্মের অন্তে মৃত্যু ; সংযোগের শেষ বিয়োগ। সর্ব সংস্কার, সর্ব সমুদয় অনিত্য। পৃথিবীতে যে আসবে, সেই দুঃখ ভোগ করবে। পৃথিবীর স্বভাবই দুঃখ, তাই হা-হুতাশ কোরো না। মানুষের শব মাটি-পাথরের মতো, তাকে পাহারা দিয়ে কী করবে? তার চেয়ে তুমি ধর্মের আশ্রয় নিয়ে দুঃখ মোচন কর।'

'যোগী, পৃথিবীতে প্রাণীর মৃত্যুজনিত দুঃখ থেকে মুক্তির উপায় বলুন।' এই প্রার্থনা জানালেন।

'গুরুর উপদেশই এই মুক্তির উপায়।'

'তাই আমাকে দয়া করে দিন।'

—তাঁর এই প্রার্থনায় যোগী তাঁকে নৈরাত্ম্যবিন্দু উপদেশ ও অভিষেক দান করলেন।

গৃহস্থ বললেন, 'আমি তাহলে এইভাবেই সাধনা করি।'

যোগী তাঁকে মৃতা পত্নীর বিকল্প ত্যাগ করিয়ে নৈরাত্ম্যপত্নী সুখশূন্যতার অদ্বয় ধ্যানে প্রবিষ্ট করালেন।

ছ' বছর ধরে নিরন্তর এই চিন্তার ফলে সাধারণ পত্নীর কল্পনা সুখশূন্যতার রসে লুপ্ত হয়ে গেল। তাঁর চিত্ত নির্মল ও শুদ্ধ হলো। চিত্তে মহাসুখ প্রভাস্বরতার রস উৎপন্ন হলো।

'ধুতুরাবিষে পাগল হয়ে যায় মানুষ।
সে প্রভাব দূর হলেই
ফিরে আসে তার চৈতন্য।
তাই অবিদ্যার বিষ দূর হলেই
সত্যের অর্থ স্বপ্রকাশ হবে।'

গুরুর এই উপদেশে সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন।

নাম হলো *যোগী কংকরিপা (কংকালপা)—সেই নামে সর্বদিকে খ্যাত হলেন।

নিজের দেশ *মঘহুর (পাঠান্তরে *ঘহুরি)-এর বহু মানুষকে ধর্মদেশন করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কংকরিপার (পাঠান্তরে কংকালপা) বিবরণ সমাপ্ত ॥

*মীনপা

*গুরু *মীনপার কাহিনী।

জন্ম পূর্ব ভারতের জেলের ঘরে। *গুরু মহাদেবের কাছে তিনি লোকসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়েছিলেন। তিনি *কামরূপ থেকে কিছু দূরে *ইত (পাঠান্তরে লোহিত) নামের সমুদ্রে জেলেদের সঙ্গে সব সময়ে মাছ ধরতেন ও সেগুলি হাটে বিক্রি করতেন।

এক জেলে ছিপের সুতোর সঙ্গে বঁড়শি বেঁধে তার আগায় মাংস (চার) দিয়ে জলে ফেলেছিল। একটা বিরাট মাছ সেটা টেনে দূরে নিয়ে গেল আর সেই টানে জেলেও সমুদ্রের জলে পড়ে ডুবে গেল। বিরাট মাছটি তাকে গিলে ফেললেও কর্মফলে সে জীবিত থাকল।

সেই সময় *উমাদেবী মহেশ্বরের কাছে ধর্মোপদেশ চাইলেন।

মহেশ্বর বললেন, 'আমার এই উপদেশ যে কোনো ব্যক্তির কাছে ব্যাখ্যা করার নয়। অতি গুহ্য এ উপদেশ। সমুদ্রের মধ্যে একটি গৃহনির্মাণ কর, সেখানে বলব।'

দেবীও সেইরকম করলেন। তার অভ্যন্তরে *উমাদেবীকে ধর্মদেশন করলেন মহাদেব। সেই সময় ঘরের নীচে সেই বিরাট মাছটি এসেছিল। ধর্মদেশন বিস্তৃত করে বলার সময় দেবীর ঘুম পেল।

মহেশ্বর যখন *উমাকে জিজ্ঞাসা করছেন, 'বুঝতে পারছো তো?' তখন মাছ বলছে, 'হ্যাঁ, পারছি।' এই বলে উপদেশ শুনল।

ধর্মদেশন শেষ হলে দেবীর ঘুম ভাঙ্‌ল। দেবী বললেন, 'উপদেশ বল।'

মহেশ্বর বললেন, 'আমি তো ধর্মদেশন শেষ করেছি।' দেবী বললেন, 'উপদেশ আমি এই পর্যন্ত শুনেছি, তারপর ঘুমের ঘোরে আর শুনতে পারিনি।'

'কিন্তু—হ্যাঁ, শুনছি—একথা তাহলে কে বলল?' দেবী বললেন, 'আমি তো বলিনি।'

তখন অভিজ্ঞান দৃষ্টি দিয়ে মহেশ্বর দেখলেন, ঘরের নীচে মাছের পেটের মধ্যে একটি মানুষ আছে এবং ধর্ম উপদেশ সেই শুনেছে।

'এ আমার শিষ্য হয়েছে, সেই শপথও গ্রহণ করেছে।' এই ভেবে মহাদেব সেই জেলেকে অভিষেক দিলেন আর সেই জেলেও মাছের পেটে থেকে বারো বছর সাধনা করল।

তারপর *শ্রিতপরি নামক দেশের এক জেলে সেই মহামৎস্যটিকে ধরেছে দেখা গেল।

জেলে তখন ভাবল, 'এই বিরাট মাছটি ওজনে বেশ ভারী, এর পেটের ভিতরে সোনা, রূপোর মতো কোন জিনিস আছে বোধহয়।'

মাছের পেট কেটে দেখা গেল একটি মানুষ। 'তুমি কে?' জিজ্ঞাসা করায় সে বলল, 'আমিও জেলে ছিলাম। অমুক রাজার কালে এই মাছ আমাকে টেনে নিয়ে গিয়েছিল।'

লোকে হিসেব করে দেখল যে সে বারো বছর এইভাবে কাটিয়েছে। সবাই অবাক হয়ে গেল আর তিনি *যোগী *মীনপা নামে খ্যাত হলেন।

*মীনপা মাটির উপরে নৃত্য করলেন, কিন্তু মাটি একটুও দেবে গেল না। পাথরের উপর নাচলেন, তাঁর পায়ের নীচে পাথর গলে পাঁক হয়ে গেল। তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো :

'পূর্ব জন্মের সঞ্চিত কর্ম থেকে মুক্ত হয়েছি,
ধর্মের প্রতি শ্রদ্ধা জেগেছে আমার
এই ভাবেই (ত্রি)সম্পন্ন গুণ যুক্ত হওয়া যায়,
অহো, চিত্তই মহারত্ন।'

—এই উপদেশ দিলেন।

এইভাবে পাঁচশ বছর ধরে তিনি অশেষ প্রাণীহিত করলেন। *মীনপা, বজ্রপাদ, *অচিন্ত্যপাদ এই তিন নামে তিনি বিখ্যাত হলেন।

লোকসিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে ক্রমে তিনি ভূমি মার্গ অতিক্রম করে সশরীরে খসর্পণে গমন করলেন।

*গুরু *মীনপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*গোরক্ষ

*গুরু *গোরক্ষ-র কাহিনী।

ভারতের পূর্বদিকে *দেবপাল নামক রাজার পুত্ররূপে ইনি জন্ম নেন।

তাঁর যখন বারো বছর বয়স তখন মায়ের অসুখ করল। মৃত্যুকালে অন্তিম বাক্যে তিনি পুত্রকে এই উপদেশ দিলেন:

'প্রাণীমাত্রেরই সুখ-দুঃখ সব কিছুই তার পাপ ও পুণ্যকর্মের ফলে হয়, তাই প্রয়োজন হলে জীবনপাত করবে, কিন্তু পাপকর্ম করবে না।'—এই বলে তিনি প্রাণত্যাগ করলেন।

তারপর প্রজারা এসে তাঁর পিতাকে অনুরোধ করল যে ভিন্নদেশ থেকে এক রাজরানী গ্রহণ করা উচিত।

পিতাও দ্বিতীয় রানীকে বিয়ে করবার কিছুদিন পরে মনের দুঃখে (মতান্তরে শিকার করতে) গভীর অরণ্যে চলে গেলেন।

সেই সময়ে একদিন রানী প্রাসাদচূড়ায় উঠে চারিদিক দেখছিলেন। রাজপুত্রকে দেখে তাঁর মনে কামনা জাগল। দূত পাঠিয়ে রাজপুত্রকে তাঁর কাছে আসতে আদেশ করলেন। রাজপুত্র অনিচ্ছা জানালেন।

রাজরানী মনের ক্ষোভে ভাবলেন, 'আমাকে এ অবজ্ঞা করেছে। এই অপমানের প্রতিশোধ নিতে হবে। শত্রুকে কোনভাবে হত্যা করতে হবে।'

এই ভেবে নিজের অনুচরদের আদেশ দিলেন, 'একে হত্যা কর।'

'হত্যা করার মতো মানুষ ইনি নন। রাজার ইনি সেরা ছেলে।'

তাদের এ কথা শুনে রানী ছল করে বুক চিরে রক্তপাত করে সেই রক্ত সর্বাঙ্গে মেখে সম্পূর্ণ বিবস্ত্রা হয়ে শয্যায় শুয়ে রইলেন।

রাজা ফিরে রানীকে এই অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার এ দুর্দশা কেন?'

'তোমার পুত্র মানুষের মত আচরণ করেনি; তাই এরকম হয়েছে।'—রানী উত্তর জানালেন।

রাজা বললেন, 'তোমার এমন অবস্থা করেছে, তাই রাজপুত্রকে হত্যা করা হবে।'

এই বলে দুজন ঘাতককে আদেশ দিলেন, 'গভীর অরণ্যে নিয়ে গিয়ে হাত-পা কেটে একে ফেলে রেখে এসো।'

আদেশ শুনে ঘাতক দুজন ভাবল, 'এঁকে হত্যা করা অনুচিত। নিজের সন্তানকে হত্যা করেও এঁকে রক্ষা করা উচিত।'

রাজপুত্রকে তারা বলল, 'আমরা আপনাকে হত্যা করতে পারব না, আপনার জন্য বরং নিজের পুত্রকে হত্যা করব।'

রাজপুত্র বললেন, 'সেটা অন্যায় হবে, তোমরা আমাকেই হত্যা করো। অন্তিমবাক্যে মা আমাকে উপদেশ দিয়েছেন—শরীর ও প্রাণের জন্যও পাপ কাজ করবে না। পিতা যেমন আদেশ করেছেন, তাই কর।'

ঘাতকরা তখন তাঁর হাত-পা কেটে এক তালগাছের নীচে তাঁকে রেখে ঘরে ফিরে গেল।

তারপর মহাযোগী *অচিন্ত্য এসে রাজপুত্রকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন।

সেখান থেকে প্রায় এক ক্রোশ দূরে রাখাল ছেলেরা গরু চরাচ্ছিল। *অচিন্ত্যযোগী সেখানে গেলেন, তাদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঐ দূরে শকুন যেখানে উড়ছে সেখানে তাল গাছের নীচে এক হাত-পা কাটা মানুষ আছে, কে তার কাছে যেতে পারবে?'

তাদের মধ্যে থেকে গন্ধবণিক কুলের এক তরুণ বলল, 'আমি যেতে পারি। কিন্তু আমি আপনার কার্যসিদ্ধি করলে, আপনিও আমার একটা কাজ করে দেবেন!'

যোগীর কাছে গরুগুলি রেখে সে উড়ন্ত শকুন লক্ষ্য করে গেল এবং এক-কাণ্ড তালগাছের নীচে খণ্ডিত দেহটি দেখে ফিরে এল।

দেহটি সেইভাবে আছে বলায় *অচিন্ত্যযোগী রাখালকে বললেন, 'তোমার কাছে খাদ্যপানীয় কিছু আছে কি?'

রাখাল বলল, 'আমার মনিব সকাল সন্ধ্যা এক বাটি খাদ্য ও পানীয় আমাকে দেন, তার অর্ধেক দিতে পারি।'

'তাহলে তুমি *চৌরঙ্গকে রক্ষা কর।'

রাখাল তখন গাছের পাতা দিয়ে কুটির তৈরি করল। তাকে (হাত-পা কাটা মানুষটিকে) খাবার দিল, নিজের হাতে তার মলমূত্র পরিষ্কার করল। বারো বছর ধরে এই ভাবে করে চলল।

একদিন সে এসে দেখল, সেই মানুষটি উঠে বসে আছেন। রাখাল অবাক হয়ে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি বললেন,

'উপায়কুশল পরমগুরু আমার,
সর্বধর্মের স্বভাব এক বলে দেখিয়েছেন তিনি
ধাতু ও বিদ্যার সমন্বয়ে
আর সুখ-দুঃখ বলে কিছু নেই
পরম আশ্চর্য এই।'

এই উপদেশে প্রকৃতই তাঁর হাত-পা নতুন করে হয়ে গেল।

তারপর আকাশে উঠে গিয়ে তিনি রাখালকে বললেন, 'আমি কি তোমাকে উপদেশ দান করবো?'

রাখাল বলল, 'আমি উপদেশ চাই না। আমার এক গুরু আছেন, তিনি আপনাকে সেবা করতে বলেছেন বলেই আমি এইভাবে আপনার পরিচর্যা করেছি।'

এই বলে ফিরে গিয়ে সে রাখালি করতে লাগল।

একদিন *অচিন্ত্যযোগী রাখালের কাছে এলেন। সে তাঁকে আগের সব কথা বলায় তিনি অত্যন্ত প্রসন্ন হলেন। রাখালকে অভিষেক ও উপদেশ দিয়ে তিনি অন্য দেশে চলে গেলেন।

রাখাল মহামুদ্রা ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করার পরে গুরু সেখানে আবার এলেন; বললেন:

'শতলক্ষ প্রাণীর ত্রাণ না হওয়া পর্যন্ত তুমি বোধি প্রাপ্তির প্রয়াস করবে না।'

সেও যাকে পেল তাকেই অভিষেক দিতে লাগল। তখন *মহাদেব তাকে বললেন, 'সকলকে উপদেশ দিও না, যারা চাইবে, তাদের দেবে। শ্রদ্ধাহীন বা প্রজ্ঞাহীনরা যোগ্য নয়।' তখন থেকে সে এই কথামত কাজ করতে লাগল।

বহু ভক্তকে মোক্ষ দিতেন এবং গোরক্ষা করতেন বলে *গোরক্ষ নামে তিনি

সর্বদিকে খ্যাত হলেন। এখনও পর্যন্ত তিনি ভাগ্যবানদের অভিষেক দিয়ে চলেছেন। যাদের কর্ম শুদ্ধ হয়েছে তারা শুভ সময়ে *ডমরুর ধ্বনি শুনতে পায়। অন্যরা শুনতে পায় না।

*গুরু *গোরক্ষর বিবরণ সমাপ্ত ॥

*চৌরঙ্গ

*গুরু *চৌরঙ্গর কাহিনী।

এর আগের কাহিনীর হাত-পা কাটা সেই রাজপুত্র এক তাল গাছের নীচে বসে ছিলেন। *অচিন্ত্য এসে তাঁকে অভিষেক ও আগমকলস উপদেশ দিলেন ও ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন :

'সাধনায় সিদ্ধির সময় দেহ আগের মতো হয়ে যাবে।'—এই বলে তিনি চলে গেলেন।

গুরুর উপদেশে তিনি বারো বছর সমাধিতে কাটালেন। সেই সময় রাজার ব্যাপারীরা সোনা, রূপো, স্ফটিকশিলা—ইত্যাদি মহারত্ন নিয়ে ফিরছিলেন। সে দেশে চুরি ডাকাতি হতো। রাতের বেলায় তারা (সেই ব্যাপারীরা) গাছের কাছে এসে উপস্থিত হলো।

পায়ের শব্দ শুনে সেই রাজপুত্র বললেন, 'কে আপনারা ?'

চোর-ডাকাতের কথা ভেবে সেই ব্যাপারীরাও উত্তর দিলো, 'আমরা কয়লার কারবার করি। আমরা কয়লা নিয়ে চলেছি।'

রাজপুত্র বললেন, 'তবে তাই হোক।'

বণিকরা তারপর স্ব-স্থানে ফিরে গিয়ে দেখল, সোনা, মণিমুক্তো সব কিছুই পোড়া কয়লা হয়ে গেছে। দেখে সবাই অবাক।

'কী করে এভাবে বদলে গেল!' তারা বলাবলি করতে লাগল। তখন তাদের মধ্যে বুদ্ধিমান একজন বলল, 'রাতে ফেরার পথে যিনি, "কারা যায় ?" বলে প্রশ্ন করেছিলেন, তিনি নিশ্চয়ই সত্যবাক্‌সিদ্ধ। চল, তাঁকে দেখে আসি।'

একথা বলে তারা সেখানে ফিরে গেল। সেই গাছের কাছে গিয়ে দেখল হাত-পা কাটা লোকটি তেমনি বসে আছেন। তাঁকে সব ঘটনা বিস্তৃত করে সত্য কথা বলল। শুনে রাজপুত্র বললেন, 'আমি প্রতিশোধ নিতে চাই না, তাই তোমাদের ধনরত্ন আগের মতো হয়ে যাক।' এই কথা উচ্চারণ করলেন।

বণিকরা ফিরে গিয়ে দেখল, তাদের ধনরত্ন সব আগের মতো হয়ে গেছে। বিস্মিত হয়ে তারা রাজপুত্রের কাছে তাঁকে পূজা করবার জন্য গেল আর তাঁকে এই ঘটনা বলল।

সেই রাজপুত্রও তখন গুরুর পূর্ব-উপদেশ স্মরণ করলেন। 'ঐভাবে আমার নিজের শরীরও আগের মতো হোক'—এই উচ্চারণ করামাত্র সেইমতো হয়ে গেল (অর্থাৎ নতুন হাত-পা গজিয়ে গেল)।

তারপর সর্বসিদ্ধি প্রাপ্ত হয়ে তিনি অনেক ঋদ্ধি প্রদর্শন করলেন। প্রাণীদের উপদেশ দিলেন না, কিন্তু গাছকে উপদেশ দিলেন। বলা হয় যে, সেই গাছটি এখনও অমর হয়ে আছে।

অমরত্বপ্রাপ্ত *গুরু *চৌরঙ্গর বিবরণ সমাপ্ত ॥

*বীণপা

*গুরু *বীণপার কাহিনী।

*বীণপা এই নামের অর্থ বীণবাদক।

*বীণ বা বীণা বাজাতেন বলে তাঁর এই নাম। দেশ *ঘহুর জন্ম রাজকুলে। গুরু *বুদ্ধপা। বীণপা *হেবজ্র সিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তিনি ছিলেন *ঘহুরের (গউর) রাজার একমাত্র সন্তান। বাবা-মা ও প্রজাদের অত্যন্ত আদরে তিনি আটজন ধাত্রীর পরিচর্যায় মানুষ হয়েছিলেন।

সেই রাজপুত্র সর্বদা সঙ্গীদের নিয়ে বাদকদের সঙ্গে থাকতেন। তম্বুরায় 'রেওয়াজ' করতেন আর সেই সুরেই তাঁর মনপ্রাণ ডুবে থাকত। বীণার ঝংকার ছাড়া সংসারের অন্য কোনো কাজে তাঁর মন লাগত না। এইভাবেই তাঁর দিন কাটছিল।

নিন্দায় মুখর হয়ে উঠলেন তাঁর বাবা-মা, মন্ত্রীরা আর প্রজার দল।

'পিতার রাজ্যভার নেওয়ার জন্যই এঁর জন্ম, এঁর জীবন ; অথচ রাজ্যের দিকে মন না দিয়ে বীণার তানেই মজে আছেন! এখন কী করা যায়?'—বলাবলি করতে লাগলেন সবাই।

সুলক্ষণ যোগী *বুদ্ধপা একদিন সেই রাজপুত্রের কাছে এলেন। শ্রদ্ধার সঙ্গে রাজপুত্র তাঁকে অভ্যর্থনা জানালেন, কুশল সংবাদ জানতে চাইলেন।

সেই যোগীও রাজপুত্রের কাছে কিছুদিন থেকে গেলেন। রাজপুত্রের বিনয় নেওয়ার সময় হয়েছে জেনে যোগী একদিন রাজপুত্রকে বললেন, ‘রাজপুত্র, তুমি ধর্মাচরণ করবে না ?’ রাজপুত্র বললেন, ‘যোগী, ধর্মাচরণের জন্য আমি তম্বুরাবাদন ছাড়তে পারবো না। এটা না ছেড়ে ধর্মসাধনের উপায় থাকলে, আমি ধর্মাচরণে রাজি আছি।’

যোগী উত্তর দিলেন, ‘ধর্মাচরণ যে করবে তার যদি শ্রদ্ধা ও প্রয়াস থাকে, তাহলে তম্বুরা বর্জন না করেও ধর্মসাধন করা যায়, আর সেই উপায় ও উপদেশও আমার জানা আছে।’

তিনি এ কথা বলায় রাজপুত্র বললেন, ‘তাহলে আমাকে তাই দিন।’

যোগীও সেই অপরিণত মনকে পরিণত করে অভিষেক দিলেন ও ধ্যানের উপদেশ-রূপে রাজপুত্রকে বললেন :

‘হে রাজপুত্র, তম্বুরার শব্দ কানে আসছে এই বিকল্প ত্যাগ কর আর চিত্তের আলম্বন ও শব্দের বিকল্প এই দুইকে একত্র করে ধ্যান কর।’

সেইভাবে ন'বছর ধ্যান করার ফলে চিত্তের মল শুদ্ধ হলো। দীপের মতো উজ্জ্বল প্রভাস্বরতা কল্পনায় জেগে উঠল, তিনি মহামুদ্রা প্রাপ্ত হলেন; বহু অভিজ্ঞান ও গুণসম্পন্ন হলেন।

এঁর নাম হল যোগী *বীণপা আর সেই নামেই চারিদিকে খ্যাত হলেন। *ঘহুর নগরের সব লোককে তিনি অপরিমেয় ধর্মদেশন করলেন।

শেষে অবদান ইত্যাদি বচন দান করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *বীণপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*শান্তিপা

*গুরু *শান্তিপার কাহিনী।

*মঘধ (মগধ) নগরে তখন রাজা *দেবফল (দেবপাল) রাজত্ব করছিলেন। সেই সময় *বিক্রমশীলের ব্রাহ্মণকুলে প্রব্রজ্যিত এক মহাচার্য ছিলেন। পঞ্চবিদ্যায় পণ্ডিত এই মহাচার্যের নাম *রত্নাকরশান্তি। সবদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল এই পণ্ডিত ভট্টারকের খ্যাতি।

সেই সময় *সেঙ্গ (সিংহল) দ্বীপের এক রাজা ছিলেন, তাঁর নাম *কবিন। তিনি সাংসারিক সুখে রত হয়ে দিন কাটাচ্ছিলেন।

সেই দ্বীপে তার আগে বুদ্ধশাসনের উদয় হয়নি। *জম্বুদ্বীপ থেকে যাঁরা আসতেন, বৌদ্ধধর্মের মহিমার কথা রাজা তাঁদের কাছে শুনতেন। কিন্তু ধর্মদেশন করতে পারেন—এমন মানুষের সন্ধান পেলেন না।

তারপরে *মগধে মহাচার্য *শান্তিপা নামে এক মহাপণ্ডিত বাস করেন শুনে রাজা *কবিন ও *সেঙ্গ দ্বীপের সব লোক অর্ঘ্যসহ দূত পাঠিয়ে তাঁকে আমন্ত্রণ জানালেন। এক প্রভাতে *বিকামশীলে (বিক্রমশীল) পৌঁছালেন সেই দূত : রাজার প্রেরিত স্বর্ণ রৌপ্য মুক্তা কিংখাব ইত্যাদি চরণে নিবেদন করে আচার্যকে প্রণাম করলেন। বললেন :

'রাজা আর অন্য সবাই প্রার্থনা জানাচ্ছেন :
নগণ্য দ্বীপের অধিবাসী আমরা
এক প্রান্তে থাকি।
রয়েছি অবিদ্যার গভীর অন্ধকারে,
কামনার অগ্নিতে দগ্ধ হয়ে—
ক্রোধের অস্ত্রের পীড়নে,
ভুলের আবিলতায়।
প্রজ্ঞায় আলোকিত মহাযান ধর্মের
মুক্তির পথ ব্যাখ্যানের জন্য—
মহাকরুণাময় আপনি
আমাদের কথা ভেবে
*সেঙ্গ দ্বীপের প্রাণীহিতের জন্য
অবশ্যই আসুন। দয়া করুন—
এই অনুনয়।'

গভীরভাবে চিন্তা করে যাবেন বলে কথা দিলেন আচার্য। তারপর দুহাজার শিষ্য নিয়ে পিটক গ্রন্থরাজি হাতি ঘোড়ার পিঠে চাপিয়ে আচার্য *শান্তিপা যাত্রা করলেন। *নলেন্দ্র (নালন্দা) ও *তন্ত্রপুরী (ওদন্তপুরী), রাজগৃহ, বজ্রাসন প্রভৃতি নগর তাঁরা অতিক্রম করলেন। তারপর *সেঙ্গদ্বীপের সমুদ্রতীরে এসে পৌঁছোলেন।

দূতকে আগে পাঠিয়ে দিলেন। সে পৌঁছুবার পর আচার্য অনুচরদের নিয়ে নৌকায় এলেন।

দূত খবর দিল : আচার্য আসছেন। রাজা *কবিন, মন্ত্রী ও সব লোকজন প্রথম-ভূমিপ্রাপ্তের মতো আনন্দিত হয়ে উঠলেন। যে যার সাংসারিক কাজকর্ম ত্যাগ করে, সমুদ্রের দিকে মনপ্রাণ সমর্পণ করে, সাতদিন কাটাবার পরে ছত্র হস্তী ইত্যাদির লক্ষণ দেখে উল্লসিত হয়ে উঠলেন সবাই। নিজেদের জায়গা (জনপদ) থেকে সমুদ্রতট পর্যন্ত পরিষ্কার করে রেশম দিয়ে উপরে নীচে চারদিক ঢেকে দিলেন। তাঁরা। তাতে পা ফেলে আচার্যরা এলেন।

রাজা *কবিন অনুচরদের নিয়ে ফুল সুগন্ধ ধূপ ইত্যাদি দিয়ে আচার্যকে মহাসমারোহে পূজা করলেন।

আচার্যকে আরামদায়ক বাসস্থান, শয্যা ইত্যাদি দেওয়া হলো। তিন বছর ধরে বিস্তৃত করে পিটক ধর্ম ব্যাখ্যা করলেন তিনি, তারপর অনুচরদের নিয়ে মধ্যদেশে রওনা হবার উদ্যোগ করলেন।

তখন রাজা *কবিন ও অন্যরা আচার্যকে হাতি ঘোড়া সোনা রূপো মণিমুক্তা ইত্যাদি প্রচুর অর্ঘ্য দিলেন। মধ্যদেশে ফিরে যাবার যে দুটি পথ ছিল তার মধ্যে দীর্ঘতর পথটি ধরে রওনা হলেন আচার্য।

রাজা *রাম *লংকাপুরীতে তাঁর পত্নীকে খুঁজবার জন্য যখন গিয়েছিলেন তখন *রামেশ্বরে *মহেশ্বরের মূর্তিসহ একটি মন্দির তৈরি করেছিলেন। সেই *রামেশ্বর নামের দেশের পথ ধরলেন আচার্য। মধ্যের এই সাতদিনের পথ ছিল জনমানবশূন্য। তাই আচার্য অনুচরদের বললেন সাতদিনের প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র সঙ্গে নিয়ে নিতে। সেইমতো করা হলো।

চারদিনের পথ পেরিয়ে যাবার পর তাঁরা ভাগ্যবান *কোদালির দেখা পেলেন। তার বিবরণ যথাসময়ে আসবে।

আচার্য অনুচরদের নিয়ে *বিকামশীল-এ গেলেন।

আচার্য অত্যন্ত বৃদ্ধ হওয়াতে তাঁর দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ হয়েছিল, শরীরের জোর কমে গিয়ে ভেঙে পড়ছিল। শক্ত জিনিস খেতে পারতেন না, শিষ্যরা তাই মোষের দুধের দইতে চিনি দিয়ে তাঁকে পরিবেশন করলেন। আচার্য-র বয়স হলো একশ বছর। বারো বছর তিনি বিকল্পে স্থিত হয়ে রইলেন।

*কোদালিপা কিন্তু সেই বারো বছরে নির্বিকল্প সমাধির সাহায্যে উত্তম মহামুদ্রার সাধনায় পরমসিদ্ধি লাভ করলেন।

*শান্তিপাকে যখন তাঁর শিষ্যরা সেবাশুশ্রূষা করছেন, (কোদালিপার) তখন

সমাধি ভঙ্গ হলো। ডাকিনীরা ও দেবরাজ শতক্রতু (কোদালিপার) ব্রহ্মতালুতে অমৃত মর্দন করে তাঁকে পরিতুষ্ট করলেন।

দেবতারা ও ডাকিনীরা সকলে একবাক্যে বললেন, 'ইনি স্বয়ং বজ্রসত্ব। এঁর প্রভাবে দেবতাদের অভিলষিত গুণ বর্ধিত হলো।'

কোদালিপা বললেন, গুরুর উপদেশ না পাওয়া পর্যন্ত তিনি বাইরের পর্বত খনন করেছেন, উপদেশ পাবার পর আধ্যাত্মিক পর্বত খনন করে সিদ্ধিলাভ করলেন।

দেবরাজ শতক্রতু প্রভৃতি দেবতারা (কোদালিপাকে) ত্রয়ত্রিংশৎ দেবস্থানে আমন্ত্রণ জানালেন। *কোদালিপা যেতে চাইলেন না। বললেন, 'আমি আমার গুরুকে প্রণাম করতে যাবো। বুদ্ধের চেয়েও গুরু করুণাময়।'

এই বলে জ্ঞানচক্ষু দিয়ে দেখলেন। তারপর দুইদেশের মধ্যের (রামেশ্বর ও বিক্রমশীল) ছয় মাসের পথ একমুহূর্তে পেরিয়ে, *বিকামশীলে (বিক্রমশীলে) চলে গেলেন।

জ্ঞানকায় ধারণ করে গুরুকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ও পর্যুপাসনা করলেন। গুরু ও তাঁর শিষ্যরা জানতে পারলেন না।

শেষে *কোদালিপা তাঁর বিপাককায় (পরিপূর্ণদেহ) প্রদর্শন করে অসংখ্যবার প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করলেন ও নতশিরে গুরুর চরণ স্পর্শ করলেন।

'আপনি কে ?' *শান্তিপা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমি গুরুর শিষ্য।'

'আমার অগণিত শিষ্য তাই তোমাকে চিনতে পারছি না।'

'আমি *কোদালিপা।'—আমার একথা বলায় গুরু চিনতে পারলেন ও দুজনে অনেক কথাবার্তা বললেন।

'তুমি কোন বিশিষ্ট গুণ ও সিদ্ধিলাভ করেছো ?' গুরু জানতে চাইলেন।

'গুরুর উপদেশ অনুসারে সাধন করায় আমি মহামুদ্রার উত্তম ধর্মকায় লাভ করেছি।'

গুরু বললেন, 'আমি ভাষণদানকেই প্রধান করেছি, সাধনাকে করিনি, তাই সার্থকতা পাইনি। তুমি সাধনাকে মুখ্য করেছো, বচনকে মুখ্য করোনি তাই সার্থকতা লাভ করেছো। কিন্তু আমি তোমাকে যে উপদেশ দিয়েছিলাম, তা নিজেই ভুলে গিয়েছি। সেই উপদেশ আবার আমাকে দাও, যে বিশিষ্ট গুণ তুমি লাভ করেছো, আমাকে তারও উপদেশ দাও।'

*কোদালিপাও নির্জনস্থানে গিয়ে গুরুকে ধর্মকায়ের বহু গুণ দেখালেন।

*শান্তিপার প্রদত্ত উপদেশ আবার তাঁকেই তিনি প্রত্যর্পণ করলেন। *গুরু *শান্তিপাও বারো বছর ভালভাবে এই উপদেশ ধ্যান করে উত্তম মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। প্রাণীহিত করে শেষে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *রত্নাকরশান্তির বিবরণ সমাপ্ত ॥

*তন্তিপা

*গুরু *তন্তিপার কাহিনী।

*সেন্ধনগর নামে এক দেশে এক তাঁতির অনেক ছেলে ছিল। ছেলেদের বাবা সেই তাঁতি তার কুলকর্ম তাঁতের কাজ করে বিরাট ধনী হয়েছিলেন।

যথাসময়ে তিনি ছেলেদের জন্য বংশের যোগ্য বউ আনবার ব্যবস্থা করলেন। ফলে, সে দেশে তাঁতির বংশ দ্রুত বৃদ্ধি পেল।

ক্রমে তাঁতির স্ত্রী মারা গেলেন। তাঁতির বয়স হলো উননব্বই বছর, জরায় জীর্ণ শরীরের বন্ধন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। ছেলের বউরা পালা করে তাঁকে দেখাশোনা করছিল। সেই বৃদ্ধের আচার-আচরণ দেখে সবাই হাসাহাসি করত। বউরা পরামর্শ করল,

'আমাদের এই বুড়ো শ্বশুর, লোকে একে দেখে মুখ ফেরায়; এতে আমাদের সবারই মুশকিল হচ্ছে।'

বাগানে একটি খড়ের ঘর তৈরি করে, তাঁকে তারা সেখানে রাখল। পালা করে তাঁর খাবার-দাবার পাঠাবার কথায় সবাই রাজি হয়ে তাই করতে লাগল।

তারপর একদিন গুরু *জালন্ধরপা সে দেশে এলেন। সেই তাঁতির বড় ছেলের কাছে গিয়ে বললেন, 'আমাকে খেতে দাও।'

'আপনি এখানে থাকুন'—বলে অন্দরে গিয়ে (পত্নীকে দিয়ে) নানারকম রান্না করালেন। পত্নী বললেন, 'স্বামী, আপনি এঁকে অন্দরে নিয়ে আসুন।'

পতিও তাই করলেন। গুরু অন্দরে এসে ভোজন শেষ করলেন। তারপর গুরু *জালন্ধরপা অন্যত্র যেতে চাইলেন, তখন তাঁতির বউ অনুরোধ করে বললেন, 'গুরু আপনি অন্য জায়গায় যাবেন না, এখানেই নিদ্রা যান।'

গুরু বললেন, 'আমি মানুষের মধ্যে ঘুমোতে পারি না।'

'তাহলে আপনি বাগানে নিদ্রা যান।'—এই বলে অনুনয় করলেন।

বাগানে আমন্ত্রণ জানিয়ে প্রদীপ, তেল ইত্যাদি পাঠিয়ে দিলেন। গুরু সেখানে থাকতে গেলেন। বৃদ্ধ তাঁতি তখন মানুষের সাড়া পেলেন। কিন্তু কে এসেছে তা বুঝতে পারলে না।

'ওখানে শব্দ করছে কে?' প্রশ্ন করলেন।

আচার্য বললেন, 'আমি এক ধার্মিক অতিথি;—আপনি কে?'

তিনি বললেন, 'আমি ঐ তাঁতিদের বাবা। যৌবনে গৃহ ও সকল সম্পদের অধিকারী ছিলাম। এখন ছেলেরা ও বউরা সবাই আমাকে অবজ্ঞা ও অবহেলা করে। অন্য লোক দেখে ফেলবে এই জন্য বাগানে আমাকে লুকিয়ে রেখেছে।'

'সংসারের ধর্মই অসার তাই এই রকমই হয়।
সকল সংস্কার অনিত্য,
পৃথিবীতে আগত সব কিছুই দুঃখময়
সর্বধর্মই অনাত্মক,—
শোকদুঃখ অতিক্রম করাতেই শান্তি ও সুখ,
মৃত্যুর যে খাদ্য, ধর্মে তার প্রয়োজন নেই কি?'

*জালন্ধরপা তাঁতিকে এই উপদেশ দিলেন।

'হ্যাঁ, চাই'—তাঁতি উত্তর দিলেন।

তাঁতিকে হেবজ্রমণ্ডলের অভিষেক ও উপদেশ দিয়ে তাঁকে সাধনায় স্থিত করে *জালন্ধরপা অন্যত্র চলে গেলেন।

তিনিও গুরুর উপদেশ হৃদয়ঙ্গম করে বউদের কাউকে কিছু না বলে আগের মতোই থাকতে লাগলেন। তিনি (গুরুর) বচন ও উপদেশ অনুযায়ী সাধনা করে বারো বছরে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন, বহুগুণ লাভ করলেন, কিন্তু কেউ তা জানতে পারল না।

কোন এক সময়ে তাঁতির বড় ছেলে এক সুন্দর, উজ্জ্বল, কারুকার্যময় রেশম বস্ত্র বুনেছিল, সেই উপলক্ষে সে এক উৎসবের আয়োজন করেছিল। তাই নিয়ে ব্যস্ত থাকায় সে বাবার খাবার পাঠাতে ভুলে গিয়েছিল।

রাতে বউ-এর সে কথা মনে পড়ল। অন্যদের অজ্ঞাতসারে সে শ্বশুরের কাছে খাবার নিয়ে গেল। গিয়ে দেখল, কুঁড়ে ঘরের মধ্যে বিরাট আগুনের আলোয় পনেরো জন কুমারী পরিবৃত হয়ে অলৌকিক বসনভূষণ ধারণ করে সম্মুখে প্রচুর খাদ্যদ্রব্য নিয়ে সেই বৃদ্ধ শ্বশুর বসে আছেন। দেখে সে দ্রুত ফিরে গেল। আর স্বামীকে গিয়ে বলল, 'শীগ্‌গির তোমার বুড়ো বাবাকে দেখতে যাও।'

বাবা মারা গেছেন ভেবে ছেলে কাঁদতে লাগল। তার কান্না শুনে অন্য সবাই এসে একসঙ্গে সেই বাগানে গেল। বউ যেমন দেখেছিল, তেমন সব কিছু দেখে তারা খুব অবাক হয়ে গেল।

ঘরে ফিরে এসে এই ঘটনা বলায়, ছেলেদের আত্মীয় বন্ধুরা সবাই বলল, 'এ মানুষ নয়, পিশাচ।'

এই কথা শুনে *সন্তনগরের সব লোক বৃদ্ধকে দেখতে গেল আর প্রণাম করল। তিনি যখন বেরিয়ে এলেন তখন তাঁর দেহ ষোলবছরের ছেলের মতো হয়ে গেল, দেহ থেকে অমিত জ্যোতি বিচ্ছুরিত হতে লাগল। সব মানুষের চোখে তা সহ্য হলো না।

দেহ দর্পণের মতো উজ্জ্বল ও মসৃণ হওয়ায়, সেই প্রভায় সব কিছু আলোকিত হলো। সর্বদিকে তিনি *তন্তিপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

অপরিমিত প্রাণীহিত করে শেষে *সন্তনগরের অনেক মানুষকে নিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

এইভাবে শ্রদ্ধাভরে গুরুর উপদেশ অনুসরণ করে *তন্তিপার মতো এই জন্মে বৃদ্ধ বয়সেও মহামুদ্রার উত্তম সিদ্ধিলাভ করা সম্ভব—এই হচ্ছে উপদেশ।

*গুরু *তন্তিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*চমরিপা

*গুরু *চমরিপার কাহিনী।

*চমরিপা নাম—অর্থাৎ যে জুতো তৈরি করে।

তাঁর কাহিনী : ভারতের পূর্বদিকে *বিষ্ণুনগর নামে জনপদটি একসময় অষ্টাদশ শিল্পকলার শিল্পীদ্বারা পরিপূর্ণ ছিল।

সেখানে জাতিতে চামার এক মুচি *বিষ্ণুনগরের সব মানুষের পুরোনো জুতো সারানোর কাজ নিজের হাতে করতেন। সেই কাজেই তাঁর দিন কাটত।

এক ভিক্ষু তাঁর কাছে এলেন। চর্মকার এগিয়ে গিয়ে সেই ভিক্ষুর চরণে প্রণাম করলেন ও ধর্মোপদেশ চাইলেন। বললেন,

'সংসারে আমার বিরাগ জেগেছে, আমি ধর্মের কাজ করতে চাই। কিন্তু

কল্যাণমিত্র গুরুর দর্শন পাইনি, তাই ধর্মদ্বারে প্রবেশ করিনি। ইহজন্ম ও পরজন্ম দু-এরই হিতকারী এক ধর্ম আমি অনুসরণ করতে চাই।'

'যদি সাধনা করতে পারো, তাহলে আমি দিতে পারি।' সেই চর্মকার অনুনয় করে বললেন, 'আমার মতো নিচু জাতের লোকের বাড়িতে কি আপনি খাবেন?'

ভিক্ষু বললেন, 'আজ রাতে এসে খাব।'

এ কথা বলায় চর্মকার তাঁর স্ত্রী ও বাড়ির অন্য সবাইকে ভিক্ষুর আগমনের সংবাদ দিলেন।

সে রাতে তিনি এলে চর্মকার আসন ও পাদ্যার্ঘ্য দিয়ে নানাবিধ উত্তম আহার্য দিলেন। স্ত্রী ও কন্যারাও প্রয়োজনীয় সব সামগ্রী দিলেন; লেপন, গাত্রমার্জন দিয়ে নানাভাবে তাঁর সেবা করলেন।

খুশি হয়ে যোগী সপত্নীক চর্মকারকে অভিষেক ও এই উপদেশ দিলেন:

ক্লেশ ও বিকল্পের চর্মকে
মৈত্রী ও করুণার তক্তায় (ফেলে)
গুরুর উপদেশের ছুঁচ দিয়ে
অষ্টধর্ম ত্যাগের সুতো দিয়ে
ভাল করে সেলাই করলে
নিরাভোগ ফলের পাদুকা তৈরি হবে।
পরম আশ্চর্য ধর্মকায় পাদুকা
মিথ্যাদৃষ্টি-সম্পন্ন মানুষ জানতে পারে না।
আনন্দ ও নিরানন্দ উভয়কে গ্রহণ বা বর্জন রহিত (রূপ) তন্তু দিয়ে
বিকল্প ও সর্বলক্ষণের (রূপ) চর্ম দিয়ে
করুণার তক্তার উপরে—
গুরুর উপদেশ ও আত্ম-উপলব্ধির সুতো দিয়ে
অনাভোগ (স্বয়ং উদ্ভূত) ধর্মকায়ের জুতো তৈরি করবার সাধনা করো।'

'এইভাবে ধ্যান করলে কী কী লক্ষণ দেখা যাবে?'

'প্রথমে এই সংসারের প্রতি বিতৃষ্ণার লক্ষণ দেখা দেবে। তারপর দেখা দেবে ক্রমশ ভৌতিক যা কিছু সাক্ষাৎ ধর্মে বিলীন হয়ে যাবার লক্ষণ'—এই উপদেশ দিয়ে সেই যোগী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

চর্মকার নিজের জীর্ণ গৃহ ছেড়ে এক নির্জন অরণ্যে গিয়ে ধ্যান করতে লাগলেন। গুরুর উপদেশ মতো ক্রমে এইভাবে লক্ষণ জাত হলো।

প্রথমে ছয় রকমের ক্লেশ, মোহ ইত্যাদির লক্ষণ জেনে গুরুর উপদেশের পাদুকা ধারণ করলেন।

পৃথিবী অবিদ্যায় আবৃত থাকায় বারো বছর সাধনা করে অবিদ্যা ইত্যাদির মল শুদ্ধ করলেন তিনি, তারপর মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন।

বারো বছর ধরে দিনরাত্রি নির্বিশেষে চর্মকার তাঁর একাগ্রতা ও গুরুর উপদেশ অভিন্ন করে সাধন করলেন।

*বিশ্বকর্মা ইত্যাদি চর্মকারের যা কিছু কাজ করে দিতেন। *বিষ্ণুনগরের এই মুচি সকলের অজ্ঞাতেই যোগসাধন করলেন। তাঁর গুণাবলীও সকলের অজ্ঞাত থেকে গেল।

একদিন ওঁর এক সহকর্মী চর্মকারের কাছে এলেন। এসে দেখলেন চর্মকার ধ্যানে বসে আছেন আর *বিশ্বকর্মা তাঁর কাজ করে যাচ্ছেন। দেখে তিনি খুবই আশ্চর্য হয়ে গেলেন। একে একে সবাই এসে সেই দৃশ্য দেখলেন।

তাঁরা সবাই একসঙ্গে চর্মকারের উপদেশ প্রার্থনা করলেন। তিনি গুরুর শরণ নেবার উপকারিতা বা সুফলের উপদেশ দিলেন। *বিষ্ণুনগরের প্রাণীদের বহু ধর্মদেশন করলেন।

যোগী *চমরিপা নামে ইনি সর্বত্র খ্যাত হলেন। অপরিমিত প্রাণীহিত করে শেষে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *চমরিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*খড়গপা

*গুরু *খড়্গপার কাহিনী।

নাম *খড়্গপা।

তিব্বতী শব্দে অনুবাদ করলে হয় "তলোয়ারধারী মানুষ"।

*মগধের এক নীচ শূদ্রকুলের মানুষ। তাঁর গুরু *জোকি *চরপটি (যোগী চরপত্রি ?)। তিনি খড়্গ-সিদ্ধি—যা সাধারণ, লৌকিক সিদ্ধি—তাই লাভ করেছিলেন।

*মগধে এক কৃষিজীবী গৃহস্থ ছিলেন। কিন্তু পৈতৃক বৃত্তি ছেড়ে তিনি বরাবর চোরের কাজ করছিলেন।

দিনরাত চুরির চিন্তায় তন্ময় হয়ে থাকতেন তিনি। একবার সেই গৃহস্থ চোর *মগধ নগরে চুরি করতে গিয়ে কিছু পেলেন না। ঘরে ফেরার সময়ে এক শ্মশানের মধ্যে দিয়ে তিনি আসছিলেন।

*জোকি *চরপত্রির সঙ্গে সেই শ্মশানে তাঁর দেখা হলো। জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি এখানে কী করছেন?'

'এই সংসারে জন্মমৃত্যুর ভয়ের কারণে আমি এখানে যোগাসনে বসে আছি।' চোর বললেন, 'সাধনা করলে কী ফল পাওয়া যাবে?'

*জোকি বললেন, 'সাধনের ফলে সমুন্নতি ও নিশ্চিত সুখ লাভ করা যায়, তুমি ধর্মের কাজ করবে কি?'

চোর বললেন, 'ধর্মকে শ্রদ্ধা করতে পারি, কিন্তু শ্মশানে সাধন করবার সময় নেই। সব সময়ই চোরের কাজ করি। মাঝে মাঝে রাজা, মন্ত্রী ও গৃহস্থদের সম্পত্তি চুরি করে পাই, কিন্তু পরে আবার সেই চুরির জিনিস নিয়ে ঝগড়াঝাটি শুরু হয়। এ সব লোকেরা যাতে আমার কিছু (ক্ষতি) না করতে পারে এমন এক অজেয় মন্ত্র দিন'—এই প্রার্থনা করলেন।

যোগী চোরকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন।

বললেন. 'মগধ নগরে *গোসমক্র নামে বাইরে-চৈত্য-ভিতরে-মন্দির এমন একটি স্থান আছে। তার অভ্যন্তরে আশীর্বাদ-দানরত আর্য অবলোকিতেশ্বরের এক মূর্তি আছে। সেখানে তুমি তিনসপ্তাহ ধরে মাটিতে না বসে দিনে রাতে একুশবার (সেই দেবস্থান) প্রদক্ষিণ কর। আহারও দাঁড়িয়ে থাকা অবস্থায় দিনে রাতে একবার মাত্র করবে। তারপর মূর্তির চরণতল থেকে একটি সাপ বেরিয়ে আসবে, দেখে ভয় না পেয়ে তার মাথাটা চেপে ধরবে। এতেই তুমি সিদ্ধিলাভ করবে।' —এই উপদেশ দিয়ে চোরকে সাধনায় নিযুক্ত করলেন।

সেই চোরও যোগীর প্রদত্ত উপদেশ অনুসারে সাধনা করতে লাগলেন। একুশ দিনের দিন অবলোকিতেশ্বরের চরণতল থেকে এক মহাকাল নাগ বেরিয়ে এল। তার মাথাটা চেপে ধরামাত্রই সাপটা একটা তলোয়ার হয়ে গেল; জ্ঞানের দ্যুতিতে উজ্জ্বল সেই তলোয়ার চোরের হাতে এল। (তার আলোয়) চোরের চিত্তের মল শুদ্ধ হলো; তিনি খড়্গসিদ্ধি লাভ করলেন বলে যোগী *খড়্গ-পা নামে খ্যাত হলেন।

সাধারণ অষ্টসিদ্ধির মধ্যে তিনি তরবারি বা খড়্গসিদ্ধি লাভ করলেন।

কায়-বাক-চিত্তের সকল ভ্রান্তির মল তাঁর শুদ্ধ হলো। *মগধের সবপ্রাণীকে একুশ দিন ধরে তিনি ধর্মদেশন করলেন।

শেষে অবদান ইত্যাদি উপদেশ দিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *খড়্গপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*নাগার্জুন

*গুরু *নাগার্জুনের কাহিনী।

ভারতের পূর্বদিকে *কাঞ্চীর অন্তর্গত *কাহোর—*নাগার্জুন সেখানে ছিলেন। জাতিতে তিনি ব্রাহ্মণ, (তবু) তিনি তারাসিদ্ধি লাভ করেছিলেন।

তখন *কাহোর-এ পনেরো হাজার নগরের (!) সব মানুষ যথেচ্ছ দমনপীড়নে অতিষ্ঠ হয়ে উঠেছিল। ব্রাহ্মণরা সমবেত হয়ে বললেন, 'এই অন্যায় ব্যবহার অসহ্য। কিন্তু ঝগড়া করার চেয়ে অন্য কোথাও চলে যাওয়া ভাল।'

এই সব কথাবার্তা শুনে আচার্য তাদের কাছে লোক মারফৎ বলে পাঠালেন, 'তোমরা অন্য দেশে যেও না, অন্য দেশে আরও দুঃখ পাবে। আমার যা কিছু ধন আছে, তোমরা নিয়ে যাও।' এই বলে সব ধনসম্পত্তি দান করে দিলেন।

আচার্য *কাহোর ছেড়ে *শীতবন পার হয়ে *নলেন্দ্র (নালন্দা)-য় চলে গেলেন। সেখানে প্রব্রজ্যিত হয়ে পঞ্চবিদ্যা অনুসরণ করে পাণ্ডিত্যের শিখরে উপনীত হলেন।

তারপর শাস্ত্রব্যাখ্যায় বিরক্ত হয়ে তিনি সাধনা করতে লাগলেন। তারাদেবীর প্রত্যক্ষ দর্শন লাভ করলেন।

সেই সময়ে *শ্রীনালন্দায় এক শতটি ধর্মসংঘ ছিল, তিনি সেখানকার বাস ও জীবিকা দুই ছেড়ে চলে গেলেন। অন্য এক নগরে গিয়ে পিণ্ড ভিক্ষা করতে লাগলেন। তারপর আবার নিজের আগের জায়গায় ফিরে এলেন। নিজের মনে ভাবলেন, 'এতে প্রাণীহিত হচ্ছে না। প্রাণীদের মঙ্গল করবার ক্ষমতা আয়ত্ত করতে হবে,'—এই চিন্তা করে রাজগৃহে গেলেন। বৃষভ দানবের বারোটি দানবীর মন্ত্রজপের ফলে প্রথমে ভূমিকম্প, দ্বিতীয়ে বৃষ্টি, তৃতীয়ে অগ্নি, চতুর্থে বায়ু, পঞ্চমে

অস্ত্র ষষ্ঠে প্রস্তর বর্ষণ, সপ্তমবারে সবাই সমবেত হয়ে বাধা সৃষ্টি করেও আচার্যের প্রতিজ্ঞা টলাতে পারল না।

যক্ষিণীরা সবাই এসে তখন বলল, 'আপনি যা চান, তাই দেবো।'

'আমি অন্য কিছু চাই না, শুধু আমার ভরণপোষণের ব্যবস্থা করে দাও।'

তারাও পঞ্চব্যঞ্জন সহ চার অঞ্জলি অন্ন তাঁকে সর্বদাই দিতে লাগল, আচার্য তা গ্রহণ করলেন। সাধন করলেন বারো বছর ধরে।

একশ আট জন পিশাচীকে বশীভূত ও একত্র করে তিনি প্রাণীহিতের জন্য কাজ করবেন বলে মনস্থ করলেন।

*গন্ধশীল পর্বতে গিয়ে আচার্য পাহাড়টিকে সোনায় রূপান্তরিত করে প্রাণীহিত করবেন স্থির করলেন, তাই সেটিকে প্রথমে লোহা ও পরে তামায় রূপান্তরিত করলেন।

আর্য মঞ্জুশ্রী এই উক্তি করলেন, 'যদি তুমি এই রকম কর (পাহাড়কে সোনা কর) তাতে এখানে লোকের মধ্যে খুব ঝগড়া মারামারি লেগে যাবে। তার ফলে পাপ তাপ আরও বাড়বে।'—এই বলে সেই কাজ বন্ধ করে দিলেন।

*গন্ধশীল এখনও ম্লান তামাটে রঙেরই হয়ে আছে। তারপর দক্ষিণে শ্রীপর্বতে যাবার পথে এক বড় নদীর তীরে অনেক রাখালের দেখা পেয়ে তাদের তিনি জলের পথ (জল পার হয়ে যাবার পথ) জিজ্ঞাসা করলেন। তারা এমন পথ দেখাল যেটা খুব খারাপ—জলদানব, কুমীর হাঙর আর পাহাড়ে ভরা।

অন্য এক রাখাল এসে বলল, 'ঐ পথ ভালো নয়। আপনি এখান দিয়ে চলুন।' বলে আচার্যকে পিঠে নিয়ে চলল।

আচার্য তাঁর মায়াশক্তি দিয়ে জলের মধ্যে ভয়ংকর সব জলজন্তু দেখালেন। কিন্তু সেই রাখাল বলতে লাগল, 'যতক্ষণ আমি বেঁচে আছি, ততক্ষণ আপনার কোনও ভয় নেই।'

আচার্য তখন তাঁরই তৈরি মায়া অপসারণ করলেন। জল পার হয়ে শুকনো জায়গায় এসে আচার্য বললেন, 'আমি আর্য নাগার্জুন। তুমি চিনতে পেরেছ কি?'

'তাঁর কথা শুনেছি, কিন্তু চিনি না।'—রাখাল বলল। আচার্য সেই রাখালকে বললেন, 'আমাকে তুমি নদী পার করে দিলে, তুমি যা পুরস্কার চাও, দেবো।'

রাখাল বলল, 'রাজা হবার এক উপায় বলুন।' তীরের কাছের জমিতে একটি শালগাছ ছিল। তার প্রার্থনা শুনে আচার্য সেই গাছের উপরে জল ছিটিয়ে দিতেই মুহূর্তের মধ্যে সেটি হাতি হয়ে রাজার বাহন হয়ে গেল।

‘সৈন্যদল চাই’—এই প্রার্থনায় ‘সেনাবাহিনী হোক’ (আচার্য) এ কথা বললেন। হাতির বৃংহণে তাই হল। রাজার নাম হল *সালভন্দ, রানীর নাম হল *সিদ্ধি; বিশিষ্ট এই নগরের নাম হল *ভহিতন, নগরে করদাতাদের সংখ্যা ছিল চুরাশি লক্ষ।

তারপর আচার্য দক্ষিণদিকে শ্রীপর্বতে গেলেন। সেখানে দীর্ঘদিন ধরে সাধনা করলেন। রাজা *সালভন্দ গুরুকে স্মরণ করে শ্রীপর্বতে এলেন; গুরুকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, ‘রাজত্বের দাম সামান্যই, কিন্তু দোষ অনেক; এ রাজত্ব আমি করতে চাই না। আমি আপনার কাছে থাকতে চাই।’ এই প্রার্থনা জানালেন।

আচার্য বললেন, ‘রাজ্যত্যাগ কোরো না, মহারত্নের মালা (জপমালা ?) দিয়ে রাজ্যপালন করো। অকালমৃত্যুর ভয় কোরো না, আমি তা দূর করার জন্য রসায়ন দেবো।’

উত্তরে রাজা বললেন, ‘যদি আপনার কাছে থাকার সুযোগ পাই তবেই একমাত্র রাজ্য আর রসায়নের প্রয়োজন (হতে পারে), না হলে দরকার নেই।’

তাই কোথাও না গিয়ে তিনি সেখানেই থাকতে লাগলেন। তারপর আচার্য তাঁকে বচনদান করলেন, রাজাও (সেই উপদেশ অনুসারে) নিজের রাজ্যে গিয়ে রসায়ন-সিদ্ধ হলেন। একশো বছর তিনি রাজত্ব করলেন।

সেই সময়ে প্রজারা সবাই সম্পদশালী হয়ে উঠল, পাহাড় পর্বতের বন্য পশু-পাখিরাও সুখে শান্তিতে থাকতে লাগল। আচার্যও একশো বছর ধরে বুদ্ধশাসন প্রচার ও প্রসার করলেন। এতে মার দেবতার খুব রাগ হলো আর তার ফলে নানা কুলক্ষণ দেখা দিল। সূর্য ও চন্দ্রের আলো ম্লান হয়ে গেল। খেতের ফসল আপনা থেকেই নষ্ট হয়ে গেল। বর্ষাকালে বৃষ্টি হলো না, সব প্রাণী দুর্ভিক্ষে ক্লিষ্ট হলো। আধিব্যাধি ছড়িয়ে পড়ল। বনের সব ফল শুকিয়ে গেল। এই সব দুর্লক্ষণ দেখা গেল।

রাজা *সালভন্দ ভাবলেন, এগুলি আর কিছু নয়, আমার আচার্যের অসুখের লক্ষণ। এই ভেবে তিনি তাঁর ছেলে *চন্দীকুমার (চণ্ডীকুমার ?)-কে রাজ্যভার দিয়ে সামান্য কয়েকজন অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে শ্রীপর্বতে আচার্যের কাছে গেলেন।

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, ‘পুত্র, কী জন্য এসেছ ?’ রাজা বললেন,

‘হ্রাস হতে চলেছে কি আমার আর প্রাণীদের ভাগ্য ?
পতন ঘটছে বুদ্ধশাসনের ?
জয়-জয়কার উঠছে ম্লেচ্ছ ও পাপাচারীদের ?

বর্ষার মেদুর মেঘ ঢেকে দেয় চাঁদকে যেমন
তেমনি কি মারের প্রভাবে আবৃত হচ্ছেন মহাকরুণাময় ?
বস্তুর স্বভাব কি দৃশ্যমান হবে আপনার মধ্যেও,
হে আমার বজ্রসত্ত্ব মহাগুরু।
পাপের এই লক্ষণসমূহ দেখে এসেছি আপনার চরণের আশ্রয়ে
বিচার করুন, আশ্বাস দিন, আশীর্বাদ দিন
হে মহাকারুণিক আচার্য আমার।'

এই প্রার্থনার উত্তরে আচার্য বললেন,

'জন্মের শেষে মৃত্যু,
সব মিলনের অন্তে বিরহ;
সব সঞ্চয়ের শেষে বিলোপ,
এতে দুঃখের বা নিরানন্দের কী কারণ ?
—তুমি রসায়ন নিয়ে যাও।'

শিষ্য বললেন, 'গুরুর কাছে থেকে যদি সেবন করতে পারি, তবেই রসায়ন নেবো, নইলে আমার দরকার নেই।' এই বলে গুরুর কাছে থেকে গেলেন।

তারপর আচার্য আর্য তাঁর যা কিছু ছিল, সব দান করে দিলেন।

ব্রহ্মা তাঁর দেবমূর্তি ছেড়ে এক ব্রাহ্মণের ছদ্মবেশে এসে তাঁর মস্তক চাইলেন, আচার্যও তা দেবেন, প্রতিজ্ঞা করলেন।

আচার্যের তিরোধানের শোক সহ্য করতে না পেরে রাজা *সালভন্দ আচার্যের চরণ শিরে ধারণ করে প্রাণত্যাগ করলেন।

সবাই তখন ব্রাহ্মণকে দোষী করল। আচার্যের মাথা কেউ কাটতে পারছিল না। একটি কুশের ডগা দিয়ে নিজের মাথা কেটে আচার্য তা (ছদ্মবেশী) ব্রাহ্মণকে দান করলেন। তারপর গাছপালা সব শুকিয়ে গেল। মানুষের পুণ্যও হ্রাস পেল।

আগের সেই আটজন যক্ষিণী তাঁর দেহ সুরক্ষিত করে রাখল, এখনও সেইভাবেই আছে।

গুরু পরম্পরায় নাগবোধি তাঁর মূলশিষ্য। রাতের চন্দ্রকিরণের মতো প্রভায় উজ্জ্বল হয়ে তিনি বিরাজ করছেন।

জিন মৈত্রেয়র শাসনকালে আচার্য সশরীরে পুনরুত্থিত হয়ে প্রাণীদের হিত করবেন, বলা হয়।

*গুরু নাগার্জুনের বিবরণ সমাপ্ত॥

*কাহ্নপা

*গুরু *কাহ্নপার কাহিনী।

নাম *আচার্য *কাহ্নপা বা আচার্য কৃষ্ণচারী।

দেশ *সোমপুরী, গুরু *জালন্ধরপা। জাতিতে কায়স্থ। তিনি ছিলেন রাজা দেবপালের প্রতিষ্ঠিত *সোমপুরী বিহারের এক ভিক্ষু।

গুরু *জালন্ধরপার কাছে তিনি অভিষেক ও উপদেশ গ্রহণ করলেন। তারপর বারো বছর সাধনা করার পর হঠাৎ একদিন ভূমিকম্প শুরু হলো। হেবজ্র দেবতাদের সাক্ষাৎ দর্শন লাভ করছি—এই ভেবে তিনি উৎফুল্ল হয়ে উঠলেন।

*ডা. কি. মা. (ডাকিনী) বললেন, 'কুলপুত্র, এই লক্ষণ অশুভ, তাই গর্বিত হয়ো না।—সত্যের তত্ত্বকে তুমি জানতে পারোনি।'

একবার পাথরে তাঁর পা রাখা মাত্রই পাথর দেবে গেল। 'আমি এখন সর্বসিদ্ধি লাভ করেছি।' এই ভেবে তাঁর মনে গর্ব হলো। যখন আবার তিনি পা তুলে নিলেন তখন দেখলেন জমি না ছুঁয়ে তাঁর পা এক হাত উঁচুতে আছে। তখন আগের চেয়ে অহংকার আরও বাড়লো।

তারপর আকাশে সপ্ত ছত্র দেখা গেল, আকাশে সপ্ত ডমরুর ধ্বনি আপনা থেকেই বাজতে লাগল। সেই ছত্র ও ডমরু পেয়ে (কাহ্নপা) ভাবলেন, 'তাহলে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়েছি।' শিষ্যদের সবাইকে বললেন, 'এখন আমরা সবাই সিদ্ধিলাভ করেছি। এবারে আমরা প্রাণীহিতের জন্য রাক্ষসদের দেশ *লংকাপুরীতে যাব।' এই বলে তিন হাজার শিষ্যসহ রওনা হলেন।

সমুদ্রতীরে এসে শিষ্যদের সেখানে রেখে তিনি জলের উপর দিয়ে চলতে লাগলেন, ডুবে গেলেন না। এতে তাঁর খুব অহংকার হলো। ভাবলেন, 'আমি যা পারি আমার গুরুরও তা করবার ক্ষমতা নেই।' এ কথা ভাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি সমুদ্রের জলে ডুবে গেলেন।

সমুদ্রের তরঙ্গের তলদেশ পর্যন্ত দেখতে পেলেন (জলের তলায় তলিয়ে গেলেন)। শূন্যে দৃষ্টি মেলে দেখলেন গুরু *জালন্ধরপা আকাশে অবির্ভূত হয়েছেন।

গুরু বললেন, '*কাহ্নপা কোথায় গেল ? সে কী অপরাধ করেছে ?'

লজ্জিত হয়ে কাহ্নপা বললেন, 'প্রাণীহিতের জন্য আমি রাক্ষসদের দেশ *লংকাপুরীতে যাচ্ছিলাম, গুরুর চেয়ে আমার শক্তি বেশি মনে এই অহংকার জাগায় জলে ডুবে গেছি।'

গুরুর মুখ থেকে এই বাণী নির্গত হলো, 'এখন এভাবে কোন হিত হবে না। *সালপুত্র নামে আমার দেশ, সেখানে *ধর্মফল নামে এ ধর্মরাজ আছেন। সেখানে আমার এক তাঁতিশিষ্য আছে। সেখানে যাও, সে যা উপদেশ দেয়, সেইভাবে কাজ কর।

*কাহ্নপা এই উপদেশ হৃদয়ে ধারণ করে পা দিয়ে মাটি না ছুঁয়ে, ছত্র ও ডমরু শূন্যে রেখে এগিয়ে চললেন। (পাথরে) পা ডুবে যাওয়া ইত্যাদি সব ক্ষমতা আবার ফিরে পেলেন তিনি। তিন হাজার শিষ্য নিয়ে *সালপুত্রে গেলেন। শিষ্যদের এক জায়গায় রেখে আচার্য তাঁতির সন্ধানে গেলেন।

পথে অনেক তাঁতির দেখা পেলেন। তারা ছেঁড়া সুতো নিজেরাই জুড়ছে দেখে বুঝলেন এরা নিশ্চয়ই সেই তাঁতি নয়। গ্রামের শেষে এক তাঁতি ছিলেন, সেখানে গিয়ে দেখলেন তাঁর ছেঁড়া সুতো জুড়বার দরকার হচ্ছে না, নিজে থেকেই জুড়ে যাচ্ছে। 'নিশ্চয় ইনিই সেই লোক।' এই ভেবে সেই তাঁতির পায়ে প্রণাম করে তাকে প্রদক্ষিণ করলেন।

তাঁতি তাকে বললেন, 'আমি যা বলবো, তুমি তা শুনে সেইভাবে করবে তো?' সে কথা মেনে নেওয়াতে *কাহ্নপাকে নিয়ে তাঁতি এক শ্মশানে গেলেন। সেখানে এক মৃতদেহ দেখে তাঁতি *কাহ্নপাকে বললেন, 'মানুষের মাংস খেতে পারবে কি? যদি পারো, তাহলে এর মাংস খাও।'

*কাহ্নপা ছুরি বার করে শবটি কাটতে গেলে তাঁতি বললেন, 'একটু অপেক্ষা কর।' বলে নেকড়ে বাঘের ছদ্মবেশ নিয়ে মাংস খেয়ে নিলেন।

তাঁতি বললেন, 'এই রকম মায়াশক্তির দ্বারাই তুমি মাংস ভক্ষণ করতে পারবে।'

তাঁতি মহাগন্ধযুক্ত (দুর্গন্ধময় মল?) তিনটি বটিকা নিয়ে *কাহ্নপাকে একটি দিয়ে বললেন, 'খেয়ে নাও।'

লোকেরা ঠাট্টা করবে বলে *কাহ্নপা খেতে চাইলেন না। তখন তাঁতি নিজে একটি খেলেন, আকাশের দেবতারা একটি নিলেন আর পাতালের নাগরা একটি নিয়ে গেল।

তারপর দুজনে ফিরে আসার সময় তাঁতি পাঁচ পণ দিয়ে মদ ও খাবার কিনলেন আর বললেন, 'তোমার সব অনুচরদের নিমন্ত্রণ করে আনো। আমরা একটি গণচক্রের ব্যবস্থা করবো।'

*কাহ্নপা ভাবলেন, 'এ দিয়ে অর্থাৎ ঐ মদ ও খাদ্য দিয়ে তো একজন মাত্র

লোককেও আপ্যায়ন করা যাবে না। তিন হাজার শিষ্যের ব্যবস্থা কী করে হবে ?'

—শিষ্যরা এলে, নাড়ু, চাল যবের মণ্ড ইত্যাদি কামনা করা মাত্র যোগীর আশীর্বাদে সকল পাত্র সেই খাদ্যসামগ্রীতে পূর্ণ হয়ে গেল ।

গণচক্রে সাতদিন ধরে পানভোজনেও তা নিঃশেষ হলো না। *কাহ্নপা বললেন, 'সমুদ্রের মত এত সুবিপুল এই খাদ্য পানীয় শেষ করা যাবে না ।'

*কাহ্নপা তখন অনুচরদের নিয়ে রওনা হবার উদ্যোগ করলে তাঁতি বললেন,

'উপায় ও প্রজ্ঞাহীন যোগী যারা
তাদের বালসুলভ বুদ্ধিতে
ডেকে আনে নিজেরাই নিজেদের সর্বনাশ ।
সে পথে তুমি যাবে না,
অন্যত্র যাওয়া তাই অর্থহীন তোমার ।
অতি সাধারণ সিদ্ধি তোমার ছত্র ও ডমরুর ।—
এখনও তো তুমি ধর্মতার লক্ষণ জানো না, তাই সাধনা করো ।'

*কাহ্নপা তা চাইলেন না, তিনি *ভাধোকোর নামক দেশে চলে গেলেন ।

পূর্বদিকে *সোমপুরী বিহার থেকে প্রায় শত যোজন দূরে এই নগর । সেখানে সিঁদুর রঙের লিচু ফলের একটি গাছের নীচে একজন স্ত্রীলোক বসেছিল ।

'আমাকে ফল দিন ।'—*কাহ্নপা তাকে বললেন । দিতে তার অনিচ্ছা দেখে *কাহ্নপা দৃষ্টি নিক্ষেপ করে গাছের ফলগুলিকে মাটিতে ফেলে দিলেন । পাল্টা দৃষ্টি ক্ষেপণ করে স্ত্রীলোকটি আবার ফলগুলিকে মাটি থেকে তুলে গাছে জুড়ে দিলেন। রেগে গিয়ে *কাহ্নপা সেই নারীর উদ্দেশ্যে মন্ত্র পড়লেন । তাতে সেই নারীর সর্বাঙ্গ রক্তাক্ত হয়ে গেল, সে মাটিতে লুটিয়ে পড়ল ।

লোকে *কাহ্নপাকে দোষারোপ করে বলতে লাগল, 'বৌদ্ধরা পরম করুণাময়, আর এই যোগী মানুষ খুন করছে ।'

এই কথা শুনে *কাহ্নপা নিজের চিত্তকে শান্ত করলেন ; নিজের মন্ত্রকে প্রত্যাহার করে নিয়ে সেই নারীর প্রতি চিত্তে করুণা জাগ্রত করলেন ।

তখন সেই স্ত্রীলোকটি নিজের গুপ্তবিদ্যার মন্ত্র দিয়ে *কাহ্নপাকে আঘাত করলেন । দেহের উপরিভাগ ও নিম্নভাগ (রক্ত বমি ও প্রস্রাব ইত্যাদি) থেকে রক্তপাত হয়ে *কাহ্নপা অসুস্থ হয়ে পড়লেন । তিনি *ভদ্রে নামের এক ডাকিনীকে বললেন, 'আমার এই বমির প্রতিষেধক ওষুধ দক্ষিণে শ্রীপর্বতে আছে, সেখান থেকে এনে আমাকে দাও ।'

সেখান থেকে শ্রীপর্বত ছমাসের পথ, *ভদ্রে একদিনেই সেইখান থেকে ওষুধ নিয়ে এল। সাতদিনের শেষে তাঁর দেশে পৌঁছাবার পথে আগের সেই স্ত্রীলোক এক বৃদ্ধার রূপ নিয়ে পথের ধারে বসে কাঁদতে লাগল।

'তুমি কাঁদছ কেন?'—এই প্রশ্নের উত্তরে সে বলল, 'যোগী কাহ্নপা মারা গেছেন বলে কাঁদছি।'

'তাহলে ওষুধের আর দরকার নেই'—বলে ডাকিনী *ভদ্রে ওষুধটি মাটিতে ফেলে দিল আর সঙ্গে সঙ্গে বৃদ্ধা সেটি তুলে নিল।

ডাকিনী ঘরে এসে দেখল *কাহ্নপা জীবিতই আছেন। 'ওষুধ কোথায়?' *কাহ্নপা জিজ্ঞাসা করলেন, ডাকিনী তখন সেই অদ্ভুত ঘটনার কথা বলল।

তারপর *কাহ্নপা সাতদিন ধরে শিষ্যদের ধর্মদেশন করলেন ও ছিন্নমস্তা বরাহীর উপদেশ দিলেন। শেষে বিপাকদেহ ত্যাগ করে স্বর্গে চলে গেলেন।

ডাকিনী *ভদ্রে ক্রুদ্ধ হয়ে সেই নারীকে খুঁজে বেড়াতে লাগল। উপরে দেবলোকে, নীচে নাগলোকে, মাঝখানে মর্ত্যলোকে কোথাও তাকে পেল না।

*শমভিল নামে এক গাছের মধ্যে সে ছিল। ডাকিনী তাকে ধরে মন্ত্র পড়ে তাকে মেরে ফেলল।

অহংকার আর ঈর্ষা যে বাধা হয়, তা মনে রাখা দরকার।

*গুরু *কাহ্নপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কর্ণরিপা

*গুরু *কর্ণরিপার কাহিনী।

চার প্রকার জন্মস্থানের মধ্যে অলৌকিকভাবে জন্ম।

শ্রী *নলেন্দ্র বিহারে গিয়ে তিনি সব প্রব্রজ্জিতদের উপাধ্যায়ের কাজ করলেন, তাঁর একলক্ষ শিষ্য হল।

তিনি নিজেও অনেক আচার্যের কাছে উপদেশ প্রার্থনা করলেন, কিন্তু বোধিলাভ করতে পারলেন না।

আচার্য নাগার্জুন দক্ষিণ দেশে আছেন, এ কথা জেনে তাঁর বিশেষ শ্রদ্ধা হলো ও তিনি দক্ষিণের পথে যাত্রা করলেন।

এক মহাসাগরের তীরে আর্য মঞ্জুশ্রী এক জেলের রূপ ধারণ করে বসেছিলেন, *কর্ণরিপা তাঁকে দেখে মুদ্রা ও মণ্ডল দান করলেন।

'দক্ষিণদেশে আচার্য নাগার্জুন আছেন, আমি তাঁর কাছে যেতে চাই, আমাকে দয়া করে পথ দেখিয়ে দিন।'

'ওখানে গভীর অরণ্যের মধ্যে এক রসায়নসিদ্ধ আছেন।' এই নির্দেশ পেয়ে সেখানে গেলেন।

দেখলেন রসায়নক্রিয়ার জন্য উপকরণসমূহ সংগ্রহ করে আচার্য প্রয়োগ করছেন। প্রণাম করে তিনি আচার্যের শিষ্যত্ব প্রার্থনা করলেন। সম্মত হয়ে আচার্য তাঁকে গুহ্যসমাজ-মণ্ডলে অভিষিক্ত করলেন। তিনিও উপদেশ লাভ করে আচার্যের কাছে ধ্যানে স্থিত হলেন।

সেই অরণ্যের অনতিদূরে এক নগর ছিল। দুজনে সেখানে পিণ্ডভিক্ষায় গেলেন।

*কর্ণরিপা অতি সুখাদ্য ভিক্ষা পেলেন, আচার্য স্বাদু খাদ্য পেলেন না।

আচার্য বললেন, 'কামভাব নিয়ে লালসায় কোনও স্ত্রীলোক তোমাকে এই সুখাদ্য দিয়েছে, এটা কিছু সুস্বাদু নয় আর এইভাবে তোমার নেওয়াও উচিত নয়। তুমি পাতা ভরে খাদ্য নেবে না, সূচ্যগ্র পরিমাণ খাদ্য গ্রহণ করবে।'

তিনিও তাই করলেন আর ছুঁচের ডগায় ভাতের মণ্ড যেটুকু ধরে তাই নিয়ে সেইটুকুই খেলেন।

পর দিন সকালে মহিলারা চাপাটি বানিয়ে তার উপর নানা ব্যঞ্জন দিয়ে নিয়ে এলেন। তিনি (কর্ণরিপা) ছুঁচের আগা দিয়ে তা তুলে নিয়ে গুরুকে দিলেন, নিজেও নিলেন।

গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী করে নিলে?' তিনি বললেন, 'আমার গুরুর উপদেশ মতোই আমি কাজ করেছি।'

গুরু আদেশ করলেন, 'তুমি এখন নগরে না গিয়ে ঘরেই থাকো।' গুরুর উপদেশে তিনিও তাই করলেন।

বৃক্ষদেবী প্রচুর সুমিষ্ট খাদ্য নিয়ে গৃহের ভিতরে এসে সশরীরে দর্শন দিলেন, প্রণাম করলেন, কথাবার্তাও বললেন।

সেই পিণ্ড (খাদ্য) গ্রহণের জন্য গুরুকে যখন তিনি আমন্ত্রণ জানালেন তখন গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ তুমি কার কাছে পেলে?'

*কর্ণরিপা উত্তর দিলেন, 'বৃক্ষদেবী দিয়েছেন।' এ কথার সত্যতা নির্ধারণের

জন্য গুরু বৃক্ষদেবীর কাছে গেলেন কিন্তু সম্পূর্ণ দেবীমূর্তিকে দেখতে পেলেন না, দেবীর বাহুর অংশমাত্র দেখতে পেলেন।

আচার্য বললেন, 'আমার শিষ্যকে সশরীরে দর্শন দিলে, আমাকে দিলে না কেন?'

তখন বৃক্ষ থেকে এই বাক্য উদ্গত হলো, 'তুমি এখনও ক্লেশের আবরণ মুক্ত হওনি ; তোমার শিষ্য ক্লেশ সমুদয় ত্যাগ করতে পেরেছে। তাই সে আমার পূর্ণরূপ প্রত্যক্ষ করতে পেরেছে।'

তারপর আচার্য ও শিষ্য দুজনে ভেবে দেখলেন যে রসায়ন সেবন করা প্রয়োজন। আচার্য *কর্ণরিপা বা *আর্যদেবকে রসায়ন দিলেন, নিজেও খেলেন।

*কর্ণরিপা একটি শুকবৃক্ষে রসায়ন সিঞ্চন করলেন, সেই বৃক্ষে পত্র উদ্গত হলো।

আচার্য তাই দেখে একটু হাসলেন, বললেন, 'তুমি আমার রসায়ন বৃক্ষে সেচন করেছো, এখন তা (ফিরিয়ে) নিয়ে এসো।'

*কর্ণরিপা বললেন, 'যদি চান, দেবো।' পূর্ণ জলের কলসের মধ্যে নিজের জল (মূত্র ?) ভরে একটি কাঠের টুকরো দিয়ে নেড়ে নেওয়াতে তা রসায়ন হয়ে গেল। আচার্যের কাছে গিয়ে সেটি দিলেন।

পরীক্ষা করে দেখবার জন্য আচার্য সেটি শুকনো কাঠের উপর ঢেলে দিলেন। নতুন গাছ গজিয়ে উঠল। শিষ্যের বোধি উৎপন্ন হয়েছে কিনা—গুরু এইভাবে তা পরীক্ষা করলেন।

তারপর বোধি উৎপন্ন হয়েছে জেনে উপদেশ দিলেন, 'আর তুমি এ সংসারে থেকো না।'

এ কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই শিষ্য শূন্যে উঠে গেলেন।

পূর্বে আচার্যের অনুচরদের মধ্যে এক সেবিকা নারী ছিল। আচার্য তাকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কিসের কামনায় তুমি আমার সেবা করেছো?'

সেই নারী বলল, 'আমার অন্য কিছুর দরকার নেই। আপনার চোখ আমার ভালো লাগত বলে সেবা করেছি, চোখই আমি চাই।'

নিজের দক্ষিণ নেত্র উৎপাটিত করে আচার্য তাকে দিলেন। সর্বদিকে একচক্ষু *আর্যদেব বলে তিনি খ্যাত হলেন।

গুরু নাগার্জুনের উপদেশের তাৎপর্য হৃদয়ঙ্গম করে *আর্যদেব *কর্ণরিপা নিজের চিত্তমল শুদ্ধ করে বন্ধনমুক্ত হলেন। গুরুর উপদেশ শুনবার সঙ্গে সঙ্গে তিনি আকাশে সাততি তালবৃক্ষের মতো উচ্চে উঠে গেলেন আর সেখান থেকে বহু প্রাণীকে ধর্মদেশন করলেন। তাদের চিত্তও পরিপক্ব হলো।

গুরু তাঁর নীচে অবস্থান করছেন বলে তিনি তাঁর পা দুটি শূন্যে তুলে দিয়ে মাথা নিচুর দিকে করে করজোড়ে গুরুদেবকে প্রণাম জানালেন ।

তখন পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগল আর তার মধ্যে তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন ।

যিনি আচার্য *আর্যদেব এবং *গুরু *কর্ণরিপা এই দুই নামে বিভূষিত তাঁর বিবরণ সমাপ্ত ॥

*থগনপা

*গুরু থকনপা / থগনপার কাহিনী ।

গুরু থকনপা (ঠগ ?) : সর্বদা মিথ্যা কথা বলতেন ইনি ।

তাঁর কাহিনী : দেশ পূর্বভারত, নিম্নকুল, জীবিকায় নিম্নশ্রেণীর মানুষ ।

একদিন তিনি গাছের উপরে বসে কীভাবে অন্যদের মিথ্যা বলা যায়, ভাবছিলেন ।

তাঁর কাছে এক সুপরিশুদ্ধ ভিক্ষু এলেন ; জানতে চাইলেন, 'তুমি এখানে বসে কী করছ ?'

তিনি বললেন, 'আর্য, আমি বলতে পারব না ।' 'তোমাকে মিথ্যা কথা বলতে হবে না, লুকোতেও হবে না । (মিথ্যা বলার ফলে) বিপাকী প্রাণীকে নরকে জন্ম নিতে হয় । মিথ্যা বলার প্রত্যক্ষ ফল এই যে মিথ্যা বলার ইচ্ছা বাড়বে, অন্যরা তোমাকে বিশ্বাস করবে না ।'

'মিথ্যা বলার ফল হবে এই যে ক্ষেতে যেমন হল চালনা করা হয়, পরে (পরলোকে ?) তোমার জিহ্বারও সেই অবস্থা হবে । মুখ থেকে অপ্রিয় গন্ধ বেরোবে, বাক্যও অপ্রিয় হবে । যেমন লোনা জমি চাষ করলে শস্যও নীরস ও নোনা হয়, তেমনি ফল হবে ।'—ভিক্ষু বললেন ।

মিথ্যার পরিণাম কী তা আগে শোনেননি, এখন শুনে ভয় পেয়ে গেলেন আর তাই সত্য কথা বললেন :

'আর্য, আমার নাম *থকন, কেশাগ্রের শতাংশ মাত্রও সত্য বলতাম না ; কী করে কাকে মিথ্যা বলা যায়, তাই ভাবছিলাম ।'

ভিক্ষু বললেন, 'তুমি কি ধর্মাচরণ করবে না ?' তিনি বললেন, 'আর্য, ধর্মাচরণ

করতে পারি তবে প্রথম থেকে মিথ্যা বলার অভ্যাস হয়ে গেছে, এখন তা ছাড়তে পারব না।'

'এমন উপদেশও আছে যে তুমি মিথ্যা বললেও কিছু আসে যায় না।'

'এরকম ধর্ম থাকলে আমি নিতে পারি। আমাকে উপদেশ দিন।'

দেহ-মন ও আচরণে যতটা গ্রহণ করতে পারেন—গুরু তাঁকে এমন উপদেশ দিলেন।

কানে জল গেলে জল দিয়ে যেমন সেই জল বার করতে হয়, মিথ্যা দিয়ে মিথ্যাকে দূর করার উপদেশই তিনি দিলেন :

'সর্ববস্তু আদি থেকেই মিথ্যা।
তোমার দর্শন শ্রবণাদি ইন্দ্রিয় ও তার অভিজ্ঞতাও সবই মিথ্যা।
'সব কিছুই মিথ্যা একমাত্র কর এই ধ্যান
সংসারে ধর্মসমূহ মিথ্যা—
সেগুলিকে মিথ্যা বলে না জানাটাও মিথ্যাবাদ মাত্র।
জ্ঞান ও জ্ঞেয় সবই মিথ্যা।
এইভাবে ষড় ইন্দ্রিয় ও তার সমুদয়
সেও তো মিথ্যা! তাতে কোথায় সত্য ?
দুঃখ ভোগ করে (সেই যে) জগৎ
মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবে।
মিথ্যাকে সত্য বলে ভেবে নেয় সে শিশুর মতো,
আঁকড়ে ধরে সে মিথ্যাকেই।
জলের কলসি যেমন বারবার ডোবে জলে
তেমনি আবর্তিত হবে সে সংসারের আবর্তে।
ধ্যান কর—সর্বধর্ম মিথ্যা।
বাক্য মিথ্যা, শব্দ মিথ্যা
মিথ্যা রূপসমূহ—
আয়ত্ত কর এই উপলব্ধি,—
সর্ব-মিথ্যা ধ্যান কর।'

—এই উপদেশ দিলেন। (থকনপাও) সর্বজ্ঞেয়কে মিথ্যা বলে ধরে নিয়ে সাত বছরেই সব জাগতিক বস্তুর অস্তিত্বকে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করলেন। সর্ব

বিষয়কে মিথ্যা বলে উপলব্ধি করায় তাঁর বিষয়ে আসক্তি চলে গেল, তাঁর বোধি জাত হলো।

তখন সেই গুরু আবার এলেন, বললেন, 'সর্ববস্তুকে মিথ্যা বলে জানলেই হবে না। উৎপত্তি নেই, নিরোধও নেই—সর্বধর্ম স্বভাবেই শূন্য বলে জানো।'—এই উপদেশ দিলেন।

তিনিও সেইভাবে ধ্যান করলেন। সেই জ্ঞানের সাহায্যে সিদ্ধিলাভ করলেন। সর্বদিকে *গুরু *ঠকনপা নামে খ্যাত হলেন। ভাগ্যবানদের (শিষ্যদের) 'কর্ণকুহর থেকে জল নিঃসরণ' উপদেশ ব্যাখ্যা করলেন। তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

গুরু *থকনপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*নারোপা

*গুরু *নারোপার কাহিনী।

শুঁড়ির ঘরে জন্ম তাঁর। কুলকর্ম ত্যাগ করে ভারতের পূর্বদিকে *সালপুত্র নামে এক জায়গায় কাঠ জোগাড় করে তিনি বিক্রি করতে লাগলেন।

এই কাজ করতে করতে একদিন তিনি শুনতে পেলেন *বিষ্ণুনগর নামে এক জায়গায় *তিল্লোপা নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন।

এই শুনে কাঠের বদলে তিনি কৃষ্ণসার চর্ম নিয়ে যোগীর বেশ ধারণ করলেন। তারপর *তিল্লোপা-কে খুঁজতে গেলেন। *বিষ্ণুনগরে গিয়ে খবর করে জানলেন, আচার্য সেখান থেকে চলে গেছেন।

সব জায়গায় খুঁজেও *নারোপা তাঁকে পেলেন না। অনেক দিন পরে হঠাৎ পথে তাঁর দেখা পেলেন। *নারোপা তাঁকে প্রণাম, প্রদক্ষিণ ইত্যাদি করলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'গুরু, আপনার শারীরিক কুশল তো?'

তিল্লোপা বললেন, 'আমি তোমার গুরু নই, তুমি আমার শিষ্যও নও।' এই বলে রেগে গিয়ে তাকে মারলেন, তা সত্ত্বেও *নারোপা তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন।

তিনি মাটির হাঁড়িতে করে পিণ্ড (ভিক্ষা) নিয়ে গুরুকে পরিবেশন করলেন, গুরুও তা গ্রহণ করলেন। তারপরেই আবার রেগে গিয়ে *নারোপাকে মারলেন। *নারোপা কিন্তু অত্যন্ত শ্রদ্ধাভরে গুরুর উচ্ছিষ্ট ভোজন করলেন, প্রণাম ও

প্রদক্ষিণ করলেন। প্রতিদিন সন্ধ্যায় তিনি সেখানে এসে শয়ন করতেন আর ভোরে উঠে পিণ্ডের জন্য যেতেন। তারপর তা গুরুকে খেতে দিতেন।

মনে কোন খেদ না রেখে তিনি বারো বছর এইভাবে গুরুর সেবা করলেন কিন্তু রাগের কথা ছাড়া সামান্য একটি বাক্য বা শব্দও শুনতে পেলেন না।

কোনো এক সময়ে এক গৃহস্থ বাড়িতে বিবাহ অনুষ্ঠান হচ্ছিল। সেখানে তিনি পিণ্ডের জন্য গেলেন। সেখানে তিনি প্রচুর খাবার দাবার পেলেন, চুরাশি ব্যঞ্জনের মধ্যে সবুজ *পতস (পটল?) নামে সব্জির একটি তরকারি খুব স্বাদু লাগল। তাই এনে গুরুকে পরিবেশন করলেন, গুরুও সেই ব্যঞ্জন খেয়ে পরম পরিতৃপ্ত হলেন।

*তিল্লোপা বললেন, 'পুত্র, এ তুমি কোথায় পেলে?'

এ কথা শুনে *নারোপা প্রথম (ভূমি) প্রাপ্তের মতো উল্লসিত হলেন। ভাবলেন, বারো বছর ধরে গুরুর সেবা করছি, কিন্তু এতদিন তিনি, 'তুমি কে?' এই কথাটিও বলেননি, আজ 'পুত্র ইত্যাদি' বলছেন।

*তিল্লোপা বললেন, 'ঐ সুস্বাদ ব্যঞ্জন আবার নিয়ে এসো।'

তারপর তিনি চারবার আনতে গেলেন, গৃহস্থ বাড়ির লোকরা তাঁকে খুশি হয়েই দিলেন। পাঁচবারের বার *নারোপা ভাবলেন, 'এখন আর চাইতে যাওয়া বড়ো লজ্জার ব্যাপার হবে। কিন্তু যদি না আনি, তাহলে গুরু অসন্তুষ্ট হবেন।'

এই সব ভেবে তিনি আবার ভিক্ষা আনতে গেলেন। বাড়ির লোকে তখন অন্য কাজে ব্যস্ত ছিল, সেই সুযোগে ব্যঞ্জনটি পাত্রসহ চুরি করে আনলেন। গুরুকে পরিবেশন করায় তিনি খুব সন্তুষ্ট হয়ে *নারোপাকে আশীর্বাদ ও অভিষেক দিলেন। বজ্রবরাহীর উপদেশ নিয়ে সাধনা করায় ছ'মাসের মধ্যে সিদ্ধিপ্রাপ্ত হলেন। *নারোপা নামে সর্বদিকে খ্যাত হলেন।

চারিদিক থেকে লোক এলেন তাঁকে পূজা করবার জন্য। তাঁরা দেখলেন, তাঁর বুক থেকে আলোকরশ্মি নির্গত হচ্ছে। দূর থেকে—এক মাসের পথ থেকেও—তা দেখা যেতে লাগল।

তারপর অগণ্য ভক্তদের হিত সাধন করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *নারোপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*শলিপা

*গুরু *শলিপার কাহিনী।

*শলিপা অর্থে শেয়াল। তাঁর দেশ ছিল *বিষম্নর। জাতিতে শূদ্র, জীবিকাও সেই রকম ছিল।

*বিষম্নর নগরের কাছে এক শ্মশান ছিল, সেই শ্মশানের কাছে এক জায়গায় একটি লোক থাকতেন। সব সময় শেয়ালের ডাক শুনতে শুনতে মহা আতঙ্কে তাঁর দিনরাত্রি কাটত।

একদিন এক ভিক্ষু তাঁর কাছে পিণ্ডের জন্যে এলেন। ভিক্ষুকে প্রণাম করে তিনি পাদ্যার্ঘ্য দিলেন আর সব কথা খুলে বললেন।

ভিক্ষু তাঁকে দানের মাহাত্ম্যের কথা বলে উপদেশ দিলেন। তিনি বললেন, 'আর্য, দানের মাহাত্ম্যের উপদেশ আশ্চর্য—এ তো বুঝলাম। কিন্তু এ ছাড়া ভয় না পাওয়ার ধর্মদেশনের ক্ষমতা যদি আপনার থাকে, তাই আমাকে দান করুন।' —এই প্রার্থনা জানালেন।

ভিক্ষু বললেন, 'ভবদুঃখের ভয় ছাড়া আর কিসের ভয় করছ?'

'সব সাধারণ মানুষেরই ভবদুঃখের ভয় আছে।'—বললেন *শলিপা।

'আমার ধারণ করার শক্তি অল্প। শ্মশানের কাছে থাকি বলে দিনরাত শেয়ালের ডাকে ভয় পাই। এই ভয় কেটে যাবে এমন উপদেশ পেলে নেব।' —আরও জানালেন তিনি।

ভিক্ষু বললেন, 'ভয় দুর হয়—এমন উপদেশ ও মন্ত্র আমার কাছে আছে।'

*শলিপাকে তিনি অভিষেক দিলেন। স্বর্ণ রৌপ্য ইত্যাদির প্রচুর দক্ষিণা দিয়ে *শলিপাও উপদেশ দিতে তাঁকে অনুরোধ করলেন। তিনিও ভীতিগ্রস্তের ভয় দুর করবার উপদেশ দিলেন।

'তুমি শত্রুদের ভয় পাও না, কিন্তু শেয়ালের ডাকে ভয় পাও! সংসারের সকল আওয়াজ শেয়ালের ডাকের সঙ্গে অভিন্ন করে তুমি দিনরাত ধ্যান কর। শ্মশানে কুটির তৈরি করে বাস কর।' এই উপদেশ দিলেন।

তিনিও (শলিপা) সেইভাবে ধ্যান করতে লাগলেন। সকল শব্দের গর্ভে অবিরত শূন্যতা ধ্বনিত হচ্ছে এই বোধ তাঁর জাগল। তার ফলে শেয়ালের ডাকের ভয়ও দুর হয়ে গেল।

ভীতিমুক্ত হয়ে তাঁর হৃদয়ে অভয় মহাসুখ জাগ্রত হল। ন' বছর ধ্যান করে দেহে মনে বিমলশুদ্ধ হয়ে মহামুদ্রার পরমসিদ্ধি লাভ করলেন।

তারপর এক শেয়ালের মৃতদেহ কাঁধে নিয়ে আচার-আচরণ করতেন বলে সব দিকে যোগী *শলিপা নামে খ্যাত হলেন।

ভক্তদের বিনীত করে তাদের (শূন্যতার) অভিন্ন দৃষ্টির বহু উপদেশ দিয়ে শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *শলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*তিল্লোপা

*গুরু *তিল্লোপার কাহিনী।

*ভিগুনগর (মতান্তরে বিষ্ণুনগর) নামে এক দেশে আচার্য *তিল্লোপা নামে এক মহাপণ্ডিত বাস করতেন। তিনি রাজ-পুরোহিত ছিলেন এবং প্রতিদিন পাঁচশো স্বর্ণমুদ্রা বৃত্তি পেতেন।

তাঁর অগণিত অনুচর ও শিষ্য ছিল। তাঁদের কাছে ধর্ম ব্যাখ্যায় নিমগ্ন থাকার সময় হঠাৎ তাঁর মনে হল, 'আমার এই নিরর্থক জীবনে লাভ কী? আমার জন্ম একান্তই অর্থহীন।'

এই ভেবে বারবার পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলেন, কিন্তু অনুচররা ছাড়লেন না। চীবর ত্যাগ করে সেলাই করা পোশাক পরে (সাধারণ বেশে) আচার্য পালিয়ে গেলেন। চিঠি লিখে রেখে গেলেন : 'আমি আর ফিরব না, আমাকে ফিরিয়ে আনার চেষ্টা তোমরা কোরো না।'

রাতে তিনি পালিয়ে গেলেন আর *কাঞ্চী নগরের এক শ্মশানে বাস করতে লাগলেন। প্রতিদিন পিণ্ড (ভিক্ষা) গ্রহণ করে সেখানে সাধনা করতে লাগলেন। এইভাবে সাধনার কালে *নারোপার সঙ্গে তাঁর দেখা হল। পিণ্ড এনে *নারোপা তাঁকে দিতে লাগলেন।

এইভাবে জীবনচর্যায় দশবছর সাধনার ফলে সকল মল শুদ্ধ করে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধি পেলেন। তিনি দেবলোকে গেলেন আর দেবতারা তাঁকে নৈবেদ্য নিবেদন করলেন।

কায়-মন-বাক্যে সিদ্ধিলাভ করে সবদিকে *তিল্লোপা নামে খ্যাত হলেন।

অগণিত ভক্তকে (সাধন) মার্গে এনে প্রাণীহিত করলেন। শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

গুরু *তিল্লোপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*চত্রপা

গুরু *চত্রপার কাহিনী।

নাম *চত্রপা। ইনি ধর্মের পুঁথি নিয়ে ভিক্ষা করতেন। তাঁর দেশ *সেন্ধ নগর; সেখানে (ব্যাকরণ বা অভিধান) শব্দগ্রন্থ নিয়ে সবসময় তিনি অন্যদের কাছে ভিক্ষা চাইতেন।

একদিন তিনি এক পরিশুদ্ধ যোগীর সাক্ষাৎ পেলেন। তিনি বললেন, 'তুমি কী কর?'

উত্তরে চত্রপা বললেন, 'জীবিকার জন্য আমি ভিক্ষা করি।'

'ভবিষ্যৎ জীবনের পথ কি দরকার নেই?'

'সে পথ কী করে জানবো?'—অনুনয় করায় যোগী তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক ও উপদেশ দান করলেন:

'স্বীকার কর সব পাপ (অপরাধ)
দিবারাত্র সদাসর্বদা কর সুখ ধ্যান
পূর্বকৃত কর্মের জন্য দায়ী তোমার শরীর,
ভবিষ্যতে যা ঘটবে তার জন্য
তোমার চিত্ত হবে দায়ী।
এই উপদেশ নিয়ে ধ্যান কর দীর্ঘকাল
বোধিলাভ করবে এ জন্মেই
তার লক্ষণও দেখা দেবে ক্রমে ক্রমে।'

এই উপদেশের অর্থ বুঝতে না পেরে *চত্রপা আবার গুরুকে জিজ্ঞাসা করলেন।

গুরু বললেন, 'পাপ হচ্ছে অবিদ্যা, তাই বিভ্রান্তির উৎস। এই প্রত্যক্ষ জগৎকে মহামুদ্রার কল্পনাসৃষ্টি বলে বুঝলে সর্ব পাপ শুদ্ধ হবে। সুখধ্যানের অর্থ করুণা, তাই অবিরত করুণা ধ্যান কর। ধর্মতার সুখ আপনা থেকেই জন্মাবে। পূর্ব ও পরের কর্মের আকাঙ্ক্ষা রেখো না, তবেই তোমার চর্যা পূর্ণ হবে। সুখ-দুঃখ চিত্ত থেকেই জাত হয়, তাই এখনও তার কামনা যদি কর, তাহলে তা একেবারেই নিরর্থক হবে।—এইভাবে অবিরত যদি ধ্যান করতে পার, তা হলে চিত্তের ভ্রান্তির নিরসন হবে, এই জন্মেই তার ফলস্বরূপ বোধিলাভ করবে।'—গুরু এই উপদেশ দিলেন।

*চত্রপাও *সেক্ষনগরে এইভাবে ধ্যান করে ছ' বছরে মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন।

যোগী *চত্রপা নামে সর্বদিকে প্রসিদ্ধ হলেন; পাঁচশ অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *চত্রপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*ভদ্রপা

*গুরু *ভদ্রপার কাহিনী।

*মণিধর নামের এক দেশে এক ব্রাহ্মণ অগাধ ধনসম্পদ ও অসংখ্য অনুচরসহ (ভোগসুখে) বাস করছিলেন।

একদিন তাঁর অনুচররা স্নান করতে গেল, তিনি নিজ গৃহেই থাকলেন। এমন সময় এক সুপরিশুদ্ধ যোগী তাঁর কাছে এসে আহার চাইলেন।

ব্রাহ্মণ (যোগীকে) বললেন, 'তুমি অশুচি, আমার গৃহ অপবিত্র করবে না, চলে যাও এখান থেকে। আমার অনুচররা ও অন্যরাও পছন্দ করবে না, চলে যাও।'

যোগী বললেন, 'অশুচি কাকে বলে?'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'যাদের দেহ অস্নাত, বসনহীন, ও কপালপাত্রধারী যারা অপবিত্র খাদ্য খায়, নীচকুলের যারা, তারাই অশুচি। শীঘ্র অন্যত্র যাও।'

যোগী বললেন, 'এরা অশুচি নয়; কায়-বাক-চিত্ত যার পবিত্র নয়, সেই অশুচি। শরীর ইত্যাদি ধৌত করলে চিত্তমলের শুদ্ধি হয় না। গুরুর উপদেশ দ্বারা যার চিত্তমল ধৌত হয়, সেই শুদ্ধ।' আরও

'মহাযান কুলিকই শ্রেষ্ঠ;
ক্ষত্রিয় বা ব্রাহ্মণ তা নয় তুলনায়।
শরীর ইত্যাদির মল অপবিত্র,
জল দিয়ে ধুলেই ধৌত হয় না সে মল।
গুরুর উপদেশে ধৌত হওয়াই অনুত্তরসিদ্ধি।
যা সে খায় তাই তার শ্রেষ্ঠ খাদ্য
আসক্তিহীন মানুষের (রসনায়)।

অমন শুদ্ধ নয় কখনও
তিন (দধি-দুগ্ধ-নবনীর মতো) শুভ্র বস্তু।'

—এই শুনে ব্রাহ্মণের শ্রদ্ধা হলো ; তিনি বললেন, 'আমাকে আপনি সেই উপদেশ দান করুন।'

'তাহলে আগে আমাকে খাবার দাও।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'অমি যদি এখানে ধর্ম শ্রবণ করি তাহলে আমার অনুচর ও অন্যরাও আমার উপর বিরক্ত হবে। আপনি যেখানে থাকেন, সেখানেই আমি যাবো। কোথায় আপনি থাকেন ?'

'আমি শ্মশানে থাকি। মদ ও শূকরমাংস নিয়ে সেখানে এসো।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'আমি ব্রাহ্মণ, মদ ও শূকরমাংসের নাম উচ্চারণ করাও আমার অনুচিত ; কী করে আমি তা নিয়ে যাব ?'

যোগী বললেন, 'উপদেশ যদি চাও, তাহলে এগুলি নিয়ে আসবে।'

ব্রাহ্মণ বললেন, 'দিনের বেলায় এগুলি নিতে পারবো না, রাতে আপনার কাছে যাব।'

ছদ্মবেশে বাজারে গিয়ে ব্রাহ্মণ মদ ও শূকরমাংস কিনলেন আর শ্মশানে গিয়ে যোগীকে সেগুলি পরিবেশন করলেন।

যোগী কিছুটা নিজে খেলেন, বাকিটা ব্রাহ্মণকে খেতে দিলেন, তারপর 'পরিবর্ত অভিষেক' দিলেন ও ব্রাহ্মণকে বললেন মণ্ডল রচনা করতে।

তারপর তাঁর জাতের অহংকার দূর করবার জন্য ব্রাহ্মণকে ঝাড়ুদারের কাজে লাগালেন। এইভাবে তত্ত্বলক্ষণ প্রদর্শন করলেন। তারপর সেখানে মাটিলেপার কাজ করিয়ে চর্যার লক্ষণ বোঝালেন :

এই লেপনের রং-ও সাধনার লক্ষণ। এই তিন (মদ্য, মাংস, চর্যা) যুক্ত হলে সাধনায় সিদ্ধি হয়।'

এই উপলব্ধির ফলে ব্রাহ্মণ বুঝলেন দৃশ্যমান সংসার মায়া মাত্র। জাতের সব বিকল্প ত্যাগ করিয়ে যোগী তাঁকে সাধনায় প্রবেশ করালেন। ছ' বছর সাধনা করে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন।

তিনি *ভদ্রপা নামে সর্বত্র খ্যাত হলেন। প্রাণীহিত করার পরে পাঁচশ অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ভদ্রপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*দুখণ্ডি

*গুরু *দুখণ্ডির কাহিনী।

*দুখণ্ড শব্দটিকে তিব্বতীতে অনুবাদ করলে বলা যায় 'যে দুইকে এক করে'। (?)

*গন্ধপুর নামে এক দেশে এক ভিখারী জঞ্জাল সংগ্রহ করত, অর্থাৎ ঝাড়ুদার শ্রেণীর লোক ছিল সে।

সবসময় সে পুরোনো ছেঁড়া-কাপড় জোগাড় করে খুব ভাল করে জুড়ে, সেলাই করে পরতো।

কোনও এক সময় এক সুপরিশুদ্ধ যোগী তার কাছে এলেন, বললেন, 'তোমার যে কিছু নেই, এই অভাবের দুঃখ নিয়েই কি (জীবন) কাটাবে ? তার চেয়ে তুমি ধর্ম করবে না ?'

সে বলল, 'আমায় কে ধর্ম দেবে ?'

যোগী বললেন, 'আমি দেবো।' বলে তাকে সম্বর অভিষেক, চিত্ত উৎপন্নক্রম ও সম্পন্নক্রম আয়ত্ত করার উপদেশ দিলেন। সে সেইভাবে সাধনা করল।

কিন্তু কাপড় সেলাই করার কথা ভাবতে ভাবতে ধ্যান করতে আর ইচ্ছা করল না।

সে বলল, 'যোগী, আমি ঐ এক ভাবনায় বিমনা হয়ে ধ্যান করতে পারছি না।'

সেই ভাবনাকে (ধর্ম)পথে আনার জন্য যোগী এইভাবে উপদেশ দিলেন :

'ধর্মসমূহ যা তথতাও তাই,
সেলাই করা বা না করা
তার মধ্যে তফাৎ নেই কোনো।
দেবতা ও মন্ত্রও তাই।
আর এই তিন বিকল্প মিলেই ধর্মধাতু।'

সেও এইভাবে ধ্যান করল, আর কাপড় সেলাই করার কল্পনা, দেবতা ও মন্ত্র এই তিন বস্তুর প্রকৃতি বিনষ্ট করল। উৎপন্ন ও সম্পন্ন এই দুই ক্রমকে উপলব্ধি করার ফলে বোধি উৎপন্ন হলো।

বারো বছরে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। অপরিমেয় প্রাণীহিত করে *খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *দুখণ্ডির বিবরণ সমাপ্ত॥

*অজোকো

*গুরু *অজোকোর কাহিনী।

*অজোকো অর্থে অলস (অকেজো ?)।

*সালিপুত্র (পাঠান্তরে পাটলিপুত্র) নামের দেশে এক গৃহস্থের এক ছেলে ছিল খুব মোটা। চার মার্গের চর্যা (শোয়া, বসা, দাঁড়ানো ও হাঁটা) কী করে আর সে করবে! তাই শুধু শোয়ার কাজই করত।

বাবা-মা আত্মীয়রা সবাই 'এই ছেলে দিয়ে কী হবে' বলে গালমন্দ করে তাকে শ্মশানে পাঠিয়ে দিলেন। সে শ্মশানেই শুয়ে থাকল।

সেখানে এক যোগী এলেন, ছেলেটিকে ঐ অবস্থায় দেখে তাঁর করুণা হলো। তাই নগর থেকে খাদ্য পানীয় এনে তাকে দিলেন।

কিন্তু খাবার খেতেও সে উঠল না, তাই দেখে যোগী বললেন, 'খাবার খেতেও যদি না উঠতে পারো, তবে সংসারের কাজ কী করে করবে ?'

সে বলল, 'আমি এসব করি না বলেই মা-বাবা আমাকে ত্যাগ করেছেন।'

যোগী বললেন, 'শুয়ে শুয়ে ধর্মসাধনা করতে পারবে ?'

'পারি, কিন্তু কে আমাকে ধর্ম দেবে ?'

যোগী বললেন, 'আমি দিতে পারি।' বলে তাকে হেবজ্রের উপদেশ ও গভীর সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন; ত্রিসহস্র লোক নাকের ডগায় সর্ষের মতো সমাগত, এই কল্পনা করে ধ্যান করতে বললেন।

'এতে কী লক্ষণ দেখা দেবে ?'—জিজ্ঞাসা করায় যোগী বললেন, 'ধ্যান করলেই বুঝতে পারবে।'

সেইভাবে ধ্যান করে ত্রিসহস্র লোককে সর্ষের মতো শূন্যতার মাধ্যমে জেনে মহামুদ্রার লক্ষণ হৃদয়ঙ্গম হলো। ন বছর সেই ধ্যান করে মহামুদ্রার সিদ্ধিপ্রাপ্ত হয়ে, অনেক প্রাণীহিত করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *অজোকোর বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কলপ

*গুরু *কলপ-এর কাহিনী।

জন্ম তাঁর *রাজপুরী দেশে; গুরু পরম্পরায় সুপরিশুদ্ধ এক যোগী ছিলেন তাঁর গুরু। পূর্বজন্মে ক্ষান্তি ধ্যানের ফলে তাঁর আকৃতি অত্যন্ত সুন্দর হয়েছিল।

*রাজপুরীর সব লোক তাঁকে দেখত ও পিছনে পিছনে ঘুরত। বিরক্ত হয়ে তিনি শ্মশানে গিয়ে থাকলেন।

সুপরিশুদ্ধ যোগী সেখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্মশানে বসে তুমি কী করছ?'

তিনি বললেন, 'লোকে আমায় টি'কতে দেয়নি বলে আমি এখানে এসেছি।'

'কিন্তু ধর্মে কি তোমার প্রয়োজন নেই?'

'ধর্ম তো প্রয়োজন; কিন্তু কে আমাকে তা দেবে?' যোগী তখন তাঁকে বললেন, 'ধর্মে তোমার প্রয়োজন থাকলে আমি দেবো।' বলে তাকে সম্বরের অভিষেক এবং উৎপন্ন ও সম্পন্ন ক্রমের ধ্যানে বসালেন।

উৎপন্ন ও সম্পন্ন দুই-ই আয়ত্ত করে সেই জ্ঞানের মাধ্যমে আত্ম-পর আলম্বন দূর করবার ক্ষমতা তাঁর জন্মাল। তাঁর খাপছাড়া, বাধাবন্ধহীন আচরণ বারবার দেখে *রাজপুরীর লোকরা সবাই বলতে লাগলো, 'এটা একটা পাগল!'

তিনি বললেন,

'আত্ম ও পর এই দ্বৈতভাব থেকেই
জন্ম হয় দুঃখের।
জানেন প্রাজ্ঞব্যক্তিরা
'অ' অক্ষরের মধ্যে
আকাশের রামধনুর মতো
বিলীন হয়ে যান বিকল্পের দেবসমূহ।
পাগল আমি; জন্ম, স্থিতি ও নিরোধ—এই তিনে
নেই আমার কোনো প্রয়োজন।
অদ্বয়ভাব থেকে জাত আমার এই চর্যা: সুখের।
উজ্জ্বল, নির্বাধ জ্ঞান: সুখের
ছয় অনিরোধ ভাবনা: সুখের
অনায়াসলভ্য ফলও তাই সুখের।'

এই উপদেশ দিয়ে তিনি শূন্যে সাতটি তাল গাছের মতো উঁচুতে উঠে গেলেন আর শূন্য থেকে অনেক ধরনের ঋদ্ধি দেখালেন।

তারপর থেকে তিনি *গুরু *কলপ নামে খ্যাত হলেন ও খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কলপ-র বিবরণ সমাপ্ত।

*ধোম্বিপা

*গুরু *ধোম্বিপার (ধোবীপা ?) কাহিনী ।

বংশে ধোপা । *সালিপুত্র নামক নগরে পিতাপুত্র দুজনে বরাবর ধোপার কাজ করে জীবিকা অর্জন করতেন ।

এক সুপরিশুদ্ধ যোগী তাঁদের কাছে এসে আহার চাইলেন । দুজনে তাঁকে পিণ্ড পরিবেশন করলেন । যোগীকে তাঁরা বললেন, 'জামা কাপড় ধোওয়ার দরকার আছে কি ? তাহলে আমরা ধুয়ে দেবো ।'

যোগী এক টুকরো কয়লা হাতে তুলে নিয়ে বললেন, 'এটা ধুয়ে ময়লা পরিষ্কার করতে পারবে ?'

ধোপার ছেলে বলল, 'কয়লার স্বভাবই কালো, ধুলেও তার রং সাদা হবে না ।'

'বাইরে ধুলেও ভিতরের তিন বিষের (কাম, ক্রোধ, মোহ) ময়লা যদি শুদ্ধ করতে না পারো, বাইরে ধোয়ায় শুদ্ধি হবে বলে আমি মনে করি না । তাই তোমাদের ধোওয়ার দরকার নেই । তবে একবার ধুলেই যথেষ্ট হবে, এমন উপদেশ আমার কাছে আছে, তা চাও কি ?'

'চাই' বলায়, তিনি তাকে সম্বরের অভিষেক, মুদ্রা ও সমাধি এই তিনের আশীর্বাদ দিয়ে উপদেশ দিলেন । সেই ধ্যানে বারো বছরে তাঁর দেহের মল শুদ্ধ হলো, মুদ্রা, মন্ত্র, বচন ও সমাধির দ্বারা চিত্তের মল শুদ্ধ হলো ।

'প্রজ্বলিত মুদ্রার জলে
ধৌত কর দেহের মল
আলি কালির জলে
ধুয়ে ফেল বচনের কলুষ
বীর মাতাপিতার যোগে
চিত্তমল হোক প্রক্ষালিত ।'

গুরুর এই উপদেশ অনুসারে কায়া দ্বারা মুদ্রা, বাক্য দ্বারা জপ আর চিত্ত দ্বারা উৎপন্ন ও সম্পন্ন ক্রম-এর অবিরত সাধনা করতে লাগলেন । ফলে কায়-বাক্-চিত্তের মল তাঁর শুদ্ধ হলো । তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন ।

পরে মলিন বস্ত্র আর ধুতে হতো না, নিজে থেকেই পরিষ্কার হয়ে যেত । এই দেখে সবাই বুঝতে পারল তিনি বিশেষ গুণ লাভ করেছেন ।

*ধোম্বিপা নামে তিনি সর্ব দিকে খ্যাত হলেন । অনেক প্রাণীহিত করে একশ বছর বয়সে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন ।

*গুরু *ধোম্বিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কঙ্কণ

*গুরু *কঙ্কণ-এর কাহিনী।

*বিষ্ণুনগর নামে দেশে এক রাজা ছিলেন। সুসমৃদ্ধ রাজ্যে তাঁর ঐহিক সুখের অভাব ছিল না। কামগুণের সকল সম্পদও তিনি ভোগ করতেন।

সেই সময়ে এক সুপরিশুদ্ধ যোগী তাঁর কাছে এসে ভিক্ষা চাইলেন। রাজাও তাঁকে প্রচুর পরিমাণে খাদ্য ও পানীয় দিয়ে সন্তুষ্ট করলেন। রাজাকে তিনি উপদেশ দিলেন :

‘রাজা, রাজ্যে কোন সার পদার্থ নেই। জন্মের পরে প্রাণীমাত্রই দুঃখ ভোগ করে। জন্ম জরা মৃত্যু—অরঘট্ট-এর মতো ঘুরছে। বিভিন্ন দুঃখের কোনও শেষ নেই। স্বর্গসুখও দুঃখেরই নামান্তর। রাজচক্রবর্তী হলেও নরকে যেতে হয়। কামগুণ শিশিরকণার মতোই ছলনা করে, তাতে আসক্ত না হয়ে ধর্মকাজ করো।’

রাজা বললেন, ‘কামগুণ ত্যাগ না করে যদি ধর্ম সাধনার উপায় থাকে, তাহলে করব। না হলে সেলাই-করা কাপড় পরে ও ভিক্ষা করে আমি জীবন কাটাতে পারব না।’

যোগী বললেন, ‘সেলাই-করা কাপড় পরা আর পিণ্ড ভোজন করা তো অতি উত্তম। তোমারও তাই অবলম্বন করা উচিত।’

রাজা বললেন, ‘সেলাই-করা কাপড় পরতে, কপালপাত্রে উচ্ছিষ্ট পচা খাবার খেতে ঘৃণা হয়। এ রকম করতে আমি পারব না।’

যোগী বললেন, ‘যে অহঙ্কার নিয়ে তুমি রাজত্ব করছ, পরিণামে তার জন্য অনেক দুর্গতি তোমার হবে। সেলাই-করা কাপড় পরে, নরকপাল-পাত্রে পচা-বাসি খাবার খেয়ে আমি অনাস্রব-ফল-সুখ লাভ করেছি। আমাদের দুজনের রাজ্যে পার্থক্য আছে। তবে কামগুণ ত্যাগ না করেও ধর্মসাধনার উপায় আছে।’

রাজা বললেন, ‘তাহলে আমি অবশ্যই ধর্ম গ্রহণ করব।’

যোগী রাজাকে উপদেশ দিলেন, ‘তোমার হাতের বহুমূল্য, উজ্জ্বল রত্নবলয়ের প্রতি আসক্তি ত্যাগ কর। রত্নবলয়ের উজ্জ্বল দ্যুতি ও অনাসক্ত চিত্ত—এই দুটিকে এক করে ধ্যান কর।’

‘বলয়ের ঔজ্জ্বল্য চারিদিকে বিকীর্ণ হয়,
তাই দেখে প্রফুল্লিত হয়ে ওঠে তোমার চিত্ত।
বাহ্য অনেক বস্তুর নানা বর্ণ দেখা যায়
কিন্তু পরিবর্তন হয় না তাদের স্বভাবের।

সেইভাবে পূর্বস্মৃতি অনেক মনে পড়ে যায়
তবু চিত্ত কিন্তু প্রোজ্জ্বল হয়ে ওঠে মহামূল্য
রত্নের মতো।'

এই উপদেশ অনুসারে রাজাও তাঁর ডান হাতের বলয়ে চিত্ত একাগ্র করে সাধনা করলেন। এইভাবে আসক্তিকে আলম্বন করে সাধনা করায় ছ'মাসের মধ্যেই সিদ্ধিলাভ করলেন।

একদিন রাজার অনুচররা দরজার ফাঁক দিয়ে দেখল অগণিত দেবকন্যা রাজার চারদিকে ঘিরে আছেন। এই দৃশ্য দেখে বিস্মিত হয়ে তারা উপদেশ প্রার্থনা করল।

রাজা বললেন,

'চিত্তকে মানলেই হওয়া যায় রাজা,
আর রাজ্য তার মহাসুখ ;
এই দুয়ের *যুগনদ্ধ রূপই ঐশ্বর্য পরম।
এই রকমই রাজা হওয়া উচিত
যদি হতে চাই রাজা।'

অনুচরদের এই উপদেশ দিলেন। নিজের অনুচরবর্গ ও *বিষ্ণুনগরের মানুষদের মধ্যে পাঁচশ বছর কাটালেন, তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*কঙ্কণ (হাতে) ছিল বলে নাম হলো *কঙ্কণ। সেই নামেই বিখ্যাত হলেন।

*গুরু *কঙ্কণপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কম্বলপা

*গুরু *কম্বলপার কাহিনী।

দেশের নাম *কংকরম (মতান্তরে কংগর বা কাংড়া)। সেখানে এক রাজা চুরাশি লক্ষ নগর শাসন করতেন। তাঁর দুই পুত্র ছিল। রাজার মৃত্যুর পর প্রজারা তাঁর সুশীল জ্যেষ্ঠ পুত্রটিকেই অভিষিক্ত করলেন রাজপদে। তাঁর পুণ্যে সমৃদ্ধ হলো প্রজাকুল। স্বর্ণ ইত্যাদি পাত্রে ভোজন করার মতো ঐশ্বর্য হলো তাদের।

রাজ্য গ্রহণ করার পর ছ'মাস কেটে গেল, রাজপুত্র তখনও তাঁর মাকে দেখতে

পেলেন না। তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'আমার মা কোথায় গেছেন? এখানে তিনি আসছেন না কেন?' শুনলেন, স্বামীর মৃত্যুর শোকেই তিনি আসছেন না।

এক বছর কেটে গেল। একদিন তাঁর মা সেখানে এসে চোখের জল ফেলতে লাগলেন। রাজপুত্র বললেন, 'মা, এখনও তুমি কাঁদছো কেন?'

মা বললেন, 'রত্নখচিত আসনে বসে তুমি রাজত্ব করছ, এতে আমি খুশি হইনি, তাই কাঁদছি।'

রাজপুত্র বললেন, 'মা যদি এতে দুঃখিত হন, তাহলে আমি ছোট ভাইকে রাজাসনে বসিয়ে প্রব্রজ্যা গ্রহণ করতে পারি।'

মা বললেন, 'তোমার তাই করা উচিত।'

তখন তিনি ছোট (ভাইকে) রাজ্যভার দিয়ে প্রব্রজ্যা নিলেন আর তিনশ ভিক্ষু সঙ্গে নিয়ে এক বিহারে বাস করতে লাগলেন।

সেখানে এসে মা আবার চোখের জল ফেলতে লাগলেন। প্রণাম করে তাঁকে রাজপুত্র জিজ্ঞাসা করলেন, 'মা, কেন কাঁদছ?'

'তুমি প্রব্রজিত হয়েছ তবুও রাজার আচরণ অনুযায়ী অনুচর ও কোলাহলের মধ্যে আছ, এতে আমি সুখী নই।'

রাজপুত্র বললেন, 'তাহলে কি করব?'

মা বললেন, 'কোলাহল ত্যাগ করে অরণ্যে বাস করো।'

তিনিও সেইমতো বিহারের গোলমাল ছেড়ে বনে গিয়ে গাছের নীচে বসে রইলেন। তাঁর নিজ পুণ্যের ফলে পানাহারের জন্য প্রচুর ভিক্ষাও পেলেন।

তারপরেও মা তাঁর কাছে এসে কাঁদতে লাগলেন। মাকে প্রণাম করে ছেলে জানতে চাইলেন, 'মা, কেন কাঁদছ?'

মা বললেন, 'প্রব্রজিত হয়েও জীবিকা নির্বাহের অসার উপকরণের জন্য কেন তুমি নিজেকে নিয়োগ করেছ?'

তখন তিনি চীবর, পিণ্ডপাত্র ইত্যাদি সব ত্যাগ করে যোগীর বেশে অন্য রাজ্যে চলে গেলেন।

তাঁর মা ছিলেন ডাকিনী। তিনি ছেলেকে তাঁর যাত্রাপথে সম্বরের অভিষেক দিয়ে ধর্মদেশন করলেন। পুত্র শ্মশানের ভস্মরাশির মধ্যে শুয়ে থেকে বারো বছর সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন, মহামুদ্রার সিদ্ধি পেয়ে শূন্যে চলে গেলেন।

ডাকিনী মা অনেকের (ডাকিনীদের?) সঙ্গে শূন্যে এসে ছেলেকে বললেন, 'প্রাণীদের হিতকাজ না করে শূন্যে যাওয়া, এটা আর এমন কি আশ্চর্য কাজ। এ

তো পাখির মতো কাজ হলো। তুমি এখন প্রাণীহিত কর।'—তিনি এই উপদেশ দিলেন।

পশ্চিমে *ওরজন-এর *মালপুর নামক নগরে আড়াই লক্ষ লোক বাস করত। পুত্র সেখানে গেলেন। তারপর সেখানে *করবীর নামক অংশে *পনব অরণ্যে *তাল-অগ্র নামে এক গুহায় থেকে সাধনা করলেন।

ডাইনীরা [তিব্বতী ভাষায় "খাডোমা" অর্থাৎ ডাকিনী সম্মানার্থে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু "ঠামেনমা" নিন্দার্থক—তাই এখানে ডাইনী শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে] বুঝতে পেরে পরস্পরকে খবর দিল। তাদের প্রধানার নাম ছিল *পদ্মদেবী। (আচার্যকে) বাধা দেবার জন্য সে দলবল সঙ্গে নিয়ে এল।

একটি কালো কম্বল পরে আচার্য নগরে পিণ্ডের জন্য গেলেন। সেখানে ডাইনীদের একদল মেয়ের সঙ্গে আচার্যের দেখা হল। তারা বলল, 'আপনাকে আমরা ভোজন দেব, আমাদের বাড়িতে আসুন।'

আচার্য বললেন, 'আমি ঘরে গিয়ে ভোজন করি না, পিণ্ড নিতে পারি।' এই বলে *পদ্মদেবী প্রভৃতির কাছে কম্বলটি গচ্ছিত রেখে চলে গেলেন।

'এর মধ্যে নিশ্চয়ই কোন দ্রব্যগুণ (যাদু) আছে, কম্বলটি তাই খেয়ে ফেলা দরকার।'—এই পরামর্শ করে ডাইনিরা সেটি খেয়ে নিল, আর যেটুকু বাকি ছিল তা আগুনে পুড়িয়ে দিল।

আচার্য ফিরে এসে ডাইনীদের বললেন, 'আমার কম্বল দাও।'

ডাইনীরা অন্য কম্বল দিল।

'নিজের কম্বলটিই আমার চাই'—বললেন তিনি। ডাইনীরা তাকে সোনা ইত্যাদি দিয়ে প্রলুব্ধ করতে চাইলেও তিনি তার কিছুই নিলেন না (মতান্তরে সোনার তৈরি কম্বল)।

আচার্য রাজার কাছে গিয়ে বললেন, 'তুমি রাজা হয়েছ, কিন্তু চোর-ডাকাতদের হাত থেকে মানুষজনকে রক্ষা করছ না কেন?'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'চোর-ডাকাতরা কার কী লুঠ করেছে?'

আচার্য বললেন, 'তোমার (রাজ্যের) ডাইনীরা আমার কম্বল নিয়ে গেছে।'

রাজা ডাইনীদের সবাইকে ধরে এনে যোগীর কম্বল ফিরিয়ে দিতে বললেন। তারা বলল, 'কম্বল আমাদের কাছে নেই, তাই দিতে পারব না।'

তারপর আচার্য *তালচ্চে (তাঅগ্র ?) গুহায় গিয়ে সাধনা করতে লাগলেন।

আচার্য তখন (ডাইনীদের উদ্দেশ্যে) 'দশমহাক্রোধ'-এর বলি দিলেন।

ডাইনীরা তখন সবাই মিলে গুহার জল শুকিয়ে দিল। পৃথিবীদেবীকে আচার্য আদেশ করলেন জল উঠিয়ে দিতে, সেই আদেশে আবার জল এল।

তারপর ডাইনীরা জড়ো হয়ে সুমেরুসহ চার পর্বতের সব জায়গার ডাইনীদের ডেকে পাঠাল, তারাও সবাই এল। আচার্য তাদের সবাইকে ভেড়া করে রেখে দিলেন।

ডাইনীদের রানী ইত্যাদি সবাই ভেড়া হয়ে গেল, এমনি এক অবাক কাণ্ড হলো। আচার্যকে অনেক অনুনয় করায় তিনি সব ভেড়ার মাথার লোম কেটে নিয়ে তাদের ছেড়ে দিলেন। মাথা মুড়ানো, চুল নেই দেখে তারা কান্নাকাটি শুরু করল।

আচার্য সেখানে (গুহায়) বসে রইলেন। কামলোকের দেবতারা গুহার মধ্যে পাথর ফেলে (ধ্বস নামিয়ে) আচার্যকে মারবার চেষ্টা করল। আচার্য উপরের দিকে তাঁর তর্জনী (নিষেধের ভঙ্গিতে) তুললেন। আলগা পাথরটা এখনও সেইরকম শূন্যে ঝুলে আছে।

এতগুলি ডাইনী সবাই মিলে একজন মানুষকে কিছু করতে পারছে না দেখে রাজা বললেন, ‘তোমরা এঁর কাছে ক্ষমা চাও আর (এঁর শাসন মেনে নেবে এই) প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও।’ ডাইনীরা শুনল না।

গুরু ডাইনীদের একসঙ্গে বেঁধে বললেন, ‘আমার শাসন মেনে নেবে বলে প্রতিজ্ঞা কর, নাহলে তোমাদের যমরাজের কাছে সঁপে দেব আর ঘোড়া করে রেখে দেব।’

ডাইনীরা সবাই আচার্যের ক্ষমতা দেখে ভয় পেয়ে গেল আর তাঁর শরণ নিয়ে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হলো।

তারপরে ডাইনীরা তাদের ভুক্ত আহার্য থেকে কম্বলটি উদ্গীরণ করে দিল। আচার্য কম্বলের টুকরোগুলি সব একত্র করে জুড়লেন। কম্বলটি আগের চেয়ে পরিসরে ছোট হলো, সেটি হাতে নিয়ে চলে গেলেন।

*কম্বল বা লাবপা নামে ইনি প্রসিদ্ধ হলেন, তারপর বহু বছর প্রাণীহিত করে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কম্বলপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*দিংকপা

*গুরু *দিংকপার (ঢেঁকিপা) কাহিনী।

কুলে ব্রাহ্মণ তিনি। *সালিপুত্রের রাজা, নাম *ইন্দ্রপাল, তাঁর মন্ত্রী ছিলেন তিনি।

সংসারে বৈরাগ্য হলো সেই রাজার। *লুইপা যে শ্মশানে থাকতেন মন্ত্রীসহ সেখানে গিয়ে তিনি দরজায় ধাক্কা দিলেন।

'কে ?'—আচার্য (লুইপা) বললেন।

'আমি রাজা ও আমার মন্ত্রী'—উত্তর দিলেন (রাজা ইন্দ্রপাল)।

'তাহলে ভিতরে এসো।'—আচার্য বললেন।

তাঁদের দুজনকে আচার্য চক্রসম্বর মণ্ডলের অভিষেক দিলেন। তাঁরা দুজনে অভিষেকের দক্ষিণা বলে নিজেদের দেহ নিবেদন করলেন। তারপর তিনজনে তাঁরা *ঔদেশ নামে এক অন্যদেশে চলে গেলেন। সেখানে আচার্যরা তিনজন মিলে ভিক্ষা সংগ্রহ করে বাস করতে লাগলেন।

তারপর রাজাকে বিক্রি করা ইত্যাদির কাহিনী *দারিকপার বৃত্তান্তে আছে।

আচার্য *লুইপা ও ব্রাহ্মণ মন্ত্রী দুজনে *জইনন্তপুর-এর বৌদ্ধ রাজার কাছে সাতদিনে পৌঁছুলেন। সেখানে এক শুঁড়িনীর দরজায় গিয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের প্রধানা কি মানুষ কিনবে ?'

অন্দর থেকে সে বলল, 'কিনব, কিন্তু কী দাম চাও ?'

আচার্য (লুইপা) বললেন, 'তিনশো তোলা সোনা চাই।' তারাও তাই দিল। 'একে দুয়ারের পাশে শুতে দিও আর তোমার দাম উঠে এলে একে বাইরে আসতে দিও।' এই বলে আচার্য (লুইপা) চলে গেলেন।

তারপর সেই আচার্য (দিংকপা) ব্রাহ্মণ খুব ভাল করে মদ বিক্রির কাজ করলেন, খুশি হয়ে সবাই তাঁকে প্রভু বলে ডাকতে লাগল।

এক সময়ে সারাদিন ধরে কাজ করে সন্ধ্যায় তিনি আর খাবারের জন্য অপেক্ষা করলেন না, বাগানে শুতে চলে গেলেন। শুঁড়িনী তাঁকে খেতে দিল না। পরে রাতে মনে পড়ায় খাবার পাঠাল। খাবার নিয়ে এলে দেখা গেল, পনেরো জন (দেব ?) কন্যা সেই ব্রাহ্মণপুত্রের পরিচর্যা করছেন আর তাঁর শরীর থেকে আলোক বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তিনি সেইভাবে বসে আছেন। এ কথা শুনে শুঁড়িনীর খুব অনুতাপ হলো।

'মন্ত্রী, বারো বছর ধরে তোমাকে আমরা চাকরের কাজ করিয়েছি, তাতে আমাদের পাপ হয়েছে। এখন বারো বছর তোমাকে আমরা সেবা করব, তুমি আমাদের পূজা নাও।'—শুঁড়িনীর এই অনুনয়ে তিনি রাজি হলেন না।

শুঁড়িনীদের সঙ্গে *জইন্তপুরের সব মানুষকে তিনি ধর্মদেশন করলেন। তারপর সাতশ অনুচর নিয়ে তিনি খসর্পণে গেলেন। নিজের হাতে ধান কুটতেন বলে তিনি *দিংকপা (ঢেঁকিপা ?) নামে খ্যাত হলেন, দোহা রচনা করে তিনি উপদেশ দিলেন :

বেদজ্ঞ দিংকপা, ধান কোটার ধ্যান করেন যিনি—
ছড়িয়ে পড়া ধানগুলিকে ঝাঁটা দিয়ে জড়ো করে
ধান কোটেন তিনি সযত্নে।
ধানের কালো তুষ (খোসা) গুরুর উপদেশ দিয়ে
পরিষ্কার করেন তিনি ;
প্রথমে পুণ্য দিয়ে পাপ কোটেন
বজ্রজ্ঞানের মুগুর দিয়ে,
তারপর পরিশ্রুত করেন তাকে
স্বভাব শূন্যতার এই পাত্রে (ঢেঁকি ?)।
গ্রহণ ও বর্জনকে অভিন্ন করে পেষণ কর
হুঁং এই ধ্বনি দিয়ে মন্থন কর বিকল্পের দধি—
তাতে জাত হবে মহাসুখের নবনী,
ভোগ কর তার অদ্বিতীয়, অনন্ত স্বাদ।

শুঁড়িনীর কাছে তাঁকে বিক্রি করা দরকার ছিল। কারণ, তিনি যে ব্রাহ্মণ এই গর্ব তাঁর ছিল, তাঁর সেই কুলের অহংকার শুঁড়িনী তাঁকে কিনে নিয়ে চূর্ণ করেছিল। —এই বলা হয়।

*গুরু *দিংকপার (ঢেঁকিপা) বিবরণ সমাপ্ত ॥

*ভন্ধেপা

*গুরু *ভন্ধেপার কাহিনী।

গুরু *ভন্ধে—অর্থাৎ যিনি ধন ধারণ করেন এমন দেবতা (কুবের ?)। তাঁর দেশ

ছিল শ্রাবস্তী, কুলে পটুয়া ; দেবতাদের ছবি আঁকতেন। তাঁর গুরু ছিলেন আচার্য কৃষ্ণাচার্য।

*ভন্ধেপা যখন আকাশে অবস্থান করছিলেন তখন এক সময় ধর্মবাস পিণ্ডপাত্র ও দণ্ডসহ এক জ্যোতির্ময় আর্য অর্হৎকে শূন্যে যেতে দেখলেন।

বিস্মিত হয়ে *বিশ্বকর্মাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন, 'ঈশ্বরপুত্র, এই আশ্চর্য শূন্য পর্যটনকারী কে ?'

'ইনি ভবক্লেশ পরিত্যাগ করেছেন, এমন একজন আর্য অর্হৎ।'—*বিশ্বকর্মা বললেন।

*ভন্ধেপাও এই রকম (সিদ্ধি) পেতে চাইলেন। তাই আবার জম্বুদ্বীপে ফিরে এলেন। আচার্য কৃষ্ণাচার্যের কাছে ধর্ম প্রার্থনা করায় আচার্য তাঁকে গুহ্য সমাজের অভিষেক দিলেন।

তাঁকে যোগরক্ষার চারটি অপরিমেয় উপদেশ দিলেন। করুণাদৃষ্টি, মুদিতা ভাবনা, মৈত্রী চর্যা, ফলের প্রতি আকর্ষণ নেই এমন ধ্যানের দ্বারা বিভ্রান্তির সকল মল শুদ্ধ করে (ভন্ধেপা) মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। সর্বদিকে যোগী *ভন্ধেপা নামে খ্যাত হলেন।

*বিশ্বকর্মা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করবে ?' তাঁর মুখ থেকে উচ্চারিত হলো :

'নিরালম্ব দর্শন, নিরন্তর ধ্যান,
মাতাপিতা সদৃশ চর্যা, আকাশের সমান ফল
এই চার।
এদের অভিন্নভাবে দেখে
এই অপরিমেয় চারটিতে
শ্রদ্ধা না থাকলে
কীভাবে হবে অভিজ্ঞান ?
অহো, এমন আশ্চর্য মহান গুরুকে
সর্বভাবে আশ্রয় করেন বিজ্ঞজন।'

এই উপদেশ দিয়ে শ্রাবস্তী প্রভৃতি মহানগরে চারশ বছর ধরে অচিন্তনীয় প্রাণী-হিত করলেন।

চারশ অনুচর নিয়ে তারপর তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ভন্ধেপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*তন্তেপা

*গুরু তন্তেপার কাহিনী।

*তন্তেপা বা অক্ষপা অর্থাৎ জুয়া খেলে যে।

*কৌশাম্বী দেশে শূদ্রকুলে জন্ম। সর্বদা পাশা খেলে তিনি ধনসম্পত্তি সব নষ্ট করলেন। তবুও খেলতে লাগলেন, তারপর যখন বাজির টাকা আর দিতে পারলেন না, তখন সবাই তাঁকে ধরে মারতে লাগল।

মনের দুঃখে তিনি এক শ্মশানে গিয়ে বসে রইলেন। সেখানে এক যোগী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন,

‘এখানে তুমি কী করছ?’

‘পাশা খেলতে ভালবাসি বলে আমি সর্বস্ব হারিয়েছি। তাই দেহমনের দুঃখে জর্জরিত হয়ে এখানে বসে আছি।’

যোগী বললেন, ‘তুমি ধর্মের কাজ করবে কি?’

‘পাশা খেলা ছাড়তে পারব না। তা যদি না ছাড়তে হয়, তাহলে ধর্মে প্রবৃত্ত হতে পারি।’

যোগী বললেন, ‘সে উপায় আছে।’ বলে তাকে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন :

‘ধনক্ষয় করেছ যেমন পাশার খেলায়
তেমনি জ্ঞানের পাশা দিয়ে ক্ষয় কর ত্রিধাতুর বিকল্প।
যেমন তুমি মার খেয়েছ তেমনি
বিকল্পকে পিষ্ট কর ধর্মকায় দিয়ে।
তোমার নির্জন শ্মশানে শয়নের মতো—
শয়ন কর মহাসুখের গভীর ব্যাপ্তিতে।

‘এই উপদেশ মতো ধ্যান করলে ত্রিলোকের কল্পনা ধর্মতায় বিলীন হয়ে যাবে। এইভাবে কল্পনার জ্ঞানও নিঃস্বভাব হয়ে যাবে।’

মহামুদ্রার পরমসিদ্ধি লাভ করে *তন্তেপা দোহায় বললেন,

‘দুঃখ যদি না পেতাম প্রথমে
কীভাবে প্রবেশ করতাম মোক্ষের পথে?
শ্রদ্ধাভরে গুরুর আশ্রয় না নিলে
কী করেই বা লাভ করতাম পরম সিদ্ধি?’

—এই বলে তিনি শূন্যে উত্থিত হয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *তন্ত্রেপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কুক্কুরিপা

*গুরু *কুক্কুরিপার কাহিনী।

*কপিলসক্রু (পাঠান্তরে কপিলাবস্তু) দেশের এক ব্রাহ্মণ, তাঁর মন্ত্রে শ্রদ্ধা জন্মাল।

যোগীর আচার সম্পন্ন করে যখন ভিক্ষায় যাচ্ছিলেন, তখন একদিন *লুম্বিনী নগরের পথের ধারে একটি বাচ্চা কুকুরী দেখলেন। ক্ষুধার্ত সেই কুকুরীটির প্রতি তাঁর করুণা জাগল। তিনি তাকে বহন করে নগরের দিকে চললেন। যাবার পথে চারিদিকে তাকিয়ে একটি পাথরের গুহা দেখলেন। ফাঁকা সেই গুহাটিতে কুকুরীকে রেখে তিনি পিণ্ড সংগ্রহ করলেন। বারো বছর সেই গুহায় থেকে সাধনা করে তিনি লৌকিক সিদ্ধি, অভিজ্ঞান ইত্যাদি লাভ করলেন। তারপর ত্রয়ত্রিংশ দেবতাদের আমন্ত্রণে স্বর্গে চলে গেলেন। কুকুরী কিন্তু সেই গুহাতেই থেকে গেল।

কাছে কোনও লোক না থাকায় সে (কুকুরছানাটি) মাটি খুঁড়ে জল ও খাবার পেল, তাই খেয়ে সে সেখানে অপেক্ষা করতে লাগল।

সেই যোগীকে দেবতারা সাড়ম্বরে পূজা করলেন। যোগীর তখন সেই কুকুরীর কথা মনে পড়ে গেল আর তিনি ফিরে আসতে উদ্যত হলেন।

দেবতারা তখন বললেন, 'এমন শ্রেষ্ঠ গুণ লাভ করেও তুমি কুকুরের মতো জিনিষের চিন্তা ছাড়তে পারছ না, এ ঠিক নয়। তুমি এখানেই থাকো।' বারবার এই অনুরোধ করে তাঁরা তাঁকে যেতে নিষেধ করলেন।

নিষেধ না শুনে তিনি সেই গুহায় ফিরে এলেন আর কুকুরীটির মাথা চাপড়ে আদর করলেন।

তখনই সে ডাকিনী হয়ে গেল, তার মুখ থেকে উচ্চারিত হলো এই বাণী :

'সাধু, সাধু, কুলপুত্র তুমি ! মানলে না কোনও বাধা,
এসেছ তাই লাভ করতে পরমসিদ্ধি।
মিথ্যা ছিল তোমার পূর্বের সিদ্ধি

শুদ্ধ হয়েছে সেই ভ্রান্ত দৃষ্টি তোমার।
আশ্চর্যের কিছু নেই এ পরিবর্তনে।
অক্ষয় মহাসুখ ধর্মতার
পরম সিদ্ধি দেব তোমায় আমি।'

এই বলে তিনি প্রজ্ঞা ও উপায়কে যুগনদ্ধরূপের মুদ্রা করে উপদেশ দিলেন। অপরিবর্তনীয় বিশুদ্ধ দৃষ্টি পেয়ে তিনি (কুক্কুরিপা) পরমসিদ্ধি প্রাপ্ত হলেন। তখন থেকে *লুম্বিনী ইত্যাদি সর্বত্র *গুরু *কুক্কুরিপা নামে খ্যাত হলেন।

অনেক প্রাণীহিত করে *কপিলাসক্রু (কপিলাবাস্তু ?) নগরের মানুষদের সঙ্গে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কুক্কুরিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*কুচিপা

*গুরু *কুচিপার (কুব্জীপা ?) কাহিনী।

নাম *কুচিপা, তাঁর পিছনে কুঁজ ছিল বলে। তাঁর জন্মস্থান *কহরি, জাতিতে তিনি শূদ্র, কৃষিকাজই ছিল তাঁর জীবিকার উপায়।

কোনও এক সময়ে পূর্ব কর্মের ফলে তাঁর পিঠে একটা কুঁজ গজালো আর সেটা দিন দিন বড় হতে লাগল। লোক জানাজানি হবার ভয়ে মনের দুঃখে এক অরণ্যে গিয়ে তিনি রইলেন।

আর্য নাগার্জুন একদিন সেখানে এলেন। তাঁকে দেখে *কুচিপার খুব শ্রদ্ধা হলো। করজোড়ে প্রণাম করে তিনি বললেন,

'হে আর্য! কোথা থেকে আপনার আগমন হলো? আমি মন্দ কর্মের ফল ভোগ করছি, অসহ্য এই কষ্ট। দয়া করে আমাকে মুক্তির উপায় বলুন।' এই প্রার্থনা জানালেন।

আর্য বললেন, 'এর থেকে মুক্তির উপায় আছে; ধৈর্য ও দৃঢ়তার সঙ্গে তুমি কি তা সাধন করতে পারবে? যদি পারো, তাহলে সকল দুঃখের মূল উৎপাটন করে সুখে জীবনধারণ করার উপায় আছে।'

শুনে তিনি বললেন, 'কেন আমি উত্তমের সঙ্গে সাধনা করতে পারব না? নিশ্চয়ই আমি পারব।'

আচার্য তখন তাঁকে গুহ্য সমাজের অভিষেক দিলেন আর দুঃখের পথ থেকে সরিয়ে আনার জন্য সম্পন্ন ক্রম ও উৎপন্ন ক্রম উপদেশও এইভাবে দিলেন। তিনি বললেন, '(উৎপন্ন ক্রম অনুসারে) তোমার পিঠের কুঁজ ক্রমেই বড় হচ্ছে এই ধ্যান কর।'

তিনিও তাই করলেন। তার ফলে কুঁজ আরও বড় হলো, কষ্টও আগের চেয়েও বেড়ে গেল।

আচার্য একদিন সেখানে এসে তাঁর কুশল জিজ্ঞাসা করলেন। উত্তরে তিনি বললেন, 'আমার কষ্ট খুবই বেড়ে গেছে।'

আচার্য তাঁকে তখন সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন, 'সমস্ত ধর্ম তোমার ঐ কুঁজে স্থিত হয়েছে—এই ধ্যান কর।' তিনিও সেইভাবে করলেন, ফলে তাঁর কুঁজও মিলিয়ে গেল।

আচার্য আবার এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখন ভালো আছ তো?'

তিনি বললেন, 'হ্যাঁ, এখন খুব ভালো আছি।'

আচার্য তখন উপদেশ দিলেন,

'সৎ ও অসৎ থেকে জাত হয় সুখদুঃখ,
এই অন্ত-দ্বয়-এর বিভেদ দৃষ্টি থেকে মুক্ত হলেই
দুঃখ-সুখের বোধ যাবে লুপ্ত হয়ে।
স্ব-স্ব স্বভাবে শূন্য সর্বধর্ম।'

তখন কুচিপার সম্যকবোধ জাগ্রত হলো। তিনি নিরালম্বন মহামুদ্রা সিদ্ধিলাভ করলেন।

*কহরি জনপদে তিনি সাতশ বছর প্রাণীহিত করলেন; *গুরু *কুচিপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন।

শেষে সাতশ অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন তিনি।

*গুরু *কুচিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*ধমপা

*গুরু *ধমপার কাহিনী।

এঁর নাম ছিল *গুরু *ধমপা, অর্থাৎ শ্রুতিপ্রজ্ঞ। *বিক্রমম্বর (পুর ?) দেশে এক ব্রাহ্মণ সর্বদা মন দিয়ে ধর্মকথা শুনতেন; কিন্তু চিন্তা বা ধ্যানের প্রজ্ঞা তাঁর ছিল না।

সেখানে এক সময় এক যোগী এলেন। তিনি তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অনেক শুনেছ, বুঝতে পেরেছ কি ?'

তিনি বললেন, 'যোগী, ধর্মকথা আমি অনেক শুনেছি, কিন্তু শোনামাত্র ভুলে যাই। ভুলে যাতে না যাই, এমন এক উপদেশ দিন।'—এই প্রার্থনা জানালেন।

যোগী বললেন, 'তাই হবে।' এই বলে তিনি আয়ত্ত করতে পারেন এমন অভিষেক ও উপদেশ দিলেন।

'মহারত্নের অনেক রত্নকণা চূর্ণ করে
যেমন একত্রে মেশায় কারিগর
তেমনি সমন্বিত করে অনেক শ্রুতিকে
নিবিষ্ট কর তোমার নিজ চিত্ত ধাতুতে।'

এই উপদেশের সম্যক অর্থ বোঝার ফলে তাঁর সমস্ত শ্রুত ধর্ম ও চিত্তের মধ্যে সমরসতা জাগ্রত হলো।

সেই বোধি জাগ্রত হওয়াতে মহামুদ্রার পরম সিদ্ধিলাভ করলেন।

*ধমপা নামে তিনি খ্যাত হলেন। বহু ভক্তকে মার্গে প্রবেশ করিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ধমপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*মহিপা

*গুরু *মহিপার কাহিনী।

*মহিপা (পাঠান্তরে মহিলপা) অর্থে অহংকারী।

দেশ তাঁর *মগধ, জন্ম শূদ্রকুলে, প্রচণ্ড দৈহিক শক্তি ছিল তাঁর। 'আমার সঙ্গে

পারবে ধারে কাছে এমন কোনও লোক নেই, আমি পারি না এমন কাজ নেই' —এই বলে সব সময় তিনি আস্ফালন করতেন।

এমন সময়ে এক যোগী সেখানে এলেন, *মহিপাকে তিনি জিজ্ঞাসা করলেন 'তুমি কী ভাবছ?' (মহিপা) বললেন, আমি কিছু ভাবছি না।'

'আমি করতে পারি না এমন কিছু নেই—এই ভাবছ না কি?'

যোগীর এই কথা শুনে *মহিপার ভক্তি হলো। *'নমো' বলে তিনি তাঁকে প্রণাম জানালেন।

'অহংকারের মল শুদ্ধ কর।' যোগী তাঁকে বললেন।

'আমাকে এক ধর্মদান করুন।' বলায় যোগী বললেন, 'বেশ তাই হবে।'

তাঁকে তিনি 'প্রভাব-সংক্রমণ' উপদেশ দিলেন :

'প্রোজ্জ্বল চিত্তকে তোমার জান
শূন্য, অবিরোধ, অনুৎপাদ যে চিত্ত
তার অবিচল ধ্যানে
জাগবে অববোধ
লীন হবে ধর্মতায়।'

বুঝতে পারলেন না বলে তিনি আবার জানতে চাইলেন।

যোগী বললেন, 'শক্তিমান তুমি, তোমার অসাধ্য কোনও কাজ নেই। জ্যোতি, বায়ু ও প্রজ্ঞা, এই তিনকে আকাশের ব্যাপ্তিতে তুমি ধারণ কর।'—এই ভাবে তাঁকে ভ্রান্তপথ থেকে ফিরে আসবার উপদেশ দিলেন।

'যতই কঠিন হোক, এ আমি করব'—এই ভেবে তিনিও উপদেশ গ্রহণ করলেন। এইভাবে গ্রাহ্য বিষয় তাঁর হারিয়ে গেল, গ্রাহকের প্রজ্ঞাও লুপ্ত হলো। আকাশের ব্যাপ্তির মতো শূন্যতাসিদ্ধি তিনি লাভ করলেন।

*মহিপা *মগধ ইত্যাদি দেশে তিনশ বছর ধরে অগণ্য ভক্তকে অপরিমেয় নিঃস্বভাব ধর্মতার বলিষ্ঠ উপদেশ দান করলেন। শেষে আড়াইশ অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে চলে গেলেন।

*গুরু *মহিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*অচিন্ত

*গুরু *অচিন্তর কাহিনী।

*অচিন্ত অর্থাৎ যার কিছু মনে থাকত না।

তার দেশ *ধনিরূপ, কুলে কাঠুরে; খুব গরীব। তাই সব সময় ধনসম্পত্তির লালসায় সংসারের অন্য সব চিন্তা ভুলে শুধু টাকা-পয়সার কথাই ভাবতেন। নির্জনে গিয়ে সেই চিন্তাই করতে লাগলেন।

যোগী *কম্বল তাঁর কাছে এলেন, জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি নির্জনে নিঃশব্দে নিঃসাড়ে কেন বসে আছ, কী চিন্তা করছ?'

তিনি বললেন, 'যোগী, সংসারে ধনসম্পত্তির চিন্তা ছাড়া আর কিছু ভাবতে পারি না, টাকার চিন্তা করছি বটে কিন্তু উপায় কী করব জানি না, তাই বসে বসে ভাবছি।'

যোগী বললেন, 'বিষয়-সম্পত্তি অর্জন করবার মন্ত্র আমি জানি, কিন্তু তুমি সাধনা করতে পারবে কি?'

'সাধনা করতে না পারলে তো আর উপায় নেই, তাই সে মন্ত্র আমাকে দিন।'

যোগী তাঁকে সম্বর অভিষেক ও অগম্ভীর সম্পন্ন-ক্রমের উপদেশ দিলেন :

'কামনায় কীই বা পাবে তুমি?
বন্ধ্যাপুত্রের মতো কামনা (অলীক)
তাই ত্যাগ কর বাসনা-কামনা,
নিজের দেহকে ভাবো আকাশের স্বভাবের মতো,
নিজের চিত্তকে আলোকিত কর তারার আলোয়
—সেই ধ্যানই কর।
তবেই সাক্ষাৎ দর্শন দেবেন বসুদেব আর
পূর্ণ হবে তোমার সকল কামনা।'

তিনিও উপদেশ অনুযায়ী ধ্যান করতে লাগলেন। তখন তাঁর ধনের কল্পনা তারার স্বভাবের মধ্যে হারিয়ে গেল আর সেই তারাও আকাশের শূন্যতায় বিলীন হয়ে গেল।

আবার এক দিন গুরু তাঁর কাছে এলেন। (গুরুর) প্রশ্নের উত্তরে তিনি বললেন, 'এখনও কোনও কিছু দেখতে পাচ্ছি না।'

গুরু উপদেশ দিলেন :

'আকাশের যেমন স্বভাব
বিষয়ের রূপকে কি নিয়েছো
তেমনি করে ?
সকল রং ও রূপ বিমুক্ত করে
ধ্যান কর কামনার
আকাশের মহাব্যাপ্তিতে ।'

এর অর্থ বুঝতে পারায় তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। *গুরু *অচিন্ত নামে খ্যাত হলেন।

সর্ববস্তুর স্বভাবধর্ম সম্পর্কে উপদেশ দিয়ে তিনি তিনশ বছর প্রাণীহিত করলেন ; তারপর অসংখ্য অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *অচিন্তর বিবরণ সমাপ্ত ॥

*বভহি

*গুরু *বভহির কাহিনী।

*বভহির অর্থ : যিনি জল থেকে দুধ আকর্ষণ করে নিতে পারেন এমন।

*ধংজুর দেশে রাজকুলের মানুষ। রাজার পার্থিব সম্পদ ভোগে মত্ত হয়েছিলেন। তাঁর কাছে এক সুপরিশুদ্ধ যোগী এসে আহার ভিক্ষা চাইলেন। তাঁকে প্রচুর আহার্য বস্তু দেওয়া হলো।

রাজা শ্রদ্ধাভারে তাঁর কাছে ধর্ম প্রার্থনা করলেন। তিনি বললেন,

'শ্রদ্ধাই সর্ব ধর্মের মূলে,
আর সর্বসিদ্ধির মূল হচ্ছেন গুরু।'

এই বলে তাঁকে প্রভাব-সংক্রমণের অভিষেক ও মূল ধমনী, বায়ু ও বিন্দুর এই উপদেশ দিলেন :

উপায়যুক্ত বিশিষ্ট পরকায়ে
*ভগরূপ মণ্ডলে,
*রক্ত মহাসমুদ্রে
বোধিচিত্তের দুগ্ধ মিশিয়ে নাও।

স্থানে এনে তার অভ্যন্তরে
কর আকর্ষণ—
পাবে অনন্ত অবাধ সুখ
সুখ থেকে সুখে
তখন ঘটবে উত্তরণ।
এই সুখ আর শূন্যতা যে অভিন্ন—
কর সেই ধ্যান।'

এই উপদেশ অনুশীলন করে বারো বছরে তাঁর দৃষ্টির মল শুদ্ধ হলো, তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন।

ভক্তদের প্রভূত হিত সাধন করলেন আর এই উপদেশ দিলেন :

'জল থেকে দুধ আকর্ষণ করে
যেমন হংসরাজ
তেমনি করে
সদ্‌গুরুর উপদেশ বচন ধারায়
গ্রহণ কর বোধিচিত্তের অমৃত।'

এই উপদেশ দিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *বভহির বিবরণ সমাপ্ত ॥

*নলিন

*গুরু *নলিন-এর কাহিনী।

*নলিন (নলিনী ?) অর্থাৎ *পদ্মের মূল।

*সালিপুত্র দেশে রাজকুলে জন্ম। কিন্তু অতি দরিদ্র বলে সরোবর থেকে পদ্মের মৃণাল সংগ্রহ করে তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

কোনও এক সময়ে এক যোগীর দেখা পেয়ে তাঁকে তিনি আমন্ত্রণ জানালেন। যোগী তাঁকে সংসারের দুঃখ কষ্ট ও পরিনির্বাণের কথা বললেন।

এই সংসারে তাঁর বিরাগ হওয়াতে তিনি যোগীর কাছে মুক্তির উপায় জানতে চাইলেন।

'বেশ, তাই দেব।' বলে যোগী তাঁকে গুহ্য সমাজের অভিষেক ও উপদেশ দিলেন :

'মূর্ধায় কল্পনা কর মহাসুখ
শুচিশুভ্র হং
নাভিদেশে জাগ্রত হোক এই অক্ষর
উজ্জ্বলপ্রভা থেকে নিঃসৃত হোক হং
আনন্দ বিরমানন্দ মহানন্দ
ক্রমে সহজানন্দ—
দূর হবে সংসার ক্লেশ
গ্রহণ-বর্জনে পাবে মুক্তির মহাসুখ।'

—এই উপদেশ দিলেন।

তিনিও সেইভাবে ধ্যান করলেন।

'পদ্ম যেমন পঙ্কে জন্মালেও পঙ্কিল হয় না তেমনি চতুরানন্দের ধ্যানে চারিচক্রকে আশ্রয় কর।'

কল্পনা বা আলম্বন এবং সংসারদোষ থেকে বিমুক্ত হয়ে ন বছরে ধ্যানের অর্থ উপলব্ধি করলেন, ভ্রান্তির সকল মল শুদ্ধ করে মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। *সালিপুত্রে তিনি অনেক প্রাণীহিত করলেন।

চার শতাব্দী পরে সাড়ে পাঁচশ অনুচর নিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *নলিনপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*ভুসুকু

*গুরু *ভুসুকুর কাহিনী।

*নলেন্দ্র দেশের রাজকুলে জন্ম—স্বভাবে সজ্জন। প্রব্রজ্যিত হয়ে ভিক্ষু হলেন।

*নলেন্দ্রে (নালন্দা) তখন রাজা *দেবফল (দেবপাল?) রাজত্ব করছেন। তিনি সেই ধর্মসম্প্রদায়ের সাতশ সংঘকে ভদ্রভাবে জীবনধারণের জন্য আহার ও পানীয় দান করলেন। সেখানে চতুর্বর্গের মধ্যে মহাসাংঘিক বর্গের উপাধ্যায়ের প্রায় তিনশ শিষ্য ছিল। অন্য সবাই অধ্যবসায় সহকারে পঞ্চবিদ্যা অনুশীলন করত।

রাজকুলের সেই ভিক্ষু সর্বদা ঘুমিয়ে থাকতেন। পেটে যখন আগুন জ্বলে উঠত তখন পাঁচ পাঁচ দ্রোণ মাপের ভাত একবারেই খেয়ে নিতেন।

রাজা *দেবফল বললেন, 'একে *ভুসুকু বলে জানো।' তাঁর নাম *ভুসুকু বলে খ্যাত হলো। তিনি শুধুমাত্র ভোজন, শয়ন ও মলমূত্র ত্যাগ করতেন।

*নলেন্দ্র ধর্মপীঠের নিয়ম ছিল প্রত্যেকেই এক এক দিন পালা করে শ্রদ্ধাভরে সূত্রপাঠ করবেন। সেখানকার সবাই *ভুসুকুর নিন্দায় মুখর হয়ে উঠল। উপাধ্যায় তখন বললেন, 'তুমি তো সূত্রপাঠ করতে পারবে না, তাই অন্যত্র চলে যাও।'

*ভুসুকু বললেন, 'আমি শীল ভঙ্গ করিনি, তাই আমাকে বহিষ্কার করা উচিত নয়। তবে আমার ভাগ্যে বিদ্যার্জন নেই।' এই বলে তিনি থেকে গেলেন।

কোন এক সময়ে সূত্রপাঠের পালা পড়ল ; সংঘ তাঁকে বললেন, 'আগামীকাল তোমার সূত্রপাঠের পালা।'

তিনিও সম্মত হলেন।

*নলেন্দ্রর সব ভিক্ষুরা *ভুসুকুকে পাঠ করতে দেখবেন বলে খুব হাসাহাসি করতে লাগলেন। উপাধ্যায় তখন তাঁকে বললেন, 'বিদ্যাশিক্ষা করার সময় তুমি তা না করে আহার নিদ্রায় ব্যাপৃত থেকে বিরুদ্ধ কাজ করেছ। *নলেন্দ্রর পণ্ডিতদের সামনে তুমি পাঠ কোরো না।'

*ভুসুকু তাঁর কথা মানলেন না ; বললেন, 'আমি সূত্রপাঠ করব।'

উপাধ্যায় বললেন, 'সূত্রপাঠ করতে না পারলে তোমায় এখান থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হবে, তার চেয়ে তোমার চুপচাপ থাকাই ভালো।'

*ভুসুকু বললেন, 'আমি জানি।'

উপদেশ শুনতে চায় না এমন মানুষকেই উপাধ্যায় তখন মঞ্জুশ্রীর মন্ত্র 'অরবচন' (?) শিক্ষা দিলেন আর বললেন, 'সারা রাত জেগে এই মন্ত্র জপ কর।'

কোমরে দড়ি বেঁধে সারা রাত ধরে তিনি মন্ত্র জপ করলেন।

আর্য মঞ্জুশ্রী স্বয়ং এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, '*ভুসুকুপা, তুমি কী করছ?'

তিনি বললেন, 'সকালে আমার মন্ত্রপাঠের পালা পড়েছে, তাই আর্য মঞ্জুশ্রীর কাছে প্রার্থনা করছি।'

আর্য বললেন, 'তুমি কি আমাকে চেনো ?'

'না, চিনতে পারছি না।'

'আমি মঞ্জুশ্রী।'

'তাহলে আমি ত্রিসম্পন্ন প্রজ্ঞার সিদ্ধি প্রার্থনা করি।'

‘তোমাকে আমি কাল সকালে সূত্রপাঠের বিদ্যা দিলাম।’ এই আশীর্বাণী উচ্চারণ করে আর্য মঞ্জুশ্রী অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

পরদিন সকালে সংঘারামে *ভুসুকুকে সূত্রপাঠ করতে দেখবেন বলে রাজা এলেন, আর সবাই একে অন্যকে ডাকতে লাগলেন।

পুষ্পার্ঘ্য ইত্যাদি পূজোপকরণ নিয়ে সকলে সেখানে মজা দেখতে এল।

*ভুসুকুপা সংঘের ভোজন গ্রহণ করে প্রফুল্ল মনে মন্দিরে সিংহাসনের উপরে গিয়ে বসলেন। তৎক্ষণাৎ তিনি অসামান্য আলোকপ্রভায় মণ্ডিত হলেন। তাই দেখে সবাই ইতস্তত করতে লাগলেন।

সম্মুখে এক যবনিকা টেনে তার আড়াল থেকে *ভুসুকুপা বললেন, ‘আগে যা হয়েছে, এমন ব্যাখ্যান করব কি?’

‘আগে যা হয়নি, এমন ব্যাখ্যান করুন।’ এই বলে পণ্ডিতরা পরস্পরের দিকে তাকালেন, রাজা আর অন্য লোক সবাই হাসতে লাগলেন।

রাজা বললেন, ‘আপনার খাবার ধরন, মলমূত্র ত্যাগ ইত্যাদি সব আচরণই অদ্ভুত। আপনি এক অভূতপূর্ব ধর্মদেশনই করুন।’

‘তাহলে আমি ‘চর্যাবতার’-এর দশম পরিচ্ছেদ দেশন করব।’ বলতে বলতে তিনি শূন্যে উড়ে গেলেন।

*নলেন্দ্রর পাঁচশ *পণ্ডিত, রাজা *দেবফল (পাঠান্তরে দেবপাল), সমবেত জনসাধারণের সকলেরই শ্রদ্ধা হলো।

ইনি *ভুসুকুপা নন, ইনি একজন পণ্ডিত।’ এই বলে রাজা ও *পণ্ডিতরা সবাই তাঁর নাম দিলেন *শান্তদেব। রাজা পণ্ডিত সকলের অহংকার শান্ত করেছিলেন বলে *শান্তদেব নাম হলো।

*পণ্ডিতরা সকলে সমবেত হয়ে তাঁকে (‘বোধিচর্যাবতার’-এর) টীকা রচনা করতে অনুরোধ করায় তাও করলেন, কিন্তু তাঁদের উপাধ্যায় হতে অনুরোধ করায় রাজি হলেন না। তারপর চীবর, পিণ্ডপাত্র ইত্যাদি প্রব্রজ্যার উত্তম উপকরণগুলি মন্দিরে ত্রিরত্নের সম্মুখে রেখে উপাধ্যায় বা সংঘ কাউকে না জানিয়ে তিনি পালিয়ে গেলেন।

ক্রমে তিনি *ধোকিরি নামে এক নগরে এসে পৌঁছোলেন, অর্ধ লক্ষ মানুষ সেখানে বাস করত। সোনার হাতল দেওয়া এক কাঠের তরোয়াল নিয়ে তিনি সেখানকার রাজার কাছে গেলেন। রাজাকে বললেন, ‘আমি আপনার তরোয়াল-ধারীর কাজ করব।’

রাজা বললেন, 'করতে পারো।' বলে তাঁকে প্রতিদিন দশ তোলা করে সোনা দিতে লাগলেন। জীবিকার জন্য তিনি বারো বছর ধরে তরোয়ালধারীর কাজ করলেন। কিন্তু সারার্থ থেকে বিচ্যুত হলেন না।

শরৎকালে একদিন তরোয়ালধারীরা *উমা দেবীর পূজা শুরু করল, তিনিও তাদের সঙ্গে পূজায় বসলেন। তখন তরোয়াল পরিষ্কার করতে হলো। পরিষ্কার করার সময় সহকর্মীরা তাঁর কাঠের তরোয়াল দেখে রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

রাজা বললেন, 'তোমার তরোয়ালটি একবার দেখাও।'

'দেখালে আপনাদের সবার অনিষ্ট হবে, তাই দেখানো ঠিক হবে না।'

'ক্ষতি হয় হোক, তবু দেখাও।'

'তাহলে এক চোখে অন্তত ঢাকা দিন।' এই উপদেশ দিয়ে কোষ থেকে অসি নিষ্কাশন করা মাত্র যাদের চোখ ঢাকা ছিল না তারা সেই তরবারির দ্যুতি সহ্য করতে পারল না। তাই তারা অন্ধ হয়ে গেল।

তারা ক্ষমা প্রার্থনা করায় তিনি তাদের মার্জনা করলেন। মুখ থেকে থুথু নিয়ে তাদের চোখে লেপে দিতেই তারা চোখ ফিরে পেল। আশ্চর্য হয়ে তারা প্রার্থনা জানাল, 'দয়া করে আপনি এখানে থাকুন।' তিনি রাজি হলেন না।

সেখান থেকে তিনি এক পাহাড়ে চলে গেলেন আর সেখানে মায়াশক্তি দিয়ে মৃগহত্যা করতে লাগলেন। তাঁকে মৃগমাংস খেতে দেখে একজন রাজাকে গিয়ে খবর দিল।

অনুচরদের নিয়ে রাজা সেখানে এলেন। রাজা বললেন, 'পূর্বে আপনি *নলেন্দ্র-র রাজা ইত্যাদিকে বিনীত করে ধর্মে নীত করেছেন, এখানেও নষ্টদৃষ্টি-নিরাময়—ইত্যাদি ক্ষমতা প্রদর্শন করেছেন। এমন ক্ষমতা যাঁর, তিনি কি এইভাবে জীবের অনিষ্ট করেন!'

শান্তিদেব বললেন, 'আমি তাদের হত্যা করিনি, পালন করছি।' এই বলে কুটীরের দ্বার খুলে দিলেন আর তখন দেখা গেল সেই প্রাণীরা সংখ্যায় দ্বিগুণ হয়ে গেছে। দেহেও বৃদ্ধি পেয়েছে। সংখ্যায় তারা এত বেড়ে গেল যে পর্বত ও সমভূমি ভরে গেল।

রাজা প্রভৃতি সবার শ্রদ্ধা হলো। তারপর মৃগগুলি কোথায় চলে গেল, তাদের আর কোন চিহ্ন রইল না।

এই দৃশ্য দেখে রাজা ইত্যাদি ভাগ্যবানরা বুঝলেন : সমস্ত ধর্মই মায়া, স্বপ্নবৎ,

আদিতেই অসিদ্ধ, নিঃস্বভাব ; তাঁদের এই উপলব্ধি জাগল ; তাঁরা মার্গে প্রবেশ করলেন। (শান্তিদেব) বললেন :

'হত্যা করেছি যে প্রাণীদের আমি
আদিতে তারা কোথাও থেকে আসেনি,
মধ্যেও কোথাও তারা ছিল না।
তাদের কাউকেই দেখা গেল না শেষে।
আদিতেই অসিদ্ধ, অবাস্তব সর্ব ধর্ম
তাই হতই বা কে হচ্ছে,
কেই বা হত্যা করছে—
অসিদ্ধ উভয়েই।
অহো, জীবের প্রতি মহাকরুণায়
এই বচন দান করেন *ভুসুকু।'

—এই উপদেশ দিলেন।

তিনি সেই দেশের *রাজা ইত্যাদি সবাইকে বিনীত করে ধর্মপথে প্রবেশ করালেন। তাঁরাও শ্রদ্ধা সহকারে সিদ্ধিলাভ করলেন।

তারপরে মাত্র এক রাত্রি সাধনা করে *ভুসুকুপা মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন।

তিনি কায়-বাক্-চিত্ত এই তিনকে অভিন্ন বলে জানলেন আর ক্ষণধর্ম থেকে মুক্তি পেলেন।

শেষে একশ বছর পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ভুসুকুপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*গুরু *ইন্দ্রভূতির কাহিনী।

*ওরজন দেশে পাঁচ লক্ষ (!) নগর ছিল। সেখানে দুজন রাজা রাজত্ব করতেন। *সম্বোল ইত্যাদি আড়াই লক্ষ (মানুষের ?) নগরে রাজত্ব করতেন রাজা

*ইন্দ্রভূতি আর *লংকাপুরী ইত্যাদি আড়াই লক্ষ (!) নগরে শাসন করতেন রাজা *জালেন্দ্র।

*সমবোল-এর রাজা *ইন্দ্রভূতির ভগ্নীর নাম *লক্ষ্মীংকরা, তাঁর বয়স সাত বছর। *লংকাপুরীর রাজা *জালেন্দ্র তাঁর ছেলের সঙ্গে (লক্ষ্মীংকরার) বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। রাজা *ইন্দ্রভূতি তার মন্ত্রীদের একত্র করে পরামর্শ করলেন। *জালেন্দ্র ধর্ম করে না—এইটুকু ছাড়া আর সব এক এই বলায় (কন্যা) দান করার সিদ্ধান্ত হলো।

'(লক্ষ্মীংকরা) ধর্ম করেন এবং (লংকাপুরীর রাজা) ধর্ম করেন না—এই পার্থক্য আছে, তা সত্ত্বেও আত্মীয়তা করব।'—এই কথা বলে *লংকাপুরীর রাজার দূতকে ফেরৎ পাঠালেন *ইন্দ্রভূতি।

পরের বছর সেই রাজপুত্র *সমবোলে এলেন। *লক্ষ্মীংকরার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে দেশে ফেরবার সময় *ইন্দ্রভূতি হাতি-ঘোড়া-সোনা-রুপো ও অনেক লোকজন তাঁর সঙ্গে দিয়ে পাঠালেন।

নিজের দেশে ফেরার পর বাবা তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'বৌ কোথায় ?'

'ছোট বলে পাঠায়নি।'

'তা ভালো।' বললেন তিনি।

রাজা *ইন্দ্রভূতির অনেক রানী ছিলেন আর তাঁরা সবাই সর্ব ধর্মেই শ্রদ্ধাশীলা ছিলেন। তাই (ইন্দ্রভূতি) বোন ও রানীদের সঙ্গে গুরু লাবপার কাছে শক্তি ও উপদেশ প্রার্থনা করে একনিষ্ঠ সাধনা করলেন। (ইন্দ্রভূতির) বোনের ষোলো বছর বয়স হলে তাঁকে নিয়ে যাবার জন্য দূত পাঠালেন রাজা জালেন্দ্র। তারপরে বোন সংসারের সকল বিষয়ে বিমুখ হয়ে সাধনা করেছেন, সিদ্ধিলাভ করে খসর্পণে চলে গেছেন এক ঝাড়ুদারের সঙ্গে ; একথা বোনের জীবনীতে স্পষ্ট করে বলা হয়েছে।

কন্যা কী আচরণ করে চলে গেছেন, রাজা *জালেন্দ্র দূত পাঠিয়ে তা *ইন্দ্রভূতিকে জানালেন।

'আমার বোন সিদ্ধিপ্রাপ্ত হওয়ায় ভালো হয়েছে, শুধু নিজের সুখশান্তি দেখা ভালো নয়।' বললেন *ইন্দ্রভূতি।

*ইন্দ্রভূতি এই চিন্তা করলেন, 'আমার এই বোনের জন্ম সার্থক হয়েছে। নানা দোষে ভরা, তুচ্ছ এই রাজ্য ত্যাগ করে ধর্ম করা আমারও উচিত।'

এই চিন্তা করে নিজের পুত্রকে রাজ্য দান করে তিনি প্রাসাদে বসে সাধনা করতে লাগলেন। বারো বছরে তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন।

অনুচররা কেউ সে কথা জানতে পারল না। অনুচরদের সঙ্গে নিয়ে রাজপুত্র তাঁকে দেখতে এলেন। যেই তাঁরা দরজা খুলতে গেলেন, তখনই শূন্য থেকে বাণী ভেসে এলো : ‘দরজা খুলো না, আমি এখানে আছি।’

উপরের দিকে তাকিয়ে সবাই তাঁকে শূন্যে দেখতে পেলেন ও প্রথম ভূমিপ্রাপ্তের আনন্দ পেলেন। ভক্তিভরে প্রণাম করে তাঁরা একদিকে সরে গেলেন।

রাজা সাতদিন শূন্যে থাকলেন। পুত্র ও অনুচরদের গূঢ় গভীর ধর্ম বিস্তৃত করে উপদেশ দিলেন। তারপর সাতশ অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ইন্দ্রভূতির বিবরণ সমাপ্ত॥

*মেকোপা

*গুরু *মেকোপার কাহিনী।

*ভংগল দেশের মুদি বংশের লোক। সর্বদা এক যোগীকে ভরণপোষণ করতেন।

যোগী একদিন বললেন, ‘তুমি কেন আমাকে পূজা কর?’

তিনি বললেন, ‘এই দিয়ে নিশ্চয়ই পরবর্তী পথের পাথেয় হবে, আর তার দরকারও আছে।’

যোগী বললেন, ‘পরবর্তী পথের পাথেয় আমার কাছে আছে, কিন্তু সিদ্ধিলাভের ক্ষমতা তোমার আছে কি?’

‘হ্যাঁ, আছে।’ বলায় যোগী তাঁকে চক্রসম্বরের অভিষেক ও আশীর্বাদ দিলেন। চিত্তের পরিচয় পাওয়ার উপদেশ দিলেন এইভাবে :

‘স্বচিত্ত চিন্তামণিতে
লোকালোকের আভাস জাগে।
জ্ঞাত ও অজ্ঞাত এই দুইকে
অপরিবর্তিত চিত্তে দেখ।
দ্বৈত বা দ্বিধার বিকল্প আসে কোথা থেকে?
নিঃস্বভাব দৃষ্টিতে দেখবে সর্ববস্তুকে
অসত্য, অসিদ্ধ বলে।

তোমার ভ্রান্ত কামনাই
অজ্ঞানের বন্ধনস্বরূপ বলে জেনো।'

এই উপদেশ অনুসারে সেই ব্যক্তি সমস্ত লোক (প্রতীয়মান) ধর্মকে নিজের চিত্তের আলোয় দেখতে পেলেন। চিত্ত যে স্থির, চিত্তের যে গতায়াত নেই, এই তত্ত্ব উপলব্ধি করলেন। ছ মাসে তিনি ভ্রান্তির কল্পনা রোধ করে নিজের চিত্তের গূঢ় অর্থ হৃদয়ঙ্গম করলেন।

তারপর হিংস্র বন্য পশুর মতো শ্মশানে ঘুরে বেড়াতে লাগলেন, কখনও বা উন্মাদের মতো আচরণ করে গ্রামে নগরে ঘুরতে লাগলেন। চোখ ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে দেখতেন বলে লোকে তাঁর নাম দিল গুরু ভীষণদৃষ্টি।

সবদিকে *মেকোপা নামে খ্যাত হলেন; তিনি গম্ভীর ধর্মোপদেশ দিয়ে বহু ভক্তকে বিনীত করলেন। শেষে চর্যা রচনা করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন তিনি।

*গুরু *মেকোপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কোটলিপা

*গুরু *কোটলিপার কাহিনী।

*রামেশ্বর নামে দেশ থেকে চার দিনের পথ—এমন এক জায়গায় *কোটলিপা তাঁর বসবাসের জন্য কোদাল দিয়ে পাহাড় খুঁড়ছিলেন।

সিংহলরাজের আমন্ত্রণ সেরে আচার্য *শান্তিপা সেই পথে মধ্যদেশে (মগধে) ফিরছিলেন, তখন তাঁদের দেখা হলো।

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী করছ?'

*কোটলিপা আচার্যকে তাঁর শারীরিক কুশল সংবাদ জিজ্ঞাসা করলেন আর বললেন, 'আমি পাহাড় খুঁড়ছি।'

*শান্তিপা জিজ্ঞাসা করলেন, 'পাহাড় কেন খুঁড়ছ?'

তিনি বললেন, 'দুষ্ট রাজা দেশ নষ্ট করে সব মানুষকে দুঃখে রেখেছে। আমি তাই এখানে পাহাড় খুঁড়ে থাকার জায়গা তৈরি করছি।'

*শান্তিপা বললেন, 'পাহাড় খোঁড়ার মন্ত্র ও উপদেশ আমার কাছে আছে, তোমার দরকার নেই কি?'

*কোটলিপা বললেন, 'দরকার আছে।'

তাঁর (শান্তিপার) কণ্ঠ থেকে বাণী উচ্চারিত হলো :

'এই ধরনের পরিশ্রমে তোমার
শরীর হবে শ্রান্ত ক্লান্ত ;
প্রতিক্রিয়াও হবে তার ক্ষতিকর।
ভূমিখনন, দান, অন্যের ক্ষতি না করার শীল,
দুঃখ সহ্য করার ক্ষান্তি, সেই প্রচেষ্টায়
একনিষ্ঠতা, আর অবিক্ষেপ ধ্যান
এই ছটিকে জানাই প্রজ্ঞা।
এর বিপরীত কাজ আছে ছটি।
সেগুলি ত্যাগ কর
আর পালন কর সম্যক ধর্মকর্ম।
জেনো—গুরুকে শ্রদ্ধাই দান,
স্বসন্ততি রক্ষা করাই শীল,
নিজের চিত্তকে সংযত রাখাই ক্ষান্তি,
তার সাধনা করাই বীর্য,
তার থেকে বিচলিত না হওয়াই ধ্যান,
এগুলিকে সাক্ষাৎ জানাই প্রজ্ঞা—
সর্বদা এই অভ্যাস করতে শেখো।'

-- *কোটলিকে এই উপদেশ দিলেন।

'সংক্ষেপে এর অর্থ বলুন।' এই প্রার্থনা শুনে তিনি বললেন, 'গুরুকে শ্রদ্ধা কর। সুখ-দুঃখ সবই নিজের চিত্ত থেকে উদ্ভূত হয়। নিজের চিত্তের স্বাভাবিক তাৎপর্য অভ্যাস কর।

'নিজের চিত্তকে বিচলিত না করে পাহাড়ের মতো হও। আর অনিরুদ্ধ জ্ঞানের প্রভার কোদালি দিয়ে সেই চিত্তকে খনন কর।

'খননের ধ্যানে এই দুই প্রয়াস হবে তোমার বাম ও দক্ষিণ বাহুর মতো।'

দোহায় তিনি এই ভাব ব্যক্ত করলেন :

'চিত্ত থেকেই জাত হয় সমস্ত দুঃখ-সুখ,
উপদেশ দিয়ে চিত্তরূপ পাহাড় খনন কর।

মাটির পাহাড় খনন করলে
জাগবে না মহাসুখের বোধ।'

এই উপদেশ অনুসারে সাধনা করে বারো বছরে তিনি সিদ্ধিলাভ করলেন; অনেক প্রাণীহিত করে শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কোটলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কংপরিপা

*গুরু *কংপরিপার কাহিনী।

*কংপরিপা মানে কামার। দেশ *সালিপুত্র। কুলে কামার, বংশের রীতি মেনে জীবিকার জন্য সর্বদা কুলকর্ম কামারের কাজ করতেন।

এক সময় তাঁর কামারশালায় এক যোগী এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী কাজ করছ?'

তিনি বললেন, 'আমার বংশের যা কাজ, সেই কামারের কাজই করছি।'

'এই কাজ তুমি সুখে করছ তো?'

'সুখে আর কী হবে! কখনও তাড়াতাড়ি করতে গিয়ে আগুনের ফুলকি আর তাপে পুড়ে যাই। বেঁচে থাকার জন্য দুঃখ সহ্য করে আছি।'

যোগী আহার চাইলেন। কামার দম্পতি ভাবলেন, 'আমাদের পুণ্য সামান্য, তবুও এই যোগী নীচু জাতের লোকের হাতে খেতে চাইছেন, এটা খুব আশ্চর্যের ব্যাপার!' এই ভেবে তাঁরা খুবই আনন্দিত হলেন।

যোগী বললেন, 'তুমি কি ধর্মের কাজ করবে না?'

তাঁরা বললেন, 'আমাদের মতো নীচু জাতের মানুষকে কে উপদেশ দেবে?'

'যদি ধর্মে শ্রদ্ধা রেখে সাধন করতে পারো, তাহলে আমি তোমাদের উপদেশ দিতে পারি।'

তাঁরাও হৃষ্ট চিত্তে প্রণাম ও পূজায় যোগীকে তুষ্ট করে উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

অধিষ্ঠান-সংস্কারের অভিষেক দিয়ে যোগী তাঁদের আলম্বনের তিনটি মূল উপদেশ দিলেন: 'তোমার হাপর, কয়লা, আগুন দিয়ে লোহা গলানো পেটানোর

আলম্বনকে আধ্যাত্মিক রূপে সম্যক ধ্যান কর। ললনা ও রসনাকে হাপর কর, *অবধূতীকে নেহাই কর, বিশুদ্ধ জ্ঞানকে কামার কর। জ্ঞানের অগ্নি প্রজলিত কর, বিকল্পকে কয়লা কর, তারপর তিন বিষকে লোহা বলে ধরে নিয়ে পেটো। তাহলে অদ্বিতীয় ধর্মকায়ের মহাকীর্তির ফল পরিপক্ব হয়ে আসবে।'

তারপর দোহায় এই উপদেশ দিলেন :

'তোমার যেমন বাইরের কাজ করার অভ্যাস হয়েছে,
তেমনি করে কর অভ্যন্তরের কাজ
*ললনা ও *রসনা, দক্ষিণ ও বাম
এই দুই হাপরে জ্বালো আগুন।
নেহাই কর *অবধূতীকে
বিশুদ্ধ জ্ঞান হোক কামার
বিকল্পের কাঠকয়লা দিয়ে
বিদ্যা-জ্ঞানের আগুন জ্বালাও।
ত্রিবিধ ক্লেশের বিষকে লোহার মতো গলাও,
উদয় হবে অনাস্রব ধর্মকায় এরই ফলে।'

তিনিও নিজের (কুল) কর্মের সঙ্গে উপমিত করে ধ্যান করলেন। ছ'বছরে মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। অন্যদের অজ্ঞাত থেকে গেল এই ঘটনা।

তাঁর চুল্লী থেকে বিনা আয়াসেই নানা শিল্পদ্রব্য আপনা থেকেই তৈরি হতে লাগল।

*সালিপুত্রের সব লোক আশ্চর্য হয়ে বলতে লাগল, 'আমাদের এই কামার সব গুণকর্মে সিদ্ধিলাভ করেছেন।' সর্বত্র *গুরু *কংপরিপা নামে খ্যাত হলেন।

অনেক প্রাণীহিত করে ও অবদান রচনা করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কংপরিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*জালন্ধর

*গুরু *জালন্ধর-এর কাহিনী।

*জালন্ধর অর্থে যিনি জাল ধারণ করেন। *নগরথোদথ (নাগরকোট?) নামের এক দেশের ব্রাহ্মণকুলে জন্ম।

সংসারে বিতৃষ্ণ হয়ে তিনি শ্মশানে গিয়ে এক বৃক্ষমূলে বসে রইলেন, প্রজ্ঞার সুখ তাঁর সেখানে বসেই অনুভূত হলো।

শূন্য থেকে এক ডাকিনী তাঁকে ডেকে বললেন, 'কুলপুত্র, তুমি সত্য অর্থ হৃদয়ঙ্গম কর।'

শুনে তাঁর খুব আনন্দ হলো। বারবার প্রার্থনা করায় জ্ঞান-ডাকিনী তাঁকে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন আর হেবজ্রের অভিষেক ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে বললেন : 'ত্রিলোকের বাহ্য ও অভ্যন্তরের সকল প্রাণী ও অপ্রাণীসমূহকে নিজের কায়-মন-বাক্যের দ্বারা একত্র কর।

ধূতীতে যুক্ত কর দুই ধমনী। তারপর স্মৃতি-সংবিত ও বিকল্পকে
মূর্ধন্য ব্রহ্মদ্বার পদে নির্গত কর।
দৃশ্য ও শূন্যতাকে অভিন্ন রূপে ধ্যান কর।
বাহ্য ও অভ্যন্তরের অশেষ ধর্ম,
সমাবিষ্ট কর তাদের কায়-বাক্-চিত্তের এই তিনে।
অবধূতীতে নিহিত আছে বাম ও দক্ষিণ
সবাইকে কর একত্র ব্রহ্মতালুতে।
সেই শূন্যতাই মহাসুখ।
বিশুদ্ধ যোগরস থেকে জাত সেই
সুখশূন্যতার যুগনদ্ধরূপে সঞ্চারণ কর।'

এই বলে ডাকিনী তাঁকে সম্পন্নক্রম উপদেশ দান করলেন।

তিনিও সেই মতো ধ্যান করে তিন বছরে মহামুদ্রার সিদ্ধি পেলেন। চর্যারচনা করে ও অপরিমেয় প্রাণীহিত করে তিনশ অনুচর নিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *জালন্ধরের বিবরণ সমাপ্ত ॥

*রাহুল

*গুরু *রাহুলের কাহিনী।

*রাহুল অর্থে রাহুকে যিনি ধারণ করেন। তাঁর দেশ *কামরূপ, কুলে শূদ্র।

বার্ধক্যের দরুন শরীরের বন্ধন তাঁর অসহ্য হয়ে উঠল। আত্মীয়-বন্ধু এবং পুত্ররা সকলেই তাঁকে অবজ্ঞা করত। পরজন্মের কথা ভেবে তিনি শ্মশানে চলে গেলেন।

তাঁর কাছে এক যোগী এলেন, তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্মশানে বসে কী করছ ?'

'রাহুগ্রস্ত হয়েছে আমার যৌবনের চন্দ্র,
অবহেলা করছে আমার পুত্ররা সবাই
এর চেয়ে মৃত্যু ভালো,
সেই ভাবনাতেই,
বসে আছি এখানে।'

যোগী বললেন :

'কর্মফল পূর্ণ পরিপক্ক হয়েছে তোমার,
অতিক্রম করে এসেছো ত্রিধারা (বাল্য-যৌবন-বার্ধক্য)
এসেছো মৃত্যুনদীর কূলে ;
মৃত্যুপথে পাথেয় হবে যে ধর্মের কাজ—
করবে সে কাজ ?'

তিনি বললেন, 'গুরু, ধর্মের কাজ তো করতে চাই, কিন্তু বৃদ্ধ হয়েছি, নির্ধন আমি, কে আমাকে ধর্ম দেবে ?'

তখন গুরুর মুখ থেকে এই বাণী উচ্চারিত হলো :

'জরা স্পর্শ করে না সহজে স্থিত চিত্তকে,
ক্ষয় নেই শ্রদ্ধারূপ চিত্তধনের,
ভক্তিভরে যদি সদ্ধর্ম সাধন করো
তাহলে অনুগ্রহ পাবে আমার।'

এই বলে প্রভাব-সঞ্চারের অভিষেক ও 'তিলক উপদেশ' দিলেন ; বললেন,

'অদ্বৈত-জ্ঞান-রাহু দিয়ে, দমন কর—
গ্রাহ্য-গ্রাহক ধারণাকে।
মূর্ধন্য মহাসুখমণ্ডলে গভীর রসের বিন্দু আর
সুখ-শূন্য যুগনদ্ধ প্রবাহে
পরাস্ত কর স্কন্ধরূপী শত্রুকে ;
লাভ করবে তখন বুদ্ধত্ব গুণ,
অহো, সে যে অনিরুদ্ধ, অদ্ভুত।'

এই উপদেশ পেয়ে সেই বৃদ্ধ ব্যক্তিও ধ্যান করলেন।

তখন অদ্বৈত রাহু দ্বৈত কল্পনার চাঁদ গ্রাস করল। অদ্বৈত, অমৃত মূর্ধন্য ব্রহ্মদ্বার

দিয়ে প্রবেশ করায় সর্বশরীর অমৃতপূর্ণ হয়ে উঠল। বার্ধক্য দূর হলো আর তাঁর দেহ ষোলো বছর বয়সের মতো হলো।

তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করে *কামরূপ প্রভৃতির বহু লোককে বিনীত করে শেষে চর্যারচনা করলেন।

তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *রাহুলের বিবরণ সমাপ্ত॥

*ধর্মপা

*গুরু *ধর্মপার কাহিনী।

*ধর্মপা অর্থে যে ধর্ম করে।

দেশের নাম *বোধিনগর. সেখানকার পণ্ডিত ছিলেন তিনি। ব্যাখ্যার কাজ করতেন, সাধনের চেষ্টা করতেন না।

তারপর এক সময়ে বার্ধক্যে তাঁর চোখ চলে গেল। তখন তাঁর মনে এই চিন্তা এল : 'আমি গুরুর দর্শন পাবার চেষ্টা না করে ভালো করিনি।' *ডাকিমা তাঁর স্বপ্নে ভবিষ্যদ্‌বাণী করলেন. 'আমিই তোমার কল্যাণমিত্র।' তিনিও সেই প্রার্থনাই করলেন। *ডাকিমা তাঁকে দর্শন দিয়ে উপদেশ ও অভিষেক দিলেন ; বললেন :

'সমস্ত ধর্মকে পাত্রের রূপে ও সমস্ত বিকল্পকে ঘৃত বলে ভাব। নিজের চিত্তকে শলাকা বলে ভাব আর জ্ঞানের আগুন দিয়ে তাকে প্রজ্বলিত করার ধ্যান কর।'

'সর্ব অশেষ ধর্মের পাত্রে
ঢালো বিকল্পের ঘৃত।
বিদ্যার শলাকা দিয়ে জ্বালো আগুন
তখন দেখবে চিত্তকে চিন্তামণির মতো।'

এই উপদেশে তিনিও বিকল্পকে জ্ঞানের দ্বারা উদ্দীপিত করে সিদ্ধিলাভ করলেন।

মন্ত্র পড়ে যেমন বিষকে দমন করা হয়, তেমনি করে পাঁচ বছর ধ্যান করে বিকল্পকে তিনি জ্ঞানে পরিণত করলেন। তাঁর শরীর আট বছরের বালকের মতো হয়ে গেল। এই ঘটনায় সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেল।

তিনি বললেন :

‘হেতুপ্রত্যয় তো শূন্য ;
তার সমবায়ে কী করে
শূন্যতা ছাড়া আসবে ফল ?
বুদ্ধি যাঁদের প্রজ্ঞায় আলোকিত
এইভাবেই তাঁরা উদ্যমশীল হবেন ।’

এই উপদেশ দিলেন ।

কথকতার মাধ্যমে অনেক প্রাণীহিত তিনি করলেন ; তারপর চর্যা রচনা করে খসর্পণে চলে গেলেন ।

*গুরু *ধর্মপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*ধোকরিপা

*গুরু *ধোকরিপার কাহিনী ।

*‘ধোকরি’ অর্থে পাত্রবাহক (অর্থাৎ ভিক্ষুক)। জন্ম *সালিপুত্র নামক দেশে শূদ্রকুলে ।

সর্বদা পাত্র বহন করে ভিক্ষা চাইতেন, যা পেতেন তিনি পাত্রে রেখে দিতেন ।

এক সময়ে পাত্রে রাখবার মতো কোন উপকরণ তিনি পেলেন না (অর্থাৎ ভিক্ষা মিলল না) । তখন তিনি এক বৃক্ষমূলে গিয়ে বসে রইলেন । এক যোগী এসে তাঁর কাছে ভিক্ষা চাইলেন । তিনি বললেন, ‘আপনাকে ভিক্ষা দেবার মতো আজ আমার কিছুই নেই ।’

‘কিন্তু তোমার কি ধর্মে প্রয়োজন নেই ?’

তিনি বললেন, ‘প্রয়োজন তো আছে, কিন্তু কল্যাণমিত্র গুরুর সাক্ষাৎ পাই নি ।’

‘তুমি কি সাধনা করতে পারবে ?’

‘হ্যাঁ পারব ।’ বলে তিনি প্রার্থনা জানালেন । যোগী তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিলেন :

‘হে *ধোকরিপা, ধর্মধাতুর পাত্রে
রাখ সংবিদের দ্রব্য
আর ধ্যান কর অদ্বয়ের ।’

তার অর্থ উপলব্ধি করে তিনিও ধ্যান করলেন আর তিন বছরে সিদ্ধিলাভ করলেন।

তখনও তিনি পাত্র নিয়ে ভিক্ষা চাইতেন বলে লোকেরা বলল, 'গুরু, আপনি কী বহন করছেন ?'

'মহাশূন্যতার পাত্র বয়ে
সংগ্রহ করছি মহাসুখের ফল।
এই যে কামনা *ধোকরির
জানেন না কি তা ভাগ্যবানরা ?'

এই উপদেশ দিয়ে অনেক প্রাণীহিত করলেন।

অবদান রচনা করে *ধোকরি এই নামে খ্যাত হলেন। তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ধোকরিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*মেদিনী

*গুরু *মেদিনীর কাহিনী।

*মেদিনী অর্থে চাষী, কুলে শূদ্র। দেশ *সালিপুত্র। খেতে কাজ করার সময় তাঁর কাছে এক যোগী এলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি কী করছ ?'

তিনি বললেন, 'আমি খেতের কাজ নিয়েই থাকি।' যোগী বললেন, 'এই দুর্দশার জন্য তোমার কি ক্ষোভ হয় না ? ধর্মের কাজ করবে তুমি ?'

তিনি বললেন, 'কে আমাকে ধর্ম দেবে ?'

'সাধনা করবার ক্ষমতা যদি তোমার থাকে, তাহলে আমি দেব।'

'হ্যাঁ পারব।' বলায় যোগী তাঁকে অভিষেক দিলেন। উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে তাঁকে ধ্যানে বসালেন।

কিন্তু খেতে কাজ করার পূর্ব অভ্যাসের বিকল্পের দরুন ধ্যান থেকে বারবার বিচ্যুত হচ্ছিলেন। ধ্যান করতে পারছিলেন না ; তাই গুরুকে সে কথা বললেন। গুরু তখন তাঁর বিকল্পের আলম্বন অনুরূপ উপদেশ দিলেন :

'নিজের বিকল্পকে হাল কর, সুখ ও দুঃখের
অনুভূতিকে কর বলদ। দেহকে ধ্যান কর—
খেতের রূপে। দিনরাত সেই খেতে স্বয়ং
ধর্মতার সুখফল উৎপন্ন হচ্ছে—কর এই ধ্যান।'

দোহায় বললেন :

'নিজের বিকল্পকে মনে কর হালের মতো,
জোড়া বলদ বলে মনে কর
সুখ-দুঃখের অনুভূতিকে,
বিপাক দেহ অর্থাৎ স্কন্ধভূমিকে
ক্ষেত্র রূপে নিয়ে—
বপন কর ভালোভাবে ধাতুর বীজ।
অবিরত মহাসুখের ফল লাভের জন্য
যত্নবান হও কৃষিকাজে।'

এই উপদেশ অনুসারে ধ্যান করলেন *মেদিনীপা।

বারো বছরে সংসারের নানা বিকল্প নিরোধ করে তিনি সিদ্ধি লাভ করলেন। সাত তাল গাছের সমান উঁচুতে শূন্যে উঠে তিনি অবদান রচনা করলেন; *সালিপুত্র নগরে অপরিমেয় প্রাণীহিত করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *মেদিনীপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*পংকজ

*গুরু *পংকজ-র কাহিনী।

কুলে ব্রাহ্মণ, অবলোকিত-এর কাছে সিদ্ধি পেয়েছিলেন। সেই ব্রাহ্মণপুত্রের নাম ছিল *পংকজ। তিনি নির্জনে এক *পদ্ম বনে *পদ্ম পত্রে জন্ম নিয়েছিলেন।

সেই *পদ্ম সরোবরের ধারে অবলোকিতেশ্বরের এক মূর্তি ছিল। *পংকজ নিজে *মহাদেবকে ভক্তি করতেন। তাই সেই মূর্তিটিকে *মহাদেবের মূর্তি ভেবে ভক্তিভরে তিনি বারো বছর ধরে তাঁর পূজা করলেন। সে দেশে পূজার পদ্ধতি অনুসারে দিনে তিন বার তিনি মূর্তিটির পূজা করতেন আর পুষ্পার্ঘ্য নিয়ে নিজের মাথায় ঠেকাতেন।

কোন এক সময় আচার্য নাগার্জুন সেখানে এলেন আর সেই মূর্তিটির পূজা করলেন। তাঁর দেওয়া পুষ্পার্ঘ্য নিজে হাতে নিয়ে মূর্তি নাগার্জুনের মাথায় দিলেন।

*পংকজ রেগে গিয়ে ভাবলেন, 'বারো বছর ধরে আমি পূজা করছি, কিন্তু তা নিলেন না, আর ইনি একবারমাত্র করাতেই নিলেন!'

মূর্তি স্বমুখে বললেন, 'তোমার চিত্ত অশুদ্ধ, তাই আমাকে দোষ দিও না।'

*পংকজ-র তখন অনুতাপ হলো, আচার্য নাগার্জুনের চরণ মস্তকে ধারণ করে তিনি প্রার্থনা জানালেন, 'আমাকে আপনার অনুগামী করুন।'

তিনিও অভিষেক দিয়ে দর্শন ও চর্যা উভয়কেই আয়ত্ত করা যায় এমন উপদেশ দিলেন:

'করুণার দ্বারা উৎপন্ন সুখ
এবং আদিতেই যা অসিদ্ধ
এই দুটিকে এক করে
অভিন্নভাবে কর সম্যকদর্শন
আর্যের অভিপ্রেত এই-ই।'

*পংকজও তার অর্থ উপলব্ধি করে সাতদিনে সিদ্ধি লাভ করলেন।

প্রাণীদের করুণার দৃষ্টিতে দেখে তিনি চর্যা উপদেশ ও প্রভূত হিত সাধন করলেন। শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *পংকজ-র বিবরণ সমাপ্ত॥

*ঘণ্টাপা

*গুরু *ঘণ্টাপার কাহিনী।

*শ্রীনলেন্দ্র দেশের প্রধান ভিক্ষু, সম্বর নিয়ে শুদ্ধাচার পালন করতেন। পঞ্চবিদ্যায় পণ্ডিত তিনি, তাঁর খ্যাতি চতুর্দিকে ব্যাপ্ত হলো। দেশে দেশে তিনি প্রাণীহিতের জন্য গেলেন।

রাজা *দেবফল: পুণ্যবলের ফলে তাঁর রাজ্যের সমৃদ্ধি ও শক্তি অপরিসীম হয়েছিল। নিজের আঠারো লক্ষ, *কামরিপার (কামরূপ) নয় লক্ষ, *ভংগলের চার লক্ষ, এক সঙ্গে যোগ করলে একত্রিশ লক্ষ নগর (নগরবাসী প্রজা?)—এই রাজা

শাসন করতেন। আচার্য তাঁর রাজ্যের *সালিপুত্র নগরে গিয়ে পিণ্ড সংগ্রহ করতে লাগলেন। সেখানে তিনি একটি বৃক্ষমূলে বাস করতেন।

রাজা *দেবফল বহু পুণ্যস্থানে পূজা দিতেন, তাঁর পূজ্যগুরুর সংখ্যাও অসংখ্য ছিল।

এক রাতে রানীর সঙ্গে আলোচনা করতে করতে রাজা বললেন, ‘সর্ব সংস্কারই অনিত্য, জাগতিক সর্ববিষয়ই দুঃসময়। সংসারের ধর্মে কোন সার নেই। যদি আমাকে এখন ও ভবিষ্যতে রাজ্যশাসন করতেই হয়, তাহলে আমাদের স্বামী-স্ত্রী উভয়কেই পরজীবনের পাথেয় সংগ্রহ করতে হবে। আর সেজন্য যোগ্য ব্যক্তির পূজা করা উচিত নয় কি?’

রানী বললেন, ‘আপনার অগণিত পূজাস্থানে পূজ্য যাঁরা আছেন, তাঁদের চেয়ে বিশিষ্ট এক আর্য বিনয়ধর গ্রামের প্রান্তে ঐখানে গাছের কাছে বসে আছেন। তিনি পিণ্ড, ধর্মবাস ও সামান্য উপকরণে জীবিকা নির্বাহ করেন। তাঁকে আপনি চুরাশি ব্যঞ্জন, চর্ব্যবস্তু চোদ্দ রকমের, আঙুরের মদ ইত্যাদি পাঁচ রকমের পানীয় নিবেদন করুন। প্রদীপের আলোয় তাঁকে দেখা যাবে না, মহারত্নের দ্যুতিতে তাঁকে দেখা যাবে। রাজ্যের সকল পার্থিব প্রার্থিত বস্তু তাঁকে সমর্পণ করুন।’

রাজা বললেন, ‘তাই হবে।’

আচার্যকে আমন্ত্রণ করে আনার জন্য রাজা পরদিন সকালে একদল অনুচর পাঠালেন। কিন্তু তাঁকে আনা গেল না।

রাজা তখন অনুচরদের নিয়ে সেখানে গেলেন। আচার্যের সঙ্গে অনেক কথা-বার্তা বললেন ও আসার জন্য তাঁকে অনুরোধও জানালেন।

আচার্য জিজ্ঞাসা করলেন, ‘কেন এখানে এসেছ?’

‘আচার্যের প্রতি শ্রদ্ধান্বিত হয়ে পূজাস্থানে তাঁকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য এসেছি।’

আচার্য বললেন, ‘রাজার রাজ্য পাপযুক্ত বলে আমি সেখানে যাব না।’

‘বরাবরের মতো না-ই বা থাকলেন, অন্তত একবছরের জন্য থাকুন।’—এই প্রার্থনায়ও রাজি হলেন না।

ক্রমে ছয়মাস, তিনমাস, একমাস, আধমাস এমনকি একদিন থাকবার জন্য অনুরোধ করলেও তিনি রাজি হলেন না। বললেন, ‘তুমি পাপী, [শয়ন, উপবেশন আদি] চার আচরণ যা-ই কর না কেন, সে সব কিছুই পাপময়, তাই আমি যাব না।’

চোদ্দদিন ধরে রাজা বারবার অনুরোধ করাতেও তিনি রাজি হলেন না।

অনুচর-পরিবৃত রাজার মনে তখন ক্রোধের আগুন জলে উঠল। তিনি ঘোষণা করলেন, 'এই শ্রমণের বিশুদ্ধ চর্যা নষ্ট করবার ক্ষমতা কার আছে? যার আছে, তাকে আমি অর্ধরাজ্য ও এক খণ (প্রায় পনের সের) সোনা দেব।'

চারিদিকে ভালোভাবে প্রচার করতে পারে এমন লোকও পাঠালেন।

সেই দেশে বারনারীদের প্রধানা ছিলেন এক ধূর্ত নারী।

'আমি পারব।' তিনি রাজাকে জানালেন।

'তাহলে সাহস ও ক্ষমতা দিয়ে চেষ্টা কর ও সফল হও।'

সেই বেশ্যার একটি বারো বছরের মেয়ে ছিল। সে তখনও সংসার ধর্মের বসন পরে নি। সেই কন্যা সুদর্শনা, সুচারুগমনা, মধুরবচনা, স্বাস্থ্যবতী, উন্নতযৌবনা, তাকে দেখলে সূর্যের গতিও অচল হয়ে যায়।

'একে পাঠিয়ে তাঁকে ব্রহ্মচর্য থেকে বিচ্যুত করতে পারব।'—ভাবলেন তিনি।

সেই মেয়ে আচার্যের কাছে গিয়ে প্রতিদিন প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে ফিরে আসতেন। এই ভাবে দশ দিন করবার পরে আচার্যকে তিনি বললেন, 'আপনাকে আমি বর্ষাবাসের তিনমাস ভরণ-পোষণ দেব।'

আচার্য রাজি হলেন না।

এক মাস ধরে কন্যা বারবার বলায় আচার্য শেষ পর্যন্ত রাজি হলেন।

*দারিমা (বারনারী) খুশি হয়ে মহামঙ্গল উৎসব করে এই মন্ত্র উচ্চারণ করল:

'একাশি কামনা—
এই ছলনাময়ীর
পরিণত হোক শতকামনায়।'

সেই কন্যা বললেন, 'ছলনা করে আমি চারটি দ্বীপকেও বিচলিত করতে পারি, এই শ্রমণের কথা আর কী বলব? শুদ্ধচিত্ত যতই তিনি হোন না কেন, তাঁকে আমি ঠিকই বিচলিত করতে পারব।' এই ভেবে মন্ত্র পড়তে লাগলেন তিনি।

সেই সময় আচার্য বললেন, 'আমাকে যারা খাদ্য দেবে, তারা যেন পুরুষ হয়; নারী পাঠাবে না।'

'তাই হবে।' এই বলে আড়াই মাস ধরে চিনির সরবৎ, ভাতের মণ্ড ইত্যাদি পুরুষদের দিয়েই পাঠানো হলো।

তারপর একদিন সেই প্রধানা বারনারী কুমারীটিকে বহুমূল্য বস্ত্রালংকারে ভূষিত করে প্রচুর পরিমাণে বিভিন্ন খাদ্য পানীয় দিয়ে পাঁচশো অনুচরের সঙ্গে

পাঠালেন। বলে দিলেন, আচার্য যেখানে ছিলেন সেখানে সব কিছু পৌঁছে দিয়ে অনুচররা যেন ফিরে আসে।

সেই কন্যাও মায়ের ধূর্ত কৌশলের কথা মনে রেখে একা ভিতরে গিয়ে বসে রইলেন।

ভিক্ষু ভাবলেন, আগে যে লোক খাবার আনত, সেই আছে। তাই ভেবেই তিনি ভিতরে গেলেন আর তখন সেখানে সেই সুসজ্জিতা তরুণীকে দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'অন্য লোকটি কোথায় গেল ?'

কন্যা উত্তর দিলেন, 'তাদের সময় নেই বলেই আমি এসেছি।' তারপর সেই মেয়ে বহুক্ষণ সেখানে থেকে গেলেন।

'এখন তুমি যাও।' ভিক্ষু বললেন।

'আকাশে এখন পাঁচ রঙের মেঘ হয়েছে, বৃষ্টি আসবে।'

তারপরে 'বৃষ্টি নেমেছে, তাই আছি' বলে তিনি আরও অনেকক্ষণ থাকলেন। সূর্য ডুবে গেলে সেই কন্যা বললেন, 'পথের সঙ্গী আমার কেউ নেই। বসন-ভূষণের জন্য (চোরের হাতে) আমার প্রাণ যেতে পারে, তাই থাকব।'

'তা ঠিক।' ভেবে ভিক্ষু শুয়ে পড়লেন।

'রাতে ভয় পাব।' বলে কন্যা ভিক্ষুর কাছে এসে শুয়ে পড়লেন।

স্থান সান্নিধ্যের মাহাত্ম্যে তাঁদের উভয়ের দেহ মিলিত হলো। সেই মিলনে চার প্রকারের সুখ জাত হলো আর সেই পথে তাঁরা এগোলেন।

পরদিন সকালে মায়ের কাছে আর গেলেন না, কন্যা সেখানেই থাকলেন। দুজনের খাদ্য ও পানীয়ও কন্যা নিজেই সংগ্রহ করে আনতেন। এই ভাবে এক বছর কাটল, তাঁদের এক সন্তানও হলো।

রাজা সব সময়ই সেই বারাঙ্গনাকে জিজ্ঞাসা করতেন, কিন্তু পরিষ্কার উত্তর পেতেন না।

এইভাবে তিন বছর কাটল। তখন সেই বেশ্যা রাজাকে বললেন, 'মহারাজ, আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য সিদ্ধ হয়েছে। এখন আনন্দ করুন।'

তখন রাজা হুকুম দিলেন, 'তাহলে তোমার মেয়েকে তিনদিনের মধ্যে সেই ভিক্ষুকে নিয়ে আমার কাছে আসতে বল।'

তারপর রাজা নিজেই *সালিপুত্রের সব মানুষের সঙ্গে সেই ভিক্ষুর কাছে চললেন।

তখন সেই কন্যাকে ভিক্ষু বললেন, 'এখন কি আমরা এখানে থাকব, না অন্য কোথাও চলে যাব ?'

নারী বললেন, 'মন্দকর্মের জন্য সবাই আমাদের নিন্দা করবে। তাই আমাদের দেশে দেশে ঘুরে বেড়ানোই ভালো।'

শিশু ও মদের পাত্র বহন করে স্বামী-স্ত্রী দুজনে চললেন। পথে রাজার সঙ্গে দেখা হওয়ায় রাজা হাতী থেকে নেমে জিজ্ঞাসা করলেন, 'চীবরের মধ্যে কী আছে ? এই নারী কি তোমার ?'

ভিক্ষু বললেন, 'চীবরের মধ্যে শিশু ও (মদের) পাত্র আছে। আর এই নারী আমার স্ত্রী।'

রাজা বললেন, 'আমি যখন আমন্ত্রণ করেছিলাম, তখন তুমি পাপীর কাছে আসবে না বলেছিলে। এখন তুমি বৌ-বাচ্চা সবই করেছ। তুমি নিজেই এক পাপী।'

আচার্য বললেন, 'আমার দোষ নেই, আমাকে অপবাদ দিও না।'

রাজা আবার সেই কথা বলায় আচার্য শিশু ও পাত্রটি মাটিতে ফেলে দেওয়াতে ভূমিদেবী ভয় পেয়ে গেলেন। তাতে মাটি ফেটে জল উঠল। জলের মধ্যে শিশুটি বজ্র হয়ে ও পাত্রটি ঘণ্টা হয়ে দেখা দিল। ভিক্ষু নিজে (চক্র) সম্বর ও নারী বজ্রবরাহী মাতা হয়ে গেলেন।

রাজা ও অনুচরদের সম্মুখে শূন্যে চক্রসম্বর বজ্র ও ঘণ্টা ধারণ করে মাতা-পিতা রূপে উভয়ে দেখা দিলেন।

রাজা ইত্যাদি সকলে শূন্যে মুখ তুলে সমস্বরে প্রার্থনা জানালেন, 'আমাদের শরণ দিন।'

তিনি কিন্তু বজ্রক্রোধ-সমাধি থেকে উত্থিত হলেন না। তখন সমবেত সকলের ডুবে মরবার মতো অবস্থা হলো।

মুহূর্তের মধ্যে আর্য অবলোকিত সেখানে এলেন আর মাটি ফেটে যে জল উঠছিল পা দিয়ে তা আর্যকে দিলেন। রাজা *দেবফল ও তাঁর অনুচররা সবাই নিঃশ্বাস ফেলে বাঁচলেন। আবার তাঁরা গুরুর কাছে প্রার্থনা করায় তিনি *'হুঁং' শব্দটি উচ্চারণ করা মাত্র সব জল অদৃশ্য হয়ে গেল। অনুচরদের নিয়ে রাজা ক্ষমা প্রার্থনা করলেন।

আপনা থেকেই পাথর কেটে আর্যের এক মূর্তি গড়ে উঠল। তাঁর পায়ের তলা

থেকে একটি ক্ষীণ জলধারা আজও বয়ে চলেছে। রাজা ইত্যাদিকে তিনি উপদেশ দিলেন :

'স্বভাবে এক হয়তো ঔষধ আর বিষ
কিন্তু ফল তার দুই।
তাই তার একটিকে গ্রহণ
আর অন্যটিকে করা হয় বর্জন।
যদিও স্বভাবে তারা অভিন্ন।
জানেন এ কথা বিজ্ঞ যাঁরা
ত্যাগ করেন না তাঁরা কিছুই,
শিশু আর মূর্খ যারা
এ জ্ঞান নেই তাদের
তাই ঘুরে মরে তারা সংসারের পঙ্কপাপে।'

রাজা ও অন্যরা সবাই নিন্দা বন্ধ করে সমবেত হয়ে তাঁকে শ্রদ্ধা জানালেন। তিনি অসংখ্য প্রাণীকে মার্গে স্থিত করলেন। সর্বদিকে খ্যাত হলেন আচার্য ডিলবুপা বা ঘণ্টাপা নামে।

পূর্ব জন্মে সেই নারী ছবার আচার্যের শীল ভঙ্গ করেছিলেন, এখন আর একবার শীলভঙ্গ করলেন। আচার্য ধর্মতার দ্বৈত স্বভাবের সব বিকল্প দূর করলেন, নিজ সন্ততি পরিপক ও শুদ্ধ হলো। সেই ক্ষমতাবলে আচার্য মার্গে প্রবেশ করলেন।

সেই পুত্র হলেন স্বয়ং বজ্রপাণি। পূর্বের সেবা পরিচর্যা গুণে সেই নারীরও সকল মল শুদ্ধ হলো।

এমন গুণবানদের আচার্য হলেন *ঘণ্টাপা। তাঁরা উভয়ে (পত্নীসহ) সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

গুরু *ঘণ্টাপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*শেগিপা

*গুরু *শেগিপার কাহিনী।

তাঁর দেশ *ওদন্তপুরী, কুলে চণ্ডাল, গুরু *শবরিপা।

অনেক প্রয়াস করেও সামান্য প্রজ্ঞা লাভ করলেন তিনি। এক সময়ে গুরু

*শবরিপা তাঁর কাছে এলেন। তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক ও সম্পন্ন ও উৎপন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে ধ্যানে বসালেন। তিনি কিন্তু তার অর্থ বুঝতে পারলেন না। তাই গুরুর কাছে প্রার্থনা জানালেন, 'মূল সাধনা আমার দ্বারা সম্ভব হবে না। শরীর ও বচনের শুদ্ধতায় কিছু পুণ্যকাজ আমি করতে পারব।'

গুরু তাঁকে হেরুক বজ্রের মন্ত্র জপ করতে শেখালেন আর বললেন, 'চব্বিশটি মহাতীর্থ ভ্রমণ করে সিদ্ধ হও।'

তিনিও তাই করলেন। বারো বছর সাধনা করায় তাঁর মল শুদ্ধ হলো ও মহামুদ্রার সিদ্ধি লাভ করলেন।

অবদান রচনা করে ও পাঁচ বছরে অনেক প্রাণীহিত করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *শেগিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*চলুকি

*গুরু *চলুকিপার কাহিনী

দেশ *জঙ্গলপুর, কুলে শূদ্র, গুরু *মৈত্রীপা। ঘুম-কাতুরে ছিলেন বলে খাটুনির কাজ করতে পারতেন না। একসময়ে সংসারে কটু কথা শুনে মনের দুঃখে এক গাছের গোড়ায় গিয়ে বসে রইলেন। সেখানে এক যোগী এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে বসে তুমি কী করছ?'

*চলুকি বললেন, 'সংসার কর্ম থেকে মুক্তি পাবার জন্য আমি ধর্মসাধনা করতে চাই; কিন্তু ধর্মদেশন করতে পারেন, এমন গুরুর সন্ধান পাই নি। আপনি আমাকে ধর্মদান করুন। তবে ঘুম কমানোর উপায় যদি না বলেন, তাহলে কোন কাজ হবে না।'

যোগী *মৈত্রীপা বললেন, 'অতিনিদ্রা ও সংসারের কর্ম থেকে মুক্ত করবার জন্য আশীর্বাদ ও অভিষেক যা আছে, তাই আমি তোমাকে উপদেশ দেব।' বলে (চক্র) সম্বরের অভিষেক দিলেন।

তারপর অগভীর সম্পন্নক্রমের উপদেশ—(প্রাথমিক পর্যায়ের) নাড়ী ও বায়ুর দীক্ষা এইভাবে দিলেন:

'এই সমগ্র দৃশ্য জগৎকে নিজের কায়া-বাক্-চিত্ত এই তিনের মধ্যে সংহত কর। ললনা এবং রসনাকে মধ্যমা অবধূতীতে প্রবেশ করাও। এইভাবে তোমার দেহের *অবধূতীকে সরোবর এবং জ্ঞানকে হংস বলে কল্পনা কর।

সেই সরোবরের মধ্যে বিচরণশীল হংসকে কল্পনা কর। এতে তোমার ঘুম কমে যাবে আর অবধূতীকে বায়ুতে প্রবেশ করালে নির্বিকল্প হংস জাত হবে।'

এই বলে উপদেশ দিলেন। সেইভাবে সাধনা করে ন বছরে তাঁর মলশুদ্ধ হলো, মহামুদ্রার সিদ্ধি লাভ করলেন তিনি :

'বাহ্যজগতের ধর্মসমূহ সমাহিত হোক তোমার
কায়-বাক্-চিত্তে,
সমাবিষ্ট আছে তিন ধমনীতে গ্রাহ্য-গ্রাহক ও অকল্প
এই দুটিকে সম্মিলিত কর মধ্যমায়
তারপর তাকে ভাব : যেন সমুদ্রে
বিজ্ঞান-হংস আহরণ করে নির্যাস।'

এই অবদান উক্তির পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *চলুকি-র বিবরণ সমাপ্ত ॥

*গরুড়

*গুরু *গরুড়ের কাহিনী।

*গরুড় মানে পাখিমারা। দেশ *টিসুনগর, পাখিমারা কুলে জন্ম।

সব সময় তিনি জাল নিয়ে পাখি শিকার করতেন। এক সময়ে এক যোগী তাঁর কাছে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কুলপুত্র, তুমি কী করছ?'

পাখিশিকারী বললেন, 'পূর্ব কর্মফলে পাখিশিকারীর কুলে জন্ম আমার। বাঁচার তাগিদে হিংস্র হয়ে সর্বদা প্রাণীহত্যা করতে হয়, এটাই আমার দুঃখ।'

যোগী বললেন,

'কর্ম ও কর্মজাত এই মহাদুঃখ।
ক্রমে বেড়ে হবে দুঃখপরম্পরা।
সদ্ধর্ম নিত্যপুণ্য,
কর তার সাধনা।'

তিনি বললেন, 'গুরু, আমি এক জালধারী, এই পাপীর প্রতি আপনার মহাকরুণা জাত হয়েছে, আপনার উপদেশ অনুসারে চেষ্টা করলেও কি সিদ্ধি হবে না ?'

যোগী তাঁকে প্রভাব-সঞ্চরণ অভিষেক দিলেন এবং তাঁর আলম্বন অনুযায়ী একালম্বন উপদেশ দিলেন।

'সংসারে যত রকম শব্দ আছে তাকে পক্ষীকূজন বলে ধ্যান কর। পক্ষীকূজন এবং নিজ জ্ঞানের আলম্বন এই দুইকে এক বলে ধ্যান কর।'

'চিত্তকে কর ধ্বনিরহিত
সুমধুর কোকিলকূজন, জেনো
তবুও নানা শব্দ হয়ে ওঠে একটি শব্দ ;
সেই শব্দকে গ্রহণ কর শব্দ বলে
আর ব্যাপক ধর্মতা-স্বভাবের কর ধ্যান।'

*গরুড়ও সেইভাবে ধ্যান করলেন ; সর্ব শব্দের ধ্বনি ও শূন্যতায় যে কোন ভেদ নেই, এই উপলব্ধি জাগল তাঁর।

ন বছরে তাঁর চিত্ত মলশুদ্ধ হলো, তিনি মহামুদ্রার সিদ্ধিলাভ করলেন। অনেক অবদান-উক্তি করলেন আর একশ বছর তিনি সংসারে থাকলেন। অপরিমেয় প্রাণীহিত করে তিনশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *গরুড়ের বিবরণ সমাপ্ত ॥

*গুরু *লুচিক-র কাহিনী।

*লুচিক অর্থে যিনি হাঁটুর উপরে ভর দিয়ে বসে হঠাৎ লাফিয়ে উঠতে পারেন, এমন ব্যক্তি।

পূব দিকের *ভংগল দেশের ব্রাহ্মণ। মানুষের জীবনের নশ্বরত্বের কথা জেনে তাঁর মনে খুব দুঃখ হলো। সংসারের কাজকর্মে তাঁর আর মতি রইল না। নির্জন জায়গায় গিয়ে ধর্মকর্ম করবেন বলে স্থির করলেন।

কিন্তু উপদেশ দিতে পারেন, এমন কাউকে পেলেন না, তখন উপদেশ দিতে পারেন এমন এক গুরুর সন্ধান করবেন, ভাবলেন।

সেই সময় এক যোগী সেখানে এলেন। খুশি হয়ে তিনি যোগীকে প্রণাম করায় যোগী জিজ্ঞাসা করলেন, 'কেন তুমি আমাকে প্রণাম করছ?'

তিনি বললেন, 'সংসার-কর্মে মতি নেই আমার, তাই ধর্মকর্ম করব বলে ভেবেছি। কিন্তু উপদেশ দিতে পারেন, এমন গুরু পাই নি। এতদিনে আমি গুরুর দর্শন পেয়েছি, আমাকে উপদেশ দান করুন।'—এই প্রার্থনা জানালেন।

সম্বরের অভিষেক ও চিত্তোৎপাদের উপদেশ তাঁকে দিলেন যোগী।

যত্ন করে তিনি বারো বছর ধ্যান করায় উৎপন্নক্রম ও সম্পন্নক্রম চিত্তোৎপাদের এই যুগনদ্ধ রূপ উপলব্ধি করলেন। সিদ্ধিলাভ করে তিনি *লুচিক বলে খ্যাত হলেন।

'কোন ভিন্নতা নেই সংসার ও নির্বাণে;
তবে মোক্ষই মহাসুখের;
কিন্তু ক্ষুদ্রতায় আবদ্ধ যে
তার পক্ষে পার হওয়াই দুষ্কর।'—

স্বমুখে এই উপদেশ দিলেন, তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

আকাশ থেকে অবদান বিবৃত করতে লাগলেন, তারপর তিনি অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

*গুরু *লুচিক-র বিবরণ সমাপ্ত॥

*নগুণ

*গুরু *নগুণ-র কাহিনী।

*নগুণ অর্থে যার গুণ নেই।

পূর্ব দেশে শূদ্রকুলের এক পরিবারে এক ছেলে হলো। ঘটা করে তার জাতকরণ উৎসব করা হলো।

ছেলেটি বড় হলেন, কিন্তু নিদ্রা ও আলস্যের দরুন সংসারের কোন কাজকর্মের কথাই চিন্তা করলেন না।

'ভালো-মন্দ কোন কাজেই লাগে না, এরকম ছেলে হওয়ার চেয়ে একটা ফল

হলেও তো ভালো ছিল। সেটা বরং পাওয়া যেত।'—এই বলে সবাই একবাক্যে তাঁর নিন্দা করতে লাগল। মন খারাপ করে বিজনে গিয়ে রইলেন তিনি।

এমন সময় এক যোগী তাঁর কাছে এলেন, বললেন, 'নগর থেকে পিণ্ড ভিক্ষা করে এনে আমাকে ভোজন দাও।'

উত্তর দিলেন তিনি, 'আমার সময় নেই।' বলে মাটি থেকে উঠলেন না।

করুণা হওয়ায় যোগী তাঁকে ভোজন দিলেন আর জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী গুণ আছে তোমার?'

তিনি বললেন, 'যোগী, আমার নাম দেওয়া হয়েছে নগুণ, যথার্থই আমার কোন গুণ নেই।' এই বলে মাটিতে শুয়ে শুয়েই খাবার খেলেন তিনি।

তাঁকে দেখে যোগী বললেন, 'তোমার কি মরণে ভয় নেই?'

'ভয় হলেই বা কী উপায়!' তিনি উত্তর দিলেন।

'যদি সাধনের ক্ষমতা থাকে, তাহলে উপায় বলতে পারি।'—যোগী বললেন।

'যদি শুয়ে শুয়ে করা যায়, তবে চেষ্টা করতে পারি।'

যোগী তাঁকে অভিষেক দিয়ে দৃশ্য ও শূন্যতা এই দুয়ের যুগনদ্ধ ভাবনার উপদেশ দিলেন,

'গ্রাহ্য গ্রাহক সিদ্ধ নয় কিছুই
এ ধারণা নেই প্রাণী সকলের;
দুঃখপীড়িতের প্রতি করুণা
তাও আদিতে অসিদ্ধ।
দৃশ্য আর শূন্যতা যে অভিন্ন
অন্তর থেকে জাত হোক এই প্রভাস্বরতা
তারপর পাগলের মতো আচরণ করে
বেগে সঞ্চরণ কর নগরে নগরে।'

এই উপদেশ অনুযায়ী তিনি ভিক্ষা চাইবার সঙ্গে সঙ্গে সাধনা করতেন। তার ফলে যুগনদ্ধ প্রভাস্বরতার জ্ঞান লাভ করলেন, সিদ্ধিও পেলেন।

তিনি চারিদিকে ঘুরে বেড়াতেন। লোকে যখন তাঁকে জিজ্ঞাসা করত, 'কে আপনি?' তখন লোকেদের দেখে তিনি কাঁদতেন।

'আহা, কী দয়া, কী করুণা!' এই বলে লোকেও কাঁদত।

ভক্তরা যাঁরা যোগ্যপাত্র ছিলেন তাঁদের তিনি দৃশ্য ও শূন্যতার অভিন্নতার

পথ প্রদর্শন করলেন। তারপর সমুদ্রে যেমন নৌকা ভেঙে যায়, সেইরকম ভ্রমের সকল কারণ বিনষ্ট করলেন।

শেষে মহামুদ্রার সিদ্ধি লাভ করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন তিনি।

*গুরু *নগুণ-র বিবরণ সমাপ্ত ॥

*জয়ানন্দ

*গুরু *জয়ানন্দের কাহিনী।

*ভংগল দেশের রাজার এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন। এক সময়ে সেই ব্রাহ্মণ ধর্মচক্রে প্রবেশ করে গুহ্যমন্ত্রে সিদ্ধ হলেন; কিন্তু আশীর্বাদ যে পেলেন এ কথা অন্যরা জানতে পারল না।

তারপর সব সময়ে তিনি অনেক বলি (পাখিদের আহার) দিতেন। অন্য মন্ত্রী তা সহ্য করতে না পেরে রাজাকে বলে দিলেন।

রাজা তাঁকে বন্দী করে লোহার শিকলে বেঁধে রাখলেন।

সেই ব্রাহ্মণ মন্ত্রী বললেন, 'রাজার মুষ্টি পরিমাণ ধনসম্পত্তিও আমি নষ্ট করি নি, আমাকে লৌহ শৃঙ্খল থেকে মুক্তি দিন।'

রাজা কর্ণপাতও করলেন না সে অনুনয়ে।

তারপর বলির সময় পাখিরা এসে আহার না পেয়ে রাজার প্রাসাদের উপর জড়ো হয়ে আক্রমণ শুরু করল। লোকের মাথা লক্ষ্য করে তারা আঘাত করতে লাগল।

তখন এক পক্ষী-ভাষা-বিশারদ মানুষ শুনতে পেলেন পাখিরা বলছে, 'আমাদের পিতৃ-মাতৃতুল্য ব্রাহ্মণকে রাজা কারারুদ্ধ করেছেন।'

তিনি গিয়ে রাজাকে এ কথা বলায় রাজা বললেন, 'এমন হলে সে সত্যচারণই করেছে।' বলে তাঁর কাছে ক্ষমা চাইলেন; আর পাখিরা যেন ফিরে যায় এই অনুরোধ করলেন।

ব্রাহ্মণ পাখিদের বলাতে তারা ফিরে গেল। এই ঘটনায় মন্ত্রীর প্রতি রাজার খুব শ্রদ্ধা হলো। রাজা প্রতিদিন কুড়ি খল (প্রায় সাড়ে সাত মণ) পরিমাণ ধান বলি ইত্যাদি দেবার জন্য (মন্ত্রীকে) দিলেন।

তখন থেকে তিনি (মন্ত্রী) গুরু *জয়ানন্দ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। তিনি স্বমুখে উচ্চারণ করলেন :

'আমার গুরুর কৃপায় সহজ জ্ঞান
পরিণত হয়েছে সম্যক জ্ঞানে,
করব মন্ত্রীত্ব উত্তম মহাসুখের ;
করব না সংসারের দাসত্ব আর।
স্বয়ংদীপ্ত ধর্মতা রাজ
বিনাশ করবেন গ্রাহ্য-গ্রাহক শত্রুদ্বয়কে,
মন নেই আমার সংসারে আর।
হে অজ্ঞান জীবগণ,
ওহে, বল সবে
*জয়, জয়।'

শেষে অনেকে প্রাণীহিত করে, সাতশো বছর পরে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *জয়ানন্দের বিবরণ সমাপ্ত ॥

*পচরিপা

*গুরু *পচরিপার কাহিনী।

দেশ *চম্পক, কুলে পিষ্টক-বিক্রেতা।

এতো গরীব ছিলেন যে গায়ে *কটুল ছাড়া আর তাঁর কোন কাপড় ছিল না।

এক ধনী গৃহস্থের কাছ থেকে পিষ্টক নিয়ে বিক্রি করে তাতে যেটুকু লাভ হতো তাই দিয়ে জীবিকা চালাতেন তিনি।

একদিন ঘিয়ে ভাজা একটি পিঠে নিজে তিনি খেতে পেলেন। অর্ধেক খাওয়ার পরে আর্য অবলোকিতেশ্বর এক ভিক্ষুর ছদ্মবেশে তাঁর কাছে এলেন।

তাঁর শ্রদ্ধা হওয়ায় নমস্কার করে পিঠের বাকি অর্ধেক তিনি আর্যকে দিলেন।

আর্য বললেন, 'এটা তুমি কোথা থেকে পেয়েছ ?' তিনি সত্য কথাই বললেন।

'তাহলে আমরা দুজনে গৃহস্থ ও গুরুর কাজ করব। আমি গৃহস্থকে ধর্মকাজের উপদেশ দেব।'

সেই ব্যক্তিও মণ্ডল রচনা করে পুষ্পার্ঘ্য ইত্যাদি দিলেন।

ছদ্মবেশীও তাঁকে শরণগমন, চিত্তোৎপাদ ইত্যাদির আশীর্বাদ দিলেন ষট্-অক্ষর মন্ত্রের উপদেশ দিলেন। তিনিও ভিক্ষাজীবী হয়ে ভক্তিভরে সাধনা করতে লাগলেন।

সেই সময় আগের সেই পিঠের মালিক এসে বলল, 'ওর দাম আমাকে দাও।'

'আমার কাছে কিছু নেই'—বলায় সে তাঁকে ধরে মারতে লাগল।

তখন তিনি চেঁচিয়ে বললেন, 'আমি একা খাই নি, আচার্য ও আমি দুজনে মিলে খেয়েছি, একা আমাকে মারছ কেন?'

তারপর চারদিক থেকে সেই একই বাক্য ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হতে লাগল দেখে তিনি বিস্মিত হয়ে গেলেন। 'আমার পিঠে তোমাকে দিয়ে দিচ্ছি, নিয়ে চলে যাও'—বলে তিনিও দেবমন্দিরে গিয়ে নিজের ইষ্টদেবতার কাছে পিঠের দাম চাইলেন। একশো তোলা সোনা পেয়ে তাই নিয়ে আগের গৃহস্থকে পিঠের দাম দিয়ে দিলেন।

পূর্বসংস্কারের আচরণ তাঁর যা কিছু ছিল, তাও শুদ্ধ হয়ে গেল।

'আমার গুরু আর্য যিনি, তিনি ওখানে আছেন'—ভেবে *পোতল গিরিতে যাবার উদ্যোগ করলেন। মাঝখানে পথে এক কাঁটাগাছে পায়ে কাঁটা ফুটে খুব যন্ত্রণা হওয়াতে আর্যকে স্মরণ করে তিনি চিৎকার করে কাঁদতে লাগলেন।

আর্যও সশরীরে দর্শন দিয়ে বললেন, 'আমি তোমার গুরু। তুমি আর কিছুর প্রার্থী হয়ো না। ফিরে গিয়ে ভক্তদের নেতৃত্ব কর।'

তিনিও উৎফুল্ল হয়ে আকাশে উঠে গেলেন এবং তারপর *চম্পকে ফিরে গেলেন। এই দেখে সবাই খুব আশ্চর্য হয়ে গেলেন ও উপদেশ প্রার্থনা করলেন। তিনিও সকলকে দৃশ্য ও শূন্যতার অভিন্নতা বিষয়ে উপদেশ দিলেন।

সেই সময় থেকে *গুরু *পচরিপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন। পরে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *পচরিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*চম্পকপা

*গুরু *চম্পকপার কাহিনী।

দেশ *চম্পক, ফুলের নামে নাম। সে দেশের রাজপুত্র রাজ্যগ্রহণের উপযুক্ত হলেন

তিনি ত্রিসম্পন্ন ছিলেন, ধনৈশ্বর্যেরও কোন অভাব ছিল না। যৌবনমদে মত্ত হয়ে তিনি রাজ্যসুখে নিমগ্ন হয়ে ছিলেন, পরজন্মের চিন্তা করতেন না।

রাজা হয়ে তিনি *চম্পক পুষ্পোদ্যানে এক চমৎকার ঘর তৈরি করে তার মধ্যে থাকলেন, বালিস-তাকিয়া ইত্যাদিও *চম্পকের। স্বর্ণাভ বর্ণ ও সুগন্ধের মধ্যে এইভাবে বাস করতে লাগলেন।

এক যোগী তাঁর কাছে পিণ্ড চাইতে এলেন। রাজাও পাদপ্রক্ষালন, আসন ও জলদান করলেন। যোগী রাজাকে ধর্মদেশন করলেন। রাজাও সব অনুচরদের নিয়ে তাঁকে পূজ্য বলে গ্রহণ করলেন।

একদিন রাজা বললেন, 'হে যোগী, আপনি তো দেশ-দেশান্তরে ঘুরেছেন। এমন ফুল আর আমার মতো রাজা আর দেখেছেন কি?'

যোগী বললেন,

'চাঁপা ফুলের গন্ধ চমৎকার।
তোমার শরীর থেকে জাত অন্য মল
(সেই সুগন্ধে) ঢাকা পড়ে যায়।
রাজ্য তোমার অন্য রাজার চেয়ে যদি বা বিশিষ্ট
কিন্তু মৃত্যু যখন আসবে
সে রাজ্য তখন যাবে না তোমার সঙ্গে।'

এ কথার (সত্যতা) নির্ধারণ করে রাজা দেহের প্রতি আসক্তিতে বিমুখ হলেন; আবার তাঁর কাছে উপদেশ চাইলেন।

যোগী প্রথমে কর্মফলের উপদেশ দিলেন তারপর অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের মার্গে দীক্ষা দিলেন।

রাজার বিকল্প ছিল কুসুম—তাই এই ধ্যান তিনি করতে পারলেন না। যোগী তখন তাঁর বিকল্পকে কাজে লাগিয়ে সেইমতো উপদেশ দিলেন:

'দৃশ্যবস্তু সবই শূন্য
গুরুর উপদেশের কুসুমে
আসীন হোক নিজ চিত্ত ভ্রমর।
অনাস্রব, অমৃত, মধু এই তিনকে
একই স্বভাব বলে
সাধনা করলে জাগবে মহাসুখ,

একেই ছয় বজ্রধরের আদেশ
জেনে কর ধ্যান ।'—

এই উপদেশ দিলেন ।

তিনিও সেই উপদেশ অনুসারে বারো বছর সাধনা করলেন । উপদেশ, স্বচিত্তের অবস্থা ও অনুভব এই তিনকে অভিন্ন কল্পনা করে ধ্যান করে রাজা সিদ্ধ হলেন ।

সেই সময় থেকে তিনি *চম্পক নামে খ্যাত হলেন ; রানীদের ও অগণিত অনুচর সবাইকে ধর্মদেশন করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন ।

*গুরু *চম্পকপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*ভিক্ষণপা

*গুরু *ভিক্ষণপার কাহিনী ।

নাম *ভিক্ষণ বা দ্বিদন্ত পাঠান্তরে ভিক্ষা করে যে ।

সালিপুত্র দেশের শূদ্রকুলের এক ব্যক্তি । তাঁর ধনসম্পত্তি, সমৃদ্ধি শেষ হয়ে গেল, তখন তিনি গ্রামে নগরে ভিক্ষা করতে লাগলেন । একসময়ে ভিক্ষা না পেয়ে দুঃখিত মনে এক নির্জন জায়গায় গিয়ে বসে রইলেন ।

সেখানে এক (ডাকিনী) এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'এখানে তুমি কী করছ ?'

তিনিও সত্য কথা বললেন ।

'কামনা করে যা চাইবে, তা পাবার উপায় আমার কাছে আছে'—ডাকিনী বললেন ।

'তাহলে আমাকে দিন ।' তিনি প্রার্থনা জানালেন ।

'কিন্তু দক্ষিণা কী দেবে ?' বললেন ডাকিনী । (আর কিছু না থাকায়) উপরে নীচে একটি করে দাঁত রেখে অন্য সব দাঁত দান করলেন ।

তাঁর একাগ্রতা ও অকপটচিত্ততা জেনে ডাকিনী তাঁকে অভিষেক দিলেন—প্রজ্ঞা ও উপায়ের যুগনদ্ধ রূপের উপদেশ ।

তিনিও সাত বছর ধ্যান করে সত্য দর্শন করলেন । অনেক অনাস্রব গুণ প্রাপ্ত নিজে অবদান রচনা করলেন ।

ভক্তদের হিতের জন্য গ্রামে ও নগরে ঘুরে *ভিক্ষণ নামে খ্যাত হলেন। তারপর সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *ভিক্ষণপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*তেলিপা

*গুরু *তেলিপার কাহিনী।

*সতপুরী দেশে এক তেলি তেল বিক্রি করে জীবিকা নির্বাহ করতেন। তাঁর তেল বিক্রির কাজ খুব ভালভাবে চলত, ফলে তিনি বৈশ্রবণের (কুবেরের) মতো ধনী হলেন। সব কামগুণের ঐশ্বর্য তিনি ভোগ করতেন। চুরাশি ব্যঞ্জন, বারো রকমের খাদ্য, পাঁচ রকমের পানীয় তিনি পানাহার করতেন। রাজার অজ্ঞাতেই তিনি এমনি প্রচুর ধনসম্পদ ভোগ করছিলেন।

সেই সময় *পণ্ডিত *ভহন নামে একজন সেখানে এলেন। তিনি সংসারের দোষ ও তার থেকে মুক্তির মন্ত্র গাইছিলেন। তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা হওয়ায় তেলি তাঁর কাছে ধর্মপ্রার্থনা করলেন ও তাঁকে পূজ্যগুরু বলে গ্রহণ করলেন।

তাঁকে এক সময় তেল তৈরির কাজ করতে দেখে (পণ্ডিত) বললেন, 'কল্প কল্পান্ত ধরে তুমি তেল পেষাইএর কাজ করছ বলে তোমার মুক্তি আসছে না।'

'গুরু এই ভাবেই যাতে মুক্তি পাই, তার উপায় প্রার্থনা করি'—বললেন।

তাকে অভিষেক দিয়ে নিমিত্ত-স্বতঃ প্রকাশের এই উপদেশ দিলেন,

'স্বকায়রূপী তিল দিয়ে
পেষণ কর বিকল্পরূপী তেল।
ঢালো তাকে চিত্তের পাত্রে,
দৃশ্য আর শূন্যতার শলাকা দিয়ে
বিদ্যাজ্ঞানের আগুন জ্বালো
ত্যাগ করো অবিদ্যার অন্ধকার
অনুত্তর সুখের মোক্ষে
অনাস্রব সুখে স্থিত হও।'

এই উপদেশ অনুসারে সযত্নে সাধন করে তিনি ছ'বছরে উৎপন্ন ও সম্পন্ন উভয় ক্রমের সিদ্ধি পেলেন।

তখন নিজের দেহ থেকে আলো বিচ্ছুরিত হয়ে তাঁর সবদিক ভরে গেল। এই খবর রাজার কাছে গেল। রাজা লোক পাঠালে দেখা গেল তিনি সেইভাবেই বসে আছেন।

'অনাস্রব সুখের চেয়ে ঐশ্বর্যবান রাজার সুখ বেশি নয়।' তাঁর এই উপদেশে সকলের শ্রদ্ধা জাগল। তিনিও তাঁদের আশা ও অধ্যাশয়ের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে উপদেশ দিলেন।

অনেক বছর পরে অনুচরদের নিয়ে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *তেলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কুমোরিপা

*গুরু *কুমোরিপার কাহিনী।

ভোট ভাষায় মাটির কাজ জানে, কুমোর। *জোমনশ্রী নামে দেশে এক কুমোর ছিলেন। বরাবর তিনি মাটির কাজ করে জীবিকা চালাতেন, তাঁর মনে তাই খুব দুঃখ ছিল। একদিন এক যোগী তাঁর কাছে এসে পিণ্ড চাইলেন, তিনিও পিণ্ড দিয়ে বললেন,

'গুরু, অনেক পরিশ্রম করে আমার এ কাজ আমি করি, কিন্তু তাতে কোন লাভ নেই। কোনদিন শেষও হবে না এ কাজ, তাই আমার মনে এতো দুঃখ।'

*কুমোরকে যোগী বললেন, 'হে দানপতি, তুমি কি বুঝতে পারছ না যে সংসারী জীবের দুঃখ বিনা সুখ নেই! অনন্তকাল ধরে অশেষ দুঃখ ছাড়া আর কিছু নেই, এতে কে না দুঃখী হবে?'

তাঁর শ্রদ্ধা হওয়াতে সেই গুরুর কাছে মুক্তির উপায় প্রার্থনা করলেন।

গুরু বললেন, 'হ্যাঁ, উপায় আছে।' বলে তাঁকে অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পন্ন ক্রমের উপদেশ দিলেন দোহায়:

'অবিদ্যার মাটি দিয়ে
দূর কর ক্লেশ-বিকল্পের পংক।
সংসার চক্রের
ছটি কুলকে কুমোর-এর জ্ঞানের
অগ্নি দিয়ে জ্বালাও।'

বিকল্পের স্বরূপ ব্যাখ্যা করে তিনি এই উপদেশ দিলেন। তা হৃদয়ঙ্গম করে ছমাস *কুমোরিপা সাধনা করলেন। সংসারের ভ্রান্তির মন শুদ্ধ করে সিদ্ধি লাভ করে সমাধিস্থ হলেন।

তখন তাঁর ঘটের চক্র নিজের থেকে ঘুরতে লাগল আর কুম্ভ তৈরি হতে লাগল। তাই দেখে সেই নগরের মানুষরা তাঁর বিশেষ গুণপ্রাপ্তির কথা জানতে পারল। তিনি *গুরু *কুমোরিপা নামে খ্যাত হলেন।

তিনি চর্যা রচনা করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কুমোরিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*চর্পরিপা

*গুরু *চর্পরিপার কাহিনী।

*মগধ দেশের অন্তর্ভুক্ত এক জায়গায় এক বিরাট ধনী ছিলেন। জাতিতে তিনি গোয়ালা। তাঁর এক হাজার মহিষ, ও অগণিত ঘোড়া, ভেড়া ইত্যাদি ছিল। বাবার মৃত্যুর পরে তিনি বিরাট আড়ম্বর করে তাঁর সৎকার করলেন, বিপুল আয়োজন করে শ্রাদ্ধশান্তিও করলেন। দেশের সব লোকজনকে নিমন্ত্রণ করে অনেকদিন ধরে প্রচুর ভোজন, দান-দক্ষিণা ইত্যাদি দিলেন।

একদিন পুরুষরা সবাই গঙ্গায় স্নান করতে গেলেন। ঘরসংসার দেখাশোনার কাজে স্ত্রী রইলেন, তাঁদের ছেলেটির বয়স তিন বছর, মা ও ছেলে দুজনে থেকে গেলেন।

সে সময় কেউ জানে না *চর্পরিপা কোথা থেকে সেখানে এসে ভোজন চাইলেন। সেই বৌটি অকপটে সত্য কথা বললেন।

*চর্পরিপা বললেন, 'তোমার স্বামী ইত্যাদিরা যদি রাগ করে তাহলে তুমি আমার কাছে এসো। আমি ঐ দিকের বনে আগুন জালিয়ে বসে আছি। রাগ না করলে তুমি এখানেই থাকো আর আমাকে আহার সহ দান কর।'

তিনিও গুরুর কথা শুনলেন, গুরু নিজের জায়গায় ফিরে গেলেন। বৌটিও খুশি মনে বসে রইলেন।

লোকজন সব ফিরে এল। শাশুড়ীও এলেন। রান্নার কিছু অবশিষ্ট পড়ে আছে দেখে তাঁরা খুব রেগে গেলেন। সেই বৌটি তখন তাঁর ছেলেকে কোলে নিয়ে

যোগীর কাছে পালিয়ে গেলেন। সেখানে গিয়ে উপস্থিত হলে *চর্পরিপা "ভালো" বলে মন্ত্রজল ছিটিয়ে দেওয়াতে মা ও ছেলে দুজনেই এক সঙ্গে পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন, তাঁদের আর খাদ্য ইত্যাদির প্রয়োজন রইল না।

ঘরে ফিরে এসে স্বামী জিজ্ঞাসা করলেন, 'ওরা কোথায়?' তাদের কোন খোঁজ পেলেন না। তিনিও সবাইকে জিজ্ঞাসা করতে করতে যোগীর কাছে এলেন। আর যোগীও তাঁকে সব কথা বললেন। তারপর মন্ত্রপূত জল ছিটিয়ে দিলেন, (স্বামীও) আগের দুজনের মতোই পাথরের মূর্তি হয়ে গেলেন।

যোগী তাঁদের তিনজনকে এক সঙ্গে রেখে দিলেন। আত্মীয় স্বজনদের মধ্যে দু একজন আসায় তাঁদেরও এই রকম করে দিলেন। তারপর পথ হারানো মহিষ-শাবকের মতো একে একে তিনশো জন এসে পড়লেন। তাঁদেরও একই দশা হলো।

সেই বৌএর ছেলেটি এক রকম বিশেষ গুণ পেল : তার অণ্ডকোষ থেকে খেচরসিদ্ধি, লিঙ্গ থেকে সোনায় পরিণত করার রস, গুহ্যদ্বার দিয়ে রসায়ন ও চোখ থেকে শূন্যগামী আটজন সিদ্ধ বেরিয়ে এলেন।

চারিদিকে এইভাবে খ্যাত হওয়ায়, *চম্পকের রাজা *মহেল ইত্যাদি বহু মানুষ সেখানে দেখতে এলেন। রাজার শ্রদ্ধা হওয়ায় বাবা-মা (ছেলে) তিন জনের এক মন্দির তৈরি করলেন, তিনশো লোকের জন্যও এক মন্দির নির্মাণ করলেন। বহু নামে সেই মন্দিরের খ্যাতি হল।

সেই মন্দিরের ভিতরে কুবুদ্ধি নিয়ে কোন লোক ঢুকতে পারত না। তারা এলেই পাথরের মূর্তিগুলি তাদের প্রহার ইত্যাদি শুরু করত।

সেই সাধন স্থানের আকর্ষণে এখনও পর্যন্ত বহু যোগী সেখানে থাকেন বলে শোনা যায়। সেখানে সাধনা করলে সিদ্ধি লাভও খুব তাড়াতাড়ি হয়। এখানে সংসারের লোকরা সিদ্ধ হয়ে জিন মৈত্রেয়-র শাসন পর্যন্ত থাকছেন ও প্রাণীহিত করছেন।

*গুরু *চর্পরিপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*মণিভদ্রা

*গুরু *মণিভদ্রা বা যোগিনী *বহুরির কাহিনী।

*অগরচে নামের নগরে এক ধনী গৃহস্থের তেরো বছরের এক মেয়ে ছিল। নিজের কুলের রীতি মেনে তিনি মেয়ের বিয়ে দিয়েছিলেন। পরে সেই মেয়েটি এসে বাবা-মায়ের কাছে ছিলেন।

*গুরু *কুকুরিপা এসে সেই মেয়ের কাছে আহার চাইলেন। মেয়ে বললেন, 'এমন সর্বাঙ্গসুন্দর হয়ে এইভাবে ভিক্ষা করে বেঁচে আছেন কেন? কাপড়ই বা কে সেলাই করে? নিজের কুল অনুযায়ী গৃহিণী করতে পারেন না?'

গুরুর মুখ থেকে এই বাণী উচ্চারিত হলো,

'সংসারের ভয়ে ভীত আমি,
সাধনা করছি মুক্তির মহাসুখের
যদি এই পুণ্য আশ্রয়
লাভ করতে না পারি
তাহলে পরে কী ভাবেই বা তা মিলবে আমার!
এই পুণ্য আধার মহারত্নে যদি
আশ্রয় নেয় অশুচি পত্নী।
তাহলে কামনা-বাসনা দমনে উদয় হবে নানা দুঃখের,—

এই জেনেই আমি গৃহসঙ্গিনীর কামনা ছেড়েছি।' এই বাণী শুনে মেয়েটি শ্রদ্ধা ভরে গুরুকে পিণ্ডদান করলেন আর বললেন, 'আমাকে এক মুক্তির উপায় দান করুন।'

'শ্মশানে আমার বাস, তাহলে সেখানে এসো।'

সব কাজকর্ম ভুলে রাতে পালিয়ে শ্মশানে গেলেন সেই কন্যা। গুরুও তাঁকে যোগ্য পাত্র বুঝে সম্বরের অভিষেক দিলেন। উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম যুগনদ্ধের উপদেশ দিয়ে সাতদিন সেইভাবে অরণ্যে সাধনা করালেন।

তারপর তাঁর বাবা-মায়ের কাছে ফিরে গেলে তাঁরা তাঁকে মারতে লাগলেন, গালমন্দও করলেন।

কন্যা বললেন, 'এই ত্রিলোকে এমন কেউ নেই যিনি আমার মা-বাবা নন। জাতি ও কুলে শ্রেষ্ঠ হলেও সংসার থেকে পরিত্রাণ পাওয়া যায় না। আমার গুরুর শরণ নিয়ে আমি মুক্তির সাধনা করেছি। মারলেও আমি মার্গপথে সবাইকে নিয়ে যাব।'

এই কথা শুনে কিছুটা শ্রদ্ধা হওয়ায় তাঁরাও আর কিছু বললেন না।

তিনিও গুরুর উপদেশ ধ্যান করে সংসারের সব কাজে বিমনা হয়ে এক বছর কাটালেন। তাঁর স্বামী এসে 'চল' বলায় স্বামীর ঘরে ফিরে গেলেন। তারপর সংসারের কাজকর্ম যেভাবে করা দরকার করতে লাগলেন, শরীরে ও বাক্যে সংযত ও মধুরভাষিণী হয়ে রইলেন। ক্রমে পরিবার বেড়ে দুটি ছেলেমেয়ে হলো। তারা মায়ের মতই (সর্বগুণে গুণী) হলো। 'কুলপুত্রের এমনই হওয়া উচিত'—সকলে এই বলে প্রশংসা করতে লাগলেন। গুরুর সঙ্গে দেখা হওয়ার পরে এইভাবে বারো বছর কেটে গেল।

একদিন জল আনতে গেলেন তিনি, বাড়ি ফেরার পথে গাছে পা আটকে গিয়ে কলসি ভেঙ্গে গেল আর তিনিও সেখানে বসে থাকলেন। অর্ধেক দিন কেটে গেল, বাড়ি ফিরলেন না। তখন সেখানে গিয়ে দেখা গেল, তিনি ভাঙ্গা ঘটের দিকে তাকিয়ে বসে আছেন। কথা বললেও কিছুই তাঁর কানে ঢুকল না, একই ভাবে তাকিয়ে বসে রইলেন। সকলে বলতে লাগল, 'একে ভূতে ভর করেছে।' সূর্য তখন অস্ত যাচ্ছে, কন্যা তখন বলতে লাগলেন,

'জীব সমূহ অনাদি কালের
দেহের ঘট ভেঙে গেলে
ঘরে ফিরে গিয়ে কী হবে ?
আমার ঘট আজ ভেঙে গেছে।
ফিরব না আর তাই
সংসারের ঘরে, যাবো
আমি মহাসুখের দ্বারে।
হে আমার গুরু ;
আমার কামনার সেই আশ্চর্য মহাসুখ
দাও আমায়।'

এই বলে তিনি আকাশে উড়ে গেলেন ; তারপর একুশ দিন ধরে *অগরচে মানুষদের ধর্মদেশন করে সশরীরে *খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *মণিভদ্রার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*মেখলা

*গুরু *মেখলার কাহিনী।

*দেবীকোট দেশে এক গৃহস্থের দুটি কন্যা ছিল আর এক সওদাগরের ছিল দুই ছেলে। তাদের সঙ্গে দুই মেয়ের বিয়ের সম্বন্ধ হলো।

সে জায়গার সবাই মেয়ে দুটির নিন্দা করত। মেয়ে দুটি কিন্তু নিন্দা করার মতো কোন কাজ করে নি। নিন্দা শুনে ছোট মেয়ে বললেন, 'কোন কারণ নেই, তবুও এরকম নিন্দা হচ্ছে। আমাদের অন্য জায়গায় চলে যাওয়া ভালো।'

বড় মেয়ে বললেন, 'যেখানেই যাই না কেন ভাগ্য যাদের খারাপ তাদের এর চেয়ে ভিন্ন কিছু হবে না। তাই এখানে থাকাই ভালো।'

এ কথা বলার সময়ে গুরু *কাহ্নপা নামে এক যোগী সেখানে এলেন। তাঁর সঙ্গে সাতশ যোগী, যোগিনী, অনুচর ছিলেন। স্পর্শ করা যায় না এমন উঁচু ছাতা তাঁদের মাথার উপরে ঘুরছিল, আপনা থেকেই অনাহত ডমরু ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হচ্ছিল। এমনি অগণিত গুণমণ্ডিত হয়ে তিনি সেখানে এলেন।

সেই মেয়ে দুটি বললেন, 'দেশের লোকে এমন কি স্বামীরাও আমাদের দুজনের নিন্দা করে। এই গুরুর কাছে উপদেশ নিয়ে আমাদের সাধনা করা দরকার।'

আগের কথা বলে তাঁর কাছে তাঁরা উপদেশ প্রার্থনা করলেন।

গুরুও সম্মত হয়ে তাঁদের অভিষেক, দর্শন, সাধন, চর্যার যুগনদ্ধ ফল বজ্রবারাহীর রূপে দীক্ষা দিলেন। তাঁরাও যত্ন করে সাধনা করায় বারো বছরে সিদ্ধি লাভ করলেন। তারপর গুরুর কাছে গিয়ে প্রণাম ও অর্চনা করে পূর্বের কথা বলে কৃতজ্ঞতা জানালেন।

গুরু বললেন, 'তোমরা কে? তোমাদের তো আমি চিনি না।' পূর্বের ঘটনা নিবেদন করায় গুরু বললেন, 'তাহলে আমার দক্ষিণা চাই।'

'গুরু, আপনি যা চাইবেন, তাই আমরা দেব।'

'তাহলে তোমাদের দুজনের মস্তক দাও'—বললেন গুরু।

'গুরু যা ইচ্ছা করেন, তাই নিবেদন করব।' বলে তাঁরা দুজনে নিজের নিজের মুখ থেকে তীক্ষ্ণ কঠিন জ্ঞান-তরবারি বার করে দেহের শ্রেষ্ঠাংশ মস্তক কেটে দান করলেন।

গাইলেন:
'গুরুর কৃপায় আমরা দুজনে
উৎপন্ন-সম্পন্নের যুগনদ্ধ দিয়ে

ছেদন করেছি সংসার নির্বাণের মায়া—
আত্ম-পর এই প্রপঞ্চ মুক্ত হয়েছি
ধর্মতা ও সংবিত্তির যুগ্মতা দিয়ে।'

'আমরা যে বিকল্পমুক্ত হয়েছি, তার নিদর্শন স্বরূপ আপনাকে অর্পণ করছি'—বলে তাঁরা নিজেদের মাথা কেটে নৃত্য করতে লাগলেন।

'হে মহাযোগিণীদ্বয়, পরম উত্তম গুণপ্রাপ্তিতে তোমরা পুণ্যবতী হয়েছ। নিজের শান্তি ও সুখকে তুচ্ছ করে তোমরা প্রাণীহিতের জন্য ধর্মাচরণ কর।' *কাহ্নপার এই উক্তির সঙ্গে সঙ্গে তাদের কাটা মাথা আবার জুড়ে গেল; কোন ক্ষতচিহ্নও রইল না।

এই অদ্ভুত ঘটনায় সকলে অবাক হয়ে গেল। 'ছিন্নমস্তা দুই বোন' নামে তাঁরা খ্যাত হলেন। *কাহ্নপার চরণ আশ্রয় করে দুজনে মহামুদ্রার সিদ্ধি পেলেন। অনেক বৎসর প্রাণীহিত করে ও অবদান উক্তি করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

জ্যেষ্ঠা কন্যা *গুরু *মেখলার বিবরণ সমাপ্ত॥

*কনখলা

*গুরু *কনখলার কাহিনী।

সিদ্ধ *কাহ্নপা বা কৃষ্ণচার্যের চরণে শরণ নেওয়াও অনুসরণ করার যে কাহিনী আগে বলা হয়েছে সেই ছিন্নমস্তা দুই বোনের এ ছোট বোন।

এঁর জীবনী আগেই বলা হয়েছে। ইনি যোগিনী *কনখলা নামে খ্যাত।

*গুরু *কনখলার বিবরণ সমাপ্ত॥

*কলকল

*গুরু *কলকলপার কাহিনী।

*কলকল বা কোলাহল। *ভিরলির নগরে শূদ্রকুলের এক মানুষ।

পূর্বজন্মের কর্মদোষে তিনি খুব চেঁচামেচি করতেন, লোকে সেজন্য তাঁকে তাড়িয়ে দিল।

মনের দুঃখে তিনি এক শ্মশানে গিয়ে বসে রইলেন। এমন সময়ে এক যোগী সেখানে এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শ্মশানে কিসের জন্য তুমি বসে আছ?'

তিনিও অকপটে পূর্বের কাহিনী বললেন।

'তুমি কি সংসারের দুঃখ শোক থেকে মুক্তির উপায় চাও?'

'অবশ্যই চাই।' বলে তিনি যোগীকে প্রণাম-পূজা ইত্যাদি করলেন।

যোগী তাঁকে গুহ্যসমাজের অভিষেক দিলেন ও স্বয়ংপ্রভ-মুক্তির উপদেশ দিলেন, বললেন :

'অন্তর বাহিরের সব শব্দই
অভিন্ন আর এক স্বভাবের
জেনে কর ধ্যান।
আর ধ্যান কর আকাশের ব্যাপ্তিতে
মেঘের গর্জন আর পুষ্পবৃষ্টিকে
নিজ শব্দ বলে।'

তিনিও খুব যত্ন করে ধ্যান করলেন। অন্যদের ক্রোধজ্ঞাপক শব্দগুলি নিজে নিজেই মিলিয়ে গেল। নিজের শব্দও পুষ্পবর্ষণের মধ্যে মিশে গেল। পুষ্পের কল্পনা আকাশের শূন্যতায় মিশে গিয়ে সর্বদিক আলোকিত হয়ে মহামুদ্রার উদয় হলো।

জ্যোতির্ময়-আত্মমুক্তি লাভ করে সিদ্ধি পেলেন তিনি। সব দিকে গুরু কলকল বা কোলাহলকারী গুরু বলে প্রসিদ্ধ হলেন।

শেষে ভক্তদের অনেক হিত করে অবদান উক্তি করলেন তিনি। তারপর তিনশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কলকলর বিবরণ সমাপ্ত॥

*কন্তলি

*গুরু *কন্তলিপার কাহিনী।

*কন্তলি অর্থে যিনি কাপড় সেলাই করেন।

*মণিধর দেশের এক ঝাড়ুদারের ছেলে। টাকা পয়সা কিছু ছিল না বলে কাপড় সেলাই করে ভিখারির মতো থাকতেন।

এক সময় সেলাই করতে করতে ছুঁচ হাতে ফুটে রক্ত পড়ল। অসহ্য যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে একদিকে বসে রইলেন।

ডাকিনী *বৈতলি এক নারীর রূপ ধারণ করে সেখানে এলেন। 'তুমি এখানে কী করছ?'—জিজ্ঞাসা করলেন। তিনি আগে যা ঘটেছে তা বললেন। ডাকিনী বললেন, 'তুমি পূর্বজন্মে এর চেয়েও বেশি দুঃখভোগ করেছ, পরজন্মে বার বার এর চেয়েও বেশি দুঃখভোগ করতে হবে। দুঃখের স্বভাব থেকে কেউ নিষ্কৃতি পেতে পারে না।'

প্রার্থনা করে বললেন তিনি, 'এর থেকে আমাকে মুক্তির উপায় বলে দিন।'

'তুমি কি সে সাধনা করতে পারবে?'—ডাকিনী বললেন।

'কেন পারব না।'—বলায় ডাকিনী তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক দিলেন। অপরিমেয় গুরুযোগ ও উৎপন্নক্রমের দীক্ষা দিলেন। সাধনা করতে গিয়ে তিনি বুঝতে পারলেন, দর্জির বিকল্প তাঁর যায় নি। তখন গুরু তাঁর বিকল্প অনুযায়ী উপদেশ দিলেন তাঁকে :

'শূন্যতার আকাশ ঝাড়ু দাও,
স্মৃতি এবং বিদ্যার সূতো দিয়ে
করুণার ছুঁচে বস্ত্র সমূহ সেলাই কর
এবং এই ভাবনা ব্যাপ্ত কর সমগ্র ত্রিলোকের
জীবের মধ্যে।'

তিনিও এইভাবে ধ্যান করে সর্বধর্মের শূণ্যতা উপলব্ধি করলেন। এবং এই জ্ঞান নেই যে প্রাণীদের তাদের প্রতি অপার করুণা জাগল তাঁর। পরিণামে এই উভয়ের যুগনদ্ধরূপ মহামুদ্রার পরমসিদ্ধি লাভ করলেন। সবদিকে *কন্তলিপা নামে বিখ্যাত হলেন।

অনেক প্রাণীহিত করে ও বহু অবদান-উক্তি করে তিনি সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কন্তলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*ধহুলিপা

*গুরু *ধহুলিপার কাহিনী ।

*ধেকর দেশে শূদ্র কুলের ব্যক্তি । ঘাসের দড়ি পাকিয়ে জীবিকার জন্য বিক্রি করতেন ।

এক সময় দড়ি পাকাতে পাকাতে হাতে ফোস্কা পড়ে প্রচণ্ড যন্ত্রণা হলো তাঁর ; কাঁদতে কাঁদতে তিনি একদিকে গিয়ে বসে রইলেন ।

এক যোগী এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমার কী কষ্ট ?'

তিনি আগে যা ঘটেছে, বললেন । বচন দিলেন (যোগী) : 'তুমি এখন সামান্য দুঃখ সহ্য করতে না পেরে কাঁদছ, পরে আরও দুর্গতি হলে কী করবে ?'

'এর থেকে পরিত্রাণের উপায় কী ?' তিনি জিজ্ঞাসা করলেন ।

তখন তাঁকে যোগী প্রথমে প্রভাব-সংক্রমণ অভিষেক দিলেন, তারপর বিকল্প-মার্গে নীত করবার উপদেশ এইভাবে দিলেন :

'দৃষ্টি সংস্কারের কুশ
আর শূন্যের পরিকল্পনা
প্রথম থেকেই এই দুটি অসিদ্ধ
এই আদ্যন্ত অসিদ্ধ স্বভাব
কিন্তু শক্তিমান—
নিরন্তর কর সেই ধ্যান ।'

এই উপদেশ অনুসারে তিনি পরম ধৈর্য্যের সঙ্গে বারো বছর ধ্যান করলেন ।

সব কল্পনার অস্তিত্বহীনতা, পরতন্ত্রের প্রতীত্যসমুৎপাদ, পরিনিষ্পন্ন ধর্মতার অভিন্ন স্বরূপ—এই তিনের প্রত্যক্ষ জ্ঞান তিনি লাভ করলেন । পরম সিদ্ধি পেয়ে চারিদিকে তাঁর নাম *গুরু *ধহুলিপা নামে প্রসিদ্ধ হলো ।

সাতশো বছর ধরে ভারতের প্রান্তে প্রান্তে ঘুরে তিনি প্রাণীহিত করে উপদেশ দিলেন ; তারপর পাঁচশো অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন ।

*গুরু *ধহুলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*উধিলি /*উড়লি

*গুরু *উধিলিপার কাহিনী।

*উধিলি অর্থাৎ যিনি ওড়েন। দেবীকোট নামের দেশে বৈশ্য কুলের একজন। পূর্বের (জন্মের) দানের ফলে খুবই ধনী হয়েছিলেন।

নিজের সুন্দর গৃহের অভ্যন্তরে পঞ্চকামগুণ ও সম্পদে তিনি আসীন ছিলেন। এমন সময় আকাশে পাঁচ রংএর মেঘ জমল, মেঘে বিভিন্ন প্রাণীর চেহারার মতো আকার দেখা গেল। সেই আকাশে হাঁসদের উড়তে দেখে তিনি ভাবলেন, 'আমি যদি এরকম উড়তে পারতাম, তাহলে কত আনন্দই না হতো!' এই ভাবনায় অন্য কাজকর্ম ভুলে গেলেন তিনি।

সেই সময় গুরু কর্ণরিপা এসে পিণ্ড চাইলেন। 'যোগীকে পিণ্ডদান নিশ্চয়ই করব, কিন্তু আমাকে আকাশে উড়বার ক্ষমতা দিন।' এই প্রার্থনা জানিয়ে যোগীকে অপর্যাপ্ত পানভোজন, দান, দক্ষিণা নিবেদন করলেন।

গুরু বললেন, 'আমার কাছে আছে।' বলে 'চার বজ্রাসনের' অভিষেক দিলেন আর দীক্ষা দেবার সময় এই উক্তি করলেন—

'চব্বিশটি তীর্থস্থানে চব্বিশ রকমের ওষুধ আছে, সেখানে গিয়ে প্রত্যেক ডাকিনীর মন্ত্র দশ হাজার বার জপ করে একটি করে ওষুধ আনো।'

'সে কাজ শেষে হলে কী করব?'

'প্রথমে তামার পাত্রে, তারপর রূপোর পাত্রে তারপর সোনার পাত্রে রাখবে—তাহলে তুমি আকাশে বিচরণের ক্ষমতা পাবে।'

তিনিও বারো বছর ধরে সাধনায় ওষুধগুলি সেইভাবে রাখলেন। সেই কাজের ফলে আকাশে উড়লেন বলে *উধিলি নামে সর্বত্র খ্যাত হলেন। অবদান রচনা করে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *উধিলি (উড়িলি)-র বিবরণ সমাপ্ত॥

*কপাল

*গুরু *কপাল-র কাহিনী।

*কপাল অর্থে ললাট। *রাজপুরী নামের দেশে শূদ্রকুলের এক শ্রমজীবীর

পাঁচটি পুত্র ছিল। পূর্ব কর্মের (দোষে) তাঁর স্ত্রী মারা গেলে তাঁর মৃতদেহ শ্মশানে নিয়ে যাওয়া হলো। তিনি সেখানে বসে কাঁদতে লাগলেন।

তারপর তাঁর ছেলেরা সব মরে গেল, লোকেরা এসে তাঁকে সে খবর দিল। তাদের সবার মৃতদেহ শ্মশানে এনে তিনি সেখানে বসে বসে কাঁদতে লাগলেন।

যোগী কৃষ্ণাচার্য সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে বসে কী করছ ?'

তিনি বললেন, 'যোগী, আমার স্ত্রী ও সব কটি ছেলে হারানোর শোকে আমার বুক ফেটে যাচ্ছে, তাই শবগুলির (মায়া) ছাড়তে না পেরে এখানে বসে আছি।'

'ত্রিলোকের সকল প্রাণীরই এই স্বভাব, কেবল মাত্র তোমার একার নয়। শোক করে কী করবে ? তাতে কোন ফল হবে না। তাই ধর্মের কাজ কর। সংসারে প্রাণীর জন্ম-মৃত্যুতে তোমার ভয় হয় না ?'

তিনি বললেন, 'জন্ম-মৃত্যুর ভয় তো পাই, তার থেকে মুক্তির উপায় যদি থাকে, বলুন।'

গুরু তাঁকে হে বজ্রের মণ্ডলে অভিষেক ও উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে চর্যা-আচরণে প্রবেশ করালেন। ছেলেদের অস্থি দিয়ে ছটি অংলকার তৈরি করে তাঁকে পরালেন। স্ত্রীর মাথা কেটে পাত্র তৈরি করালেন। কপালটা উৎপন্নক্রম ও তার শূন্য স্থানটি সম্পন্নক্রম এই উপদেশ দিলেন।

তিনিও চর্যা আচরণ সাধন করে ন বছরে যুগনদ্ধ (উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম) আয়ত্ত করলেন। সিদ্ধি লাভ করে ভক্তদের বললেন,

'কপাল যোগী আমি,
কপালের মতোই জেনেছি
সব ধর্মের স্বভাবকে।
সেই ক্ষমতায় উৎপন্ন চর্যায়
স্থিত আমি।'

এই উপদেশ দিয়ে শূন্যে নৃত্য করতে লাগলেন। লোকের শ্রদ্ধা হলো। গুরু *কপাল নামে প্রসিদ্ধ হলেন। নিজের অবদান রচনা করলেন। তারপর পাঁচশ বছর ধরে প্রাণীহিত করে শেষে ছশো অনুচরসহ সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কপালপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*কিরপল

*গুরু *কিরপলের কাহিনী।

*গ্রহর নামে নগরে সে রাজ্যের এক রাজা ছিলেন। তাঁর রাজ্য ছিল বহুবিস্তৃত। বিশাল রাজ্য থাকায় তিনি ছিলেন কুবেরের মতো ঐশ্বর্যবান। তাতেও তাঁর কামনা পরিতৃপ্ত না হওয়ায় তিনি অন্য এক রাজার রাজ্য লুণ্ঠন করে সেই সম্পদ ভোগ করতে লাগলেন। তারপর আর একটি রাজ্য আক্রমণ করলেন।

সেখানে যারা বাস করত, তাদের মধ্যে যাদের পালাবার ক্ষমতা ছিল, তারা পালিয়ে গেল। মেয়েরা যারা পালাতে পারে নি, তাদের জয় করলেন। তাদের ক্রন্দন ইত্যাদি রাজা শুনলেন। মন্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করায় তিনিও এই আক্রমণের কাহিনী বললেন। রাজার এতে খুবই দুঃখ হলো। করুণা জাত হওয়ায় ভাবলেন, 'আহা, এদের খুবই শোচনীয় অবস্থা হয়েছে। এদের পতি-পিতা ইত্যাদির সন্ধান করে নিজেদের সংসারে বাস করতে দাও।'—এই আদেশ দিলেন। মন্ত্রীও সেইরকম করলেন।

নিজের জায়গায় ফিরে গিয়ে রাজা দান করার জন্য বড় একটা ঘণ্টা বাজালেন। শেষ হয় না—এমন প্রচুর দান করলেন। তারপর ভাবলেন, 'এখন ধর্মকাজ করা দরকার।'

যখন তাই ভাবছেন, তখন এক যোগী এসে রাজার কাছে ভোজন চাইলেন। তিনিও পর্যাপ্ত পরিমাণে দান করলেন। যোগী রাজাকে চার-অপ্রমাণ ইত্যাদি ধর্মদেশন করলেন।

রাজা বললেন, 'এই জীবনে বোধিলাভ করতে পারি, এমন উপদেশ দান করুন।' যোগী তাঁকে সম্বরের অভিষেক দিয়ে উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রম উভয়ের ধ্যানে প্রবেশ করালেন।

কিন্তু তাঁর পূর্ব সংস্কারবশে রাজ্য, সেনানী, যুদ্ধ ইত্যাদির বিকল্প (ধ্যানের) পথরোধ করছিল। তিনি যাতে নিজের এই বিকল্প থেকে মুক্তি পেতে পারেন, যোগী তার উপদেশ দিলেন:

'ত্রিলোকের সকল প্রাণীকে ভাব বীর
সেনানী বলে আর
আকাশের মতো ব্যাপ্ত তোমার চিত্ত থেকে
জাত হচ্ছে অপ্রমেয় বীরদল—

এই দুইকে অভিন্ন করে
দেখো। জয় কর তোমার শত্রুদের।
হে মহারাজ! তুমি
সাধনায় লাভ কর এই জয়ের আনন্দ,
উত্তীর্ণ হও জীবের সর্বোত্তম শীর্ষে।'

(রাজাও) বারো বছর ধ্যান করে এই সত্যদৃষ্টির জ্ঞান লাভ করলেন। তখন রাজার নিজের প্রাসাদ জ্যোতিতে পূর্ণ হলো। তিনি সিদ্ধিলাভ করেছেন জেনে রানী প্রভৃতিও তাঁকে পূজা করলেন।

তিনি এই উপদেশ দিলেন:

'অপ্রমেয় চতুর্বর্গের প্রাণীদের প্রতি
আচরণ কর ভালবাসার—
তাহলে ধ্বংস হয়ে যাবে মহাক্রোধী বীর, আর
নিঃশেষ হবে তোমার সকল শত্রু।'

গুরু *কিরপাল নামে খ্যাত হলেন তিনি। অবদান রচনা করে সাতশ বছর ধরে প্রাণীহিত করলেন। তারপর ছ শ অনুচর নিয়ে তিনি খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কিরপাল-এর বিবরণ সমাপ্ত॥

*সকর (পাঠান্তরে সাগর)

*গুরু *সকর-র কাহিনী।

*কাঞ্চী দেশে *ইন্দ্রভূতি নামে এক রাজা ছিলেন। তিনি চার লক্ষ নগর শাসন করতেন। এই মহারাজের কোন পুত্র ছিল না; তাই তিনি লৌকিক ও অলৌকিক সকল দেবতার কাছে প্রার্থনা জানাতেন (সন্তানের জন্য)।

কোন এক সময়ে তাঁর পত্নী সন্তানসম্ভবা হলেন; এই (সংবাদ) জেনে তাঁর খুবই আনন্দ হলো।

(গর্ভধারণের) ষষ্ঠ মাসে রানী স্বপ্ন দেখলেন:

'চন্দ্রকে কাঁধে ঝুলিয়ে নিয়েছেন সূর্য,
শোষণ করছেন সাগর,

ভক্ষণ করছেন সুমেরু,
পদতলে পিষ্ট করছেন ত্রিলোক।'

রাজাকে তার (অর্থ) জিজ্ঞাসা করায় রাজা বললেন, 'আমি জানি না, বুঝতেও পারছি না। পূজ্য পণ্ডিত বা ব্রাহ্মণদের জিজ্ঞাসা কর।'

অনেক দানপূজা ইত্যাদি দিয়ে জিজ্ঞাসা করায় তাঁরা লক্ষণ বিচার করে বললেন, 'ধর্মরাজ্যধর এক বোধিসত্ত্ব রাজা জন্ম নেবেন।' এতে (ভবিষ্যদ্বাণীতে) সাংসারিক লোক সুখী হবে না বলে তাদের খুশি করবার জন্য বললেন, 'ত্রিসম্পন্ন একজন এই পৃথিবীতে জন্ম নিচ্ছেন।' এতে সবাই খুব খুশি হলো।

তারপর ন মাস বা দশ মাস পূর্ণ হলো। তখন গুণ ও কর্মে সিদ্ধ এক মহা-সরোবরে পদ্মের উপর মধ্যরাতে এক সন্তানের জন্ম হলো। সেখানে তখন প্রার্থিত যা কিছু তা বর্ষিত হলো। এই ঘটনায় সবাই হতচকিত হয়ে বললেন, 'কার এমন শক্তি!' অর্ধ দিন কেটে গেলে এই শক্তি কার জানতে পেরে তার সদ্যোজাতের নামকরণ করলেন 'সরোজকুমার'। তাঁর শক্তিতে লোকে কামগুণের সকল সম্পদে সম্পদশালী হলেন।

এই ছেলেটির জন্মের পরে আরো দুটি পুত্রের জন্ম হলো। পিতামাতার মৃত্যুর পরে বড় ছেলেকে রাজ্য দেওয়া হলো। তিনি তা ছোট ভাইকে দিয়ে ভিক্ষু হয়ে গেলেন।

শ্রীধান (ধান্যকটক ?)-এ যাবার পথে অবলোকিতেশ্বর এক ভিক্ষুর ছদ্মবেশে তাঁর সামনে উপস্থিত হলেন। (রাজপুত্র) চিনতে পারলেন না তাঁকে। তিনি (ছদ্মবেশী) ভিক্ষুকে সত্য ঘটনা বললেন।

'তুমি কি সম্ভোগকায়ের দর্শন পেতে চাও?' (ছদ্মবেশী) বললেন।

'আমার তো উপায় জানা নেই, চাইলেই বা কী করে পাব?'

'শ্রদ্ধা করে যদি আমাকে গুরু বলে মানো, তাহলে উপায় আছে।'

প্রণাম বন্দনা ইত্যাদি করে তিনি প্রার্থনা করলেন। (ছদ্মবেশী) তখন হেবজ্রের দেবসমূহের রূপে সাক্ষাৎ দর্শন দিলেন। রাজপুত্রকে অভিষেক দিয়ে উপদেশ দিলেন। তারপর অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

শ্রীধান-এ এসে রাজপুত্র যখন সাধনা করছেন তখন যোগীর মতো এক ব্যক্তি তাঁকে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি কী করছেন?' ভিক্ষুও তাঁকে আগের সব কথা বললেন।

সেই যোগী বললেন, 'তাহলে আমি আপনার সেবা করব। সিদ্ধিলাভ করে আপনি আমাকে উপদেশ দেবেন।'

'ঠিক আছে', বলে তিনি এক শূন্য গুহায় গিয়ে বসে রইলেন।

বারো বছর ধরে (সরোজ) সাধনা করতে লাগলেন, আর সেই ব্যক্তিও তাঁর পরিচর্যা করতে লাগলেন। এর মধ্যে এক ভয়ানক মন্বন্তর হলো—অনেক লোক মারাও গেল। সেই লোকটি ভাবলেন এ কথা জানতে পেলে গুরুর বিশেষ বিঘ্ন হবে, তাই সব গোপন করে গুরুর সেবা করে যেতে লাগলেন। প্রতিদিন তিনি গুরুকে ভোজন নিবেদন করে তাঁর উচ্ছিষ্টমাত্র খেতেন।

একদিন তিনি কোথাও কোন খাবার খুঁজে পেলেন না, শেষে রাজপ্রাসাদে গিয়ে এক পাত্র ভাত পেলেন। তা নিয়ে যখন ফিরে আসছেন তখন গুহায় ঢুকতে গিয়ে হোঁচট খেয়ে পড়ে গেলেন। সব ভাত পড়ে চারিদিকে ছড়িয়ে গেল।

'তুমি মদ খেয়েছ না কি?' ভিক্ষু জানতে চাইলেন। যোগী বললেন, 'মদ কোথা থেকে পাব, অনাহারের ফলে দুর্বল হয়ে পড়ে গেছি।'

'খাবার আন নি কেন? পাও নি কি?' 'আমার গুরুর (সাধনায়) বাধা পড়বে বলে এত দিন বলি নি। বারো বছর ধরে মহামন্বন্তর হওয়ায় অনেক প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে। সকলেরই দুর্দশা খুবই বেড়েছে।'

আচার্য বললেন, 'আমাকে না বলে কোন্ নীতিতে এ কথা গোপন করেছ? দুর্ভিক্ষ যাতে না হয় তার উপায় আমার কাছে আছে।'

'তাহলে বলুন।'

যে ভাতগুলি পড়ে ছড়িয়ে গিয়েছিল সেগুলি জড়ো করে জলের ধারে গিয়ে বলি (পূজার্ঘ) দিলেন। অষ্ট মহানাগকে মন্ত্র, মুদ্রা, সমাধি দ্বারা ক্লিষ্ট করলেন।

তাঁরা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী করতে হবে?'

'জম্বুদ্বীপে অনাবৃষ্টি হওয়ায় বহু প্রাণীর মৃত্যু হয়েছে, সে তোমাদেরই দোষে। তাই এখন প্রথম দিন খাদ্য বর্ষণ কর, সেইভাবে দ্বিতীয় দিন শস্য ও তারপর তৃতীয় দিন বস্ত্র ও শয্যা ও তিন দিন ধরে রত্নবৃষ্টি কর।' সেইভাবে করার পরে তিনি বললেন, 'জলবর্ষণ কর।'

সেই আদেশ পালিত হলো। প্রাণীরা দুঃখ থেকে মুক্তি পেলো। তাঁর খ্যাতিতে সর্বদিক পূর্ণ হয়ে গেল।

'এই শক্তি মহাচার্য সরোজের।' এই বলে সবাই শ্রদ্ধা জানাতে লাগল।

তারপর 'রাম' নামে পূর্বের সেই সেবককে অভিষেক ও উপদেশ দিলেন, তিনিও লোকসিদ্ধিতে সিদ্ধ হলেন।

হেবজ্রের উৎপন্ন ও সম্পন্নক্রমের উপদেশ দিয়ে তিনি (রামকে) বললেন, 'প্রাণীহিত না করে খসর্পণে যেও না। এখন শ্রীপর্বতে গিয়ে এইভাবে সাধনা কর।' এই উপদেশ দিয়ে গুরু খসর্পণে চলে গেলেন।

রামও শ্রীপর্বতের কাছের এক রাজার মেয়েকে স্বশক্তিতে আকর্ষণ করে এনে তাকে বশীভূত করলেন। দুজনে রামের মন্দির ইত্যাদি নির্মাণ করে শেষে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *সকরের (পাঠান্তরে সাগর) বিবরণ সমাপ্ত॥

*সর্বভক্ষ

*গুরু *সর্বভক্ষর কাহিনী।

*সর্বভক্ষ অর্থাৎ যে সব কিছু খায়। *অভুর (পাঠান্তরে অভির) নামে নগরের রাজা ছিলেন সিংহচন্দ্র (পাঠান্তরে হরিশ্চন্দ্র)। শূদ্রকুলের একটি মানুষ ছিলেন সেখানে। তাঁর পেটটি ছিল অত্যন্ত বড়, তাই খাবার দেখলেই খেয়ে ফেলতেন তিনি।

এক সময়ে কোন খাদ্য পেলেন না, তখন খাবারের কথা ভাবতে ভাবতে 'কী করা যায়' বলে বসে রইলেন।

এমন সময় শ্রী *সরহপা সেখানে এলেন; জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে বসে কী করছ ?'

তিনি বললেন, 'আমার পেটে প্রচণ্ড আগুন জলছে, তাকে শান্ত করার মতো খাদ্যবস্তু কিছু নেই। বিশেষ করে আজ কোন খাদ্য না পেয়ে মনের দুঃখে এখানে বসে আছি।'

'পেটের ক্ষুধার জ্বালা যদি এখন সহ্য করতে না পার, তাহলে প্রেত হয়ে জন্মালে কী করবে ?'

'সে আবার কী রকম!'—বললেন তিনি।

'তাহলে দেখ।'—বলে তাঁকে প্রেত দেখালেন।

'এইভাবে জন্মাবার কারণ দয়া করে বলুন।'

কারণ প্রদর্শন করার পরে তিনি বললেন, 'গুরু, এই অবস্থা থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রার্থনা করি।'

তাঁকে প্রথমে অভিষেক দিয়ে *ভুসুকুবৃত্তির উপদেশ দিলেন :

'শূন্য আকাশের মতো উদর
কালাগ্নির মতো জঠরের অগ্নিজ্বালা
দৃশ্য জগৎই খাদ্য-পেয়—
আহার করলে ক্ষয় হবে
সব কিছুই।'—এই ধ্যান করার উপদেশ দিলেন।

তিনিও শ্রদ্ধাভরে ধ্যান করায় সূর্য-চন্দ্র দুজনে ভীত হয়ে সুমেরু পর্বতের ভিতরে গিয়ে লুকিয়ে রইলেন। সমস্বরে লোকে বলতে লাগল, 'আলো নিভে গেছে ; হায়, হায়!'

ডাকিনীরা সবাই মিলে মহাব্রাহ্মণকে অনুনয় করাতে তিনি সেখানে এলেন।

'এখন সবাইকে খেয়ে ফেলেছ, আর কিছু নেই এই ধ্যান কর।'

সেই ভাবে করায় প্রতীতি আর শূন্যতার যুগল স্থিতির অভিন্নতা উপলব্ধি করলেন। সিদ্ধিলাভ করায় সূর্য চন্দ্র আবার উদিত হলো, সব মানুষ তাই উৎফুল্ল হয়ে উঠল।

সেখানে পঞ্চাশ বছরে সিদ্ধিলাভ করে অবদান রচনা করলেন। ছ শ বছর প্রাণীহিত করে এক হাজার অনুচর নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *সর্বভক্ষর বিবরণ সমাপ্ত॥

*নাগবোধি

*গুরু *নাগবোধির কাহিনী।

আর্য নাগার্জুন তখন *সুবর্ণ (পুবণ ?) বিহারে ছিলেন। পশ্চিম ভারতের এক ব্রাহ্মণ—অথচ চোর—তখন সেখানে এসেছিলেন। দরজার ফাঁক দিয়ে দেখতে পেলেন তিনি, নাগার্জুন একটি স্বর্ণপাত্র থেকে প্রচুর ভোজন করছেন। তাই দেখে সেই পাত্রটি চুরি করবার ইচ্ছা হলো তাঁর।

গুরু মনে মনে তা জেনে স্বর্ণপাত্রটি তাঁর সামনে ফেলে দিলেন।

চোর ভাবলেন, 'আমি চুরি করতে চেয়েছিলাম, চুরি করতে হলো না। কিন্তু এটা আমার সামনে কেন ফেলে দিলেন?'

গুরু বললেন, 'আমি নাগার্জুন। পরের হিতের জন্যই আমার এই সব ধনরত্ন। চুরি কোরো না, খাদ্যপানীয় যা চাও, তাই নাও। এই সব খেয়ে এখানে থাকো। যাওয়ার সময় যা চাও, সঙ্গে তাই দেবো।'

গুরুর আচরণে শ্রদ্ধা হওয়াতে চোর ধর্ম প্রার্থনা করলেন। নাগার্জুন তাঁকে গুহ্যসমাজের অভিষেক দিয়ে প্রলোভন যেন আপনা থেকেই চলে যায় এমন উপদেশ দিলেন :

'যা তুমি কামনা কর সে সব কিছু
মাথার উপরে বিশাল শৃঙ্গ বলে
কল্পনা কর।
রত্নের কোন অন্তর্নিহিত স্বভাব নেই,
এক মনে ধ্যান কর তার উজ্জ্বল রশ্মি।'

এই উপদেশ দান করে, রত্ন দান পূর্ণ করলেন গৃহটি আর সেখানে তাঁকে রেখে দিলেন। তিনিও খুব খুশি হয়ে এই উপদেশ ধ্যান করতে লাগলেন।

বারো বছরে শৃঙ্গ বড় হওয়াতে নড়তে চড়তে অসুবিধা হতে লাগল; সেজন্য তাঁরা মনে দুঃখ হলো। সেই সময় গুরু সেখানে এসে জিজ্ঞাসা করলেন, 'শরীর ভালো তো?'

'সুখে নেই' এ কথা বলায় গুরুও কারণ জেনে উপদেশ দিলেন :

'তোমার বিকল্প শৃঙ্গ,
যা তুমি করেছো ধ্যান,
যা বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে
তোমার সকল সুখের
তোমার নিজের প্রলোভন আছে
বলেই (তা ঘটছে)।
দুঃখী সর্বপ্রাণী।
সত্তা বলে আসলে কিছু নেই,
আকাশের মেঘের মতোই তার আবির্ভাব (ক্ষণস্থায়ী)।
উৎপত্তি-স্থিতি-নিরোধ এই তিন
কোনটা যে কার ক্ষতি বা ভালো করছে—

এই ভাবে চিত্ত যার শুদ্ধ
তার কিসেই বা হিত কিসেই বা ক্ষতি।
আদিতেই অসিদ্ধ সব আর
গ্রাহ্য-গ্রাহক আপন স্বভাবেই শূন্য।'

এই উপদেশ দিয়ে তিনি জানালেন শূন্যতাই সকল বস্তুর প্রকৃত স্বভাব।

তাকে ছমাস সমাধিস্থ রেখে সংসার ও নির্বাণের অভিন্নতা উপলব্ধি করিয়ে সিদ্ধিলাভ করালেন।

*নাগবোধি নামে খ্যাত হলেন তিনি। গুরুর উত্তম শিষ্য বলে মনোনীত হলেন।

প্রাণীহিতের জন্য তিনি অষ্টসিদ্ধি লাভ করলেন। 'পাতালগমন, খড়্গ, দমন, হিত সাধন, গুটিকা, অঞ্জন, দ্রুতগমন, রসায়ন,—এই আটটির যেটি ইচ্ছা করা যাবে, তাতেই সিদ্ধি হবে তাঁর'—গুরু এই বললেন আর 'এইভাবে মৈত্রেয়-র শাসন অবধি শ্রীপর্বতে থেকে প্রাণীহিত কর' এই আদেশ দিয়ে রেখে দিলেন তাঁকে। তিনিও এই ভাবে কুড়ি হাজার বছর ছিলেন, বলা হয়।

*গুরু *নাগবোধির বিবরণ সমাপ্ত॥

*দারিকপা

*গুরু *দারিকপার কাহিনী।

*সালিপুত্র নামের দেশে *ইন্দ্রপাল নামে এক রাজা বাস করতেন। তিনি একদিন মৃগয়ায় গিয়েছিলেন। মধ্যাহ্নে সূর্যের তাপ বেড়ে উঠলে তিনি যখন ফিরে যাচ্ছিলেন তখন হাটে যারা এসেছিল তারা সবাই রাজাকে সম্মান জানাতে লাগল।

*লুইপা সেখানে ছিলেন। রাজা তাঁকে দেখে বললেন, 'আপনার মতো মানুষ, দেখতে এত সুন্দর, এমন সুন্দর মুখশ্রীযুক্ত—মাছের অন্ত্রের মতো নোংরা জিনিস আপনি খাবেন না। আহার্য যা আপনার দরকার আমি দেব, অন্য কিছু দরকার থাকলে তাও দেব, রাজ্যের প্রয়োজন হলেও দেব।'

'মৃত্যু ও জরার হাত থেকে বাঁচবার উপায় যদি থাকে, তাহলে তাই আমার চাই', বললেন *লুইপা।

রাজা বললেন, 'তাহলে আমার রাজ্য ও রাজকন্যাকে দান করি।'

'আমার প্রয়োজন নেই।' *লুইপা উত্তর দিলেন।

'কেন প্রয়োজন নেই' ?—রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'রাজ্যে সন্তোষ সামান্যই কিন্তু তার শাস্তি বা যন্ত্রণা অনেক বেশি; তাই আমি ত্যাগ করেছি।'

তাই শুনে রাজা *ইন্দ্রপালেরও রাজ্যে বিরাগ হলো। তাঁর এক ব্রাহ্মণ মন্ত্রী ছিলেন, তাঁকে তিনি বললেন, 'আমি এই সংসারে আর কতদিন রাজমুকুট ধারণ করব ? যথেষ্ট অন্নবস্ত্রের সংস্থান আমার পরিবারের জন্যে রেখে ধর্মে প্রবেশ করব। রাজ্য পুত্রকে অর্পণ করাই ঠিক নয় কি ?' মন্ত্রী বললেন, 'ঠিক হবে।' তখন পুত্রকে রাজ্যভার দিয়ে, রাজা ও মন্ত্রী শ্মশানে *লুইপার কাছে গিয়ে তাঁর দরজায় ধাক্কা দিলেন।

আচার্য বললেন, 'কে ?'

'আমরা রাজা ও মন্ত্রী'—উত্তর দিলেন তাঁরা।

'তাহলে ভিতরে এসো।' বলায় ভিতরে গেলেন।

দুজনকে আচার্য চক্রসম্বরের মণ্ডলে অভিষেক দিলেন। তাঁরা নিজেদের দান করলেন অভিষেকের দক্ষিণা স্বরূপ।

তারপর *ওদেশ নামে অন্য এক দেশে গেলেন। আচার্য ও শিষ্য দুজন—এই তিনজনে পিণ্ড ভিক্ষা করতে লাগলেন। তারপর তাঁরা *বীরপুরী নামের দেশে গেলেন, একে *জিন্তপুরী নগরও বলা হয়। সেখানে তিন লক্ষ মানুষের বাস। সেখানকার দেব মন্দিরে সাত শ নর্তকী বা দেবদাসী ছিল। তাদের প্রধানার দ্বারের কাছে গেলেন। সেখানে তিন শ জনকে (নর্তকীকে) দেখতে পেলেন।

তাঁদের জিজ্ঞাসা করলেন, 'তোমাদের কর্ত্রী মানুষ কেনেন কি ?'

তারা ভিতরে গিয়ে বলায় প্রধানা বললেন, 'কিনবো, তবে দেখে শুনে কিনবো।'

দরজা খুলে তাকিয়ে দেখলেন, সুপুরুষ, আকর্ষণীয় এক তরুণ। দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কত দাম চাই ?'

'একশ তোলা সোনা চাই।'

রাজাকে তাঁরা (অন্য দুজন) বিক্রি করে দিলেন। বললেন, 'রাতে কোনও মানুষের কাছে একে শুতে দিও না, আর একে একলা থাকতে দিও। আর এর দাম মিটে গেলে ফিরিয়ে দিও।' বলে আচার্য ও ব্রাহ্মণপুত্র চলে গেলেন।

রাজপুত্র তারপর সেই *দারিমোর (গণিকার) ঘরে বারো বছর ধরে পা ধোয়ানো, গা মালিশ করা ইত্যাদি কাজ করলেন। গুরুর উপদেশ না ভুলে তিনি এই সব কাজ করতেন।

সবার আগে সব কাজ তিনি সুসম্পন্ন করতেন বলে ভৃত্যদের মধ্যে তিনি সর্বাধিক প্রিয় হলেন।

সেই সময় *দারিমোর কাছে *জনপা বা *কুঞ্চী নামে এক রাজা এলেন, পাঁচশো তোলা সোনা নিয়ে সাংসারিক ভোগ অভিলাষে তাঁর আগমন। আচার্যের পরিচর্যার জন্য প্রতি দিন তিনি সাত তোলা করে সোনা দিতেন।

তারপর কয়েকদিন বাদে একদিন *কুঞ্চীর হজম হলো না, অতি ভোজনে পেটের পীড়া হলো। সেদিন তিনি মাঝরাতে বাইরে বেরোলেন। বাগানের মধ্যে এক জায়গা থেকে অতি সুগন্ধ ও আলোকরশ্মি আসছে দেখে তিনি সেখানে গেলেন। দেখলেন, সেই ভৃত্যকে পঞ্চদশ কন্যা পূজা পরিচর্যা করছেন। তিনি নিজে আসনে বসে আছেন।

এই দৃশ্য দেখে রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন। পরে ঘরে ফিরে এসে সেই বারনারীকে বললেন। তারপর দুজনে আবার গিয়ে পূর্বের দৃশ্যই দেখলেন।

তখন বারনারীর অনুতাপ হলো। তাঁকে প্রণাম ও প্রদক্ষিণ করে বললেন, 'আমরা সামান্য জীব। আপনার মত গুণীকে চিনতে আমরা ভুল করেছি। আপনাকে দিয়ে সেবা করিয়েছি, এতে আমাদের যে পাপ হয়েছে, তা ক্ষমা করুন। আপনার পূজা বারো বছর ধরে করব, অনুমতি দিন।' এই প্রার্থনায় তিনি সম্মত হলেন না।

তারপর বারনারী ও *জনপা অনুনয় করলেন, 'আমাদের আপনার অনুগামী করুন।'

আকাশ থেকে 'শূন্য নগরাবতরণ' নামে তিনি এক উপদেশ দিলেন :

'লৌকিক রাজার আছে ধ্বজা আর
গজ আসন।
আমার রাজ্য বিশিষ্টতর :
ধ্বজা আমার মোক্ষের,
বাহন আমার মহাযান
ত্রিভুবনে আসন পেতে
সম্ভোগ করেন *দারিকপা।—এই উপদেশ।

এই আচার্য *দারিমোর সেবা করতেন। তার ভৃত্য ছিলেন বলে *দারিকপা নামে খ্যাত হলেন। তিনি সাত শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *দারিকপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*পুতলি

*গুরু *পুতলিপার কাহিনী।

*ভংগল দেশে শূদ্র কুলের এক গৃহী ছিলেন। তাঁর কাছে এক গুরুযোগী এসে পিণ্ড চাইলেন। তিনিও প্রচুর পরিমাণে আহার্য দিলেন।

শ্রদ্ধাভরে তিনি গুরুর আশ্রয় নিলেন, গুরু তাঁকে হেবজ্রের অভিষেক ও উপদেশ দিলেন। হেবজ্রের একটি চিত্র দিয়ে তাঁকে বললেন, 'এটি নিয়ে গ্রামে নগরে ভিক্ষা চেয়ে সিদ্ধিলাভ করো।'

তিনিও সেই ভাবে বারো বছর ধরে সাধনা করে সিদ্ধিলাভ করলেন, কিন্তু তার লক্ষণ কেউ জানল না।

একদিন রাজার প্রাসাদে তিনি পিণ্ড চাইতে গেলেন। রাজা দেখলেন সেই চিত্রে রাজার দেবতা (হেবজ্রর) নীচে আসন করে বসে আছেন। দেখে রাজা তাঁকে মারতে গেলেন।

তিনি বললেন, 'এগুলি আমি আঁকি নি। মানুষ এর শিল্পী নয়। দেবশিল্পী এঁকেছেন। এমন আপনিও আঁকতে পারেন, আমার দেবতা আপনার দেবতার নীচে বসে আছেন।'

এ কথার সত্যতা বুঝে রাজা দেবশিল্পীকে দিয়ে ছবি আঁকালেন।

'আমার দেবতার জায়গায় আপনার দেবতাকে এঁকে কী লাভ হবে?'

'কেন?' রাজা জিজ্ঞাসা করলেন।

'আমার দেবতা দেবতার দেবতারূপে আছেন।'—তিনি বললেন।

রাজা বললেন, 'তার প্রমাণ কী?'

'রাজার দেবতাকে উপরে এঁকে দিলেও সকাল বেলা দেখা যাবে তিনি নীচে এসে বসে আছেন।'

'যদি এরকম হয়, তাহলে আমি তোমার শাসনে প্রবেশ করব।'—প্রতিজ্ঞা করলেন রাজা।

সন্ধ্যাবেলায় যোগী আবার সেইভাবে (দেবতাদের অবস্থান) ধ্যান করলেন, তারপর বাইরে তাকিয়ে দেখলেন রাজার দেবতা নীচে বসে আছেন।

রাজা আশ্চর্য হয়ে গেলেন আর তারপরে গুরুর আশ্রয় নিয়ে ধর্মে স্থিত হলেন।

*পুতলিপা নামে তিনি খ্যাত হলেন; পাঁচশ বছর প্রাণী হিতকরে অবদান রচনা করলেন। শেষে ছ শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *পুতলিপার বিবরণ সমাপ্ত ॥

*পনহ

*গুরু *পনহর কাহিনী।

*পনহ অর্থে উপানৎ (অর্থাৎ জুতো)। *সেন্ধনগর নামের দেশে শূদ্রকুলের এক ব্যক্তি জুতো তৈরির কাজ করে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

এক সময়ে শক্তিমান এক য়োগীকে ভিক্ষা গ্রহণ করে দূরের নির্জন শ্মশানে যেতে দেখে তাঁর শ্রদ্ধা হলো, তাই তিনি সেখানে গেলেন।

'তুমি কী জন্য এসেছ?' যোগী জিজ্ঞাসা করলেন।

'ধর্ম প্রার্থনা করি।' তিনি উত্তরে বললেন।

যোগী তাঁকে সংসারের দোষ ও মুক্তির গুণের উপদেশ দিলেন।

এতে তাঁর সংসারে বিরাগ জাত হলো। তিনি বললেন, 'গুরু, আপনার কাছে সংসার থেকে পরিত্রাণের উপায় প্রার্থনা করি।'

তাঁকে আশীর্বাদ ও উপদেশ দিয়ে তিনি বিকল্প অনুযায়ী পথপ্রদর্শন করলেন। বললেন :

'সালঙ্কার উপানৎ (=জুতা) পায়ে
চলে মানুষজন,
ঝংকৃত হয় মধুর শব্দ;
এই শব্দে কর অভিনিবেশ;
সেই শব্দ আর শূন্যতা যে অভিন্ন
কর সেই ধ্যান।'

তার অর্থ বুঝে ধ্যান করলেন। ন বছরে দৃষ্টির মল শুদ্ধ করে সিদ্ধি লাভ করলেন।

গুরু *পনহ নামে প্রসিদ্ধ হলেন। অবদান রচনা করে আট শ বছর প্রাণীহিত করলেন। তারপর আট শ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *পনহর বিবরণ সমাপ্ত।

*কোকিলপা

*গুরু *কোকিলপার কাহিনী।

*চম্পারণ নগরে এক রাজা ছিলেন। গ্রীষ্মকালে গরমের কষ্ট সহ্য করতে না পেরে তিনি আম্রবনের ছায়ায় বাস করতে গেলেন।

সেখানে শীতল পানীয় জল, নানা রঙের সুগন্ধ পুষ্প ও সুস্বাদু ফল ইত্যাদিতে তুষ্ট হয়ে আম্রকুঞ্জে কিংখাবের আসন ও তাকিয়ায় আসীন হয়ে রইলেন সেই রাজা। রাজপুত্র প্রভৃতি সবাই তাঁর পরিচর্যা করত। অনেক তরুণী মিলে কেউ তাঁর দেহমর্দন করত, কেউ পাখার হাওয়া করত, কেউ গান গাইত, কেউবা নৃত্য করত, কেউ কেউ পুষ্প চয়ন করত।

রাজ্যে কামগুণের আসক্তিতে মনুষ্যজন্ম তিনি যখন ব্যর্থ করছিলেন তখন এক সম্যক শুদ্ধ ভিক্ষু তাঁর কাছে এলেন। দ্বারে প্রায় তিন শ জন প্রতিহারী তাঁকে ভিতরে প্রবেশ করতে দিল না। সে কথা শুনে রাজা বললেন, 'ভিতরে আসুন।'

তিনি এলে (রাজা) তাঁকে আহার্য ইত্যাদি দিলেন। তারপর জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনার ধর্ম ও আমার ধর্মের মধ্যে কোন্‌টি সুখের?'

ভিক্ষু বললেন, 'শিশুর দৃষ্টিতে তোমারটা ভালো, আর পণ্ডিতের দৃষ্টিতে তা বিষযুক্ত।'

রাজা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কী কী কাজ বিষময়?'

ভিক্ষু তখন তাঁকে ত্রিবিষের বর্ণনা দিলেন। রাজ্যে এই বিষেরই মিশ্রণ, পরিণামে তাই দুর্গতিই হবে। যেমন বিষমিশ্রিত পানাহার স্বাদু হলেও তার পরিণামে মৃত্যু।

রাজা বিশিষ্ট কুলের লোক ছিলেন। তাই তিনি গুরুর আশ্রয় নিয়ে উপদেশ প্রার্থনা করলেন। গুরু তাঁকে চক্রসম্বরের উপদেশ দিলেন ও মার্গ প্রদর্শন করলেন। রাজাও তাঁর পুত্রকে রাজ্য সমর্পণ করে সব কিছু ত্যাগ করতে পারলেন। কিন্তু আম্রকুঞ্জের কোকিলের কূজনে তাঁর মন আসক্ত ছিল বলে ধ্যানের পথে মন যাচ্ছিল না।

সেই বিকল্পের বাধা দূর করবার জন্য মুক্তির এই উপদেশ দিলেন গুরু :

'শূন্য আকাশে জমে ওঠে
বজ্রনাদী মেঘদল,
নামে অবিশ্রান্ত বৃষ্টিধারা,
তাই পুষ্ট হয়ে ওঠে খেতের শস্য।
তেমনি তোমার শূন্য কানে,
বজ্রধ্বনির মতো হোক কোকিল কূজন।
জেনো, বিজ্ঞান-বিকল্পের মেঘ থেকে
ঝরে ক্লেশবিষের ধারা,
বিকশিত হয়ে ওঠে রাগদ্বেষের পল্লব—
এই শিশুর স্বভাব বর্জন করেন
পণ্ডিতরা।
চিত্তের এই শূন্য স্বভাব থেকে
শব্দ ও শূন্যতার অভিন্ন বজ্রধ্বনি
বাজে,
পুঞ্জীভূত হয় অক্ষয় মহাসুখের মেঘ,
স্বতঃ উজ্জ্বল স্বভাবের বারিধারায়
পল্লবিত হয়ে ওঠে পঞ্চ জ্ঞানের ফসল।
হে জ্ঞানী, মহা আশ্চর্য এই।'

এই উপদেশ নিয়ে তিনি ছ মাস ধ্যান করে সিদ্ধিলাভ করলেন। *কোকলিপা নামে খ্যাত হয়ে অনেক প্রাণীহিত করলেন ও শেষে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *কোকলিপার বিবরণ সমাপ্ত।

*অনংগ

*গুরু *অনংগ-র কাহিনী।

*গহুর দেশে শূদ্রকুলের মানুষ। পূর্ব (জন্মের) ক্ষান্তি ধ্যানের ফলে অতি সুন্দর আকৃতির ছিলেন। অন্যরা তাঁর দিকে চেয়ে দেখত বলে তাঁর মনে অহংকার হলো।

এমন সময়ে শান্ত, বিনীত, ভদ্রচর্যার এক ভিক্ষু পিণ্ডের জন্য তাঁর কাছে

এলেন। পিণ্ড চাইলে (সেই শূদ্রটি) বললেন, 'ভিতরে আসুন। আমি এক দিনের ভোজন আপনাকে দেব।' বলে তাঁর পা ধুইয়ে, আসন বিছিয়ে নানা রকমের খাদ্য ও পানীয় দিলেন।

তিনি বললেন, 'আর্য, নিজের জন্য পিণ্ডভিক্ষা ইত্যাদি কষ্টকর কাজ কেন আপনি করছেন?'

উত্তরে ভিক্ষু বললেন, 'সংসার-ভয় থেকে পরিত্রাণের আশায় আমি এভাবে করছি।'

'আর্য, আমাদের দু'জনের আশ্রয় (যার উপরে আমরা নির্ভর করে আছি)—তাতে খুব পার্থক্য আছে কি?'

'পার্থক্য এই যে তোমার অহংকারযুক্ত আশ্রয়, তাই তাতে গুণধর্ম জাত হয় না, আর আমার আশ্রয় শ্রদ্ধা, তাই অপরিমেয় গুণ উৎপন্ন হয়।'

'আর্য, তাহলে গুণের তাৎপর্য কী?'

'এ জীবনে ধর্মকে যাঁরা আশ্রয় করেন, মানুষ বা অমানুষ কেউই তাঁদের বাধা সৃষ্টি করতে পারে না।' এই বলে বুদ্ধকায় প্রাপ্তি, সংসার ও সংসার পারের গুণাবলী তিনি ব্যাখ্যা করলেন।

'কী করে এই গুণাবলী পাওয়া যাবে, তার উপায় বলে দিন।' তিনি প্রার্থনা জানালেন।

'মাটি খোঁড়া, কেনা-বেচার কাজ করা ইত্যাদি সাংসারিক কাজ করতে পারবে কি?' তিনি জানতে চাইলেন।

'এই সব করতে পারি না।' বললেন তিনি।

'তাহলে আসনে বসে ধ্যান করতে পারবে কি?'

'পারব।'—বলায় ভিক্ষু তাকে সম্বরের অভিষেক দিয়ে স্বয়ংপ্রকাশ ষষ্ঠ সম্ভারের উপদেশ দিলেন:

'যা কিছু দৃশ্য প্রতীতি
তাই তো মনের স্বভাব,
অস্তিত্বহীন সব কিছুই।
আপন আপন স্থানে রাখ ষষ্ঠবর্গকে;
থাকো অবিচল
কামনাহীন। অনিরোধ
সেই রসে থাকো অচঞ্চল।'

তাঁকে এই উপদেশ দিয়ে ছ মাস ধ্যান করালেন। সিদ্ধি লাভ করে *গুরু *অনংগপা নামে প্রসিদ্ধ হলেন। অনেক প্রাণীহিত করে শেষে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *অনংগপার বিবরণ সমাপ্ত॥

*লক্ষ্মীংকরা

*গুরু *লক্ষ্মীংকরার কাহিনী।

*ঔরজন দেশের *সম্ভোল (নগরে) আড়াই লক্ষ মানুষ বাস করত। সেই দেশের রাজা *ইন্দ্রভূতির এক ভগ্নী ছিলেন। বিশিষ্ট কুলের সেই তরুণীর অনেক গুণ ও ক্ষমতা ছিল। মহাসিদ্ধ লাবপা (কম্বলপা) ইত্যাদির কাছে তিনি অনেক ধর্ম শুনলেন, অনেক তন্ত্রে পণ্ডিত হলেন।

*লংকার রাজা *জলেন্দ্র তাঁর পুত্র *সংমোল-এর (?) সঙ্গে *লক্ষ্মীংকরার বিয়ের প্রস্তাব করলেন। (লক্ষ্মীংকরার) ভাই *ইন্দ্রভূতিও বিয়ে দিতে রাজি হলেন। বোনকে নেবার জন্য দূত এলো।

অপরিমেয় ধনসম্পত্তি উপহার নিয়ে, অনেক ধার্মিক অনুচর সঙ্গে নিয়ে *লক্ষ্মীংকরা *লংকাপুরীতে এলেন। অশুভ নক্ষত্র ছিল বলে তখন রাজপ্রাসাদে তাঁর অভ্যর্থনা হলো না।

সেই সময় বোন সে দেশের মানুষদের দেখতে পেলেন আর তাদের সকলেই অবৌদ্ধ জেনে মনে দুঃখ হলো তাঁর।

রাজপুত্রের অনুচররা মৃগয়া থেকে ফিরছিল, অনেক মাংস নিয়ে। *লক্ষ্মীংকরার সামনে তারা এলো। তিনি ওদের দেখে বললেন, 'এরা সবাই কে? কে এদের মেরেছে? এরা কোথা থেকে এল? কোথায়-ই বা যাচ্ছে?'

'মৃগয়া থেকে এসেছে। তোমার স্বামী রাজা এদের পশু হত্যা করবার জন্য পাঠিয়েছিল।'

সে কথা শুনে ভরা পেটে খাবারের কথা শুনলে যেমন হয় তেমনি তাঁর মন অত্যন্ত বিরূপ হয়ে গেল।

'ধর্মপ্রাণ রাজা আমার ভাই; এমন তীর্থিকদের কাছে কেমন করে আমাকে পাঠালেন!' —ভেবে তিনি চেতনা হারালেন।

তারপর জ্ঞান ফিরে এলে নগরবাসীদের ধনরত্ন উপহার দিলেন, অনুচরদের

নিজের অলংকার ইত্যাদি দিয়ে দেশে ফেরৎ পাঠিয়ে দিলেন। অন্যদের বললেন, 'কাউকে আমার কাছে পাঠাবে না।' তারপর একা ঘরে বসে শরীরে তেলকালি মেখে, চুল খুলে, নগ্ন হয়ে বেরিয়ে এসে পাগলের ছল করতে লাগলেন, কিন্তু গূঢ় অর্থ (সাধনার পথ) থেকে বিচলিত হলেন না।

রাজা ইত্যাদি সকলের এতে খুব দুঃখ হলো। তাঁরা চিকিৎসক ডেকে ওষুধের ব্যবস্থা করলেন। সেই কন্যা কিন্তু সেখানে যারা এল, সবাইকে হাত তুলে মারতে লাগলেন। তাঁরা ভাই-এর কাছে দূত পাঠালেন। সংসারে তাঁর মন বিমুখ হয়েছে নাকি এই ভেবে তাঁর (ভাই-এর) মনে মনে আনন্দ হলো।

সেই নারী তখন থেকে পাগলের ব্রতেই নিরত থাকলেন। লংকাপুরীর সকলের উচ্ছিষ্ট ভোজন করে শ্মশানে শুয়ে থাকতেন ; কিন্তু সারার্থ হৃদয়ে ধারণ করে সাত বছরে সিদ্ধিলাভ করলেন।

রাজার এক ঝাড়ুদার সেই নারীকে সেবা করতেন, (লক্ষ্মীংকরা) তাঁকে উপদেশ দান করায় তিনি বহু গুণ প্রাপ্ত হলেন। তাঁর গুণের লক্ষণ অন্যরা কেউ জানতে পারল না।

এক দিন রাজা *জলেন্দ্র অনুচরদের নিয়ে মৃগয়ায় গেলেন। সেখানে রাজা নিজেই ঘুমিয়ে পড়লেন, সময় খেয়াল করলেন না। তারপর ঘরে ফেরার সময় পথ হারিয়ে ভুল পথে ঘুরতে লাগলেন ; রাতে দেশে ফিরতে না পারায় শোবার জায়গাও তাঁর রইল না। তখন লক্ষ্মীংকরার শয়নগুহায় গেলেন, ভাবলেন, 'এখানে পাগল থাকে না কি ?'

রাজা চেয়ে দেখলেন, তার (কন্যার) দেহ থেকে জ্যোতি বিচ্ছুরিত হচ্ছে, তিনি সেখানে বসে আছেন আর সব দিক থেকে দেবকন্যারা সেই নারীকে প্রদক্ষিণ করে পূজা নিবেদন করছেন।

রাজার মনে বিশুদ্ধ ভক্তি জাগল। রাতে সেখানে থেকে দেশে ফিরে গেলেন ; পরে ফিরে এসে তাঁকে প্রণাম করলেন (রাজা জলেন্দ্র)।

'আমার মতো মেয়েকে কেন প্রণাম করছেন ?'

'আপনি গুণ প্রাপ্ত হয়েছেন, আমাকে উপদেশ দিন।'

লক্ষ্মীংকরা (দোহায়) বললেন :

'দুঃখী সংসারের সর্ব প্রাণী,
কারও নেই সুখ আনন্দ।

জন্ম-জরা-মৃত্যু—তার পীড়া ভোগ
করেন প্রাণীদের মধ্যে সর্বোত্তম
যে দেবতারা, তাঁরাও।
এই তিন দুর্গতির দুঃখ—
যত্র তত্র খাও কিন্তু ক্ষুধা
তোমার মিটবে না।
অগ্নি আর তুষার দেবে অসহ্য যন্ত্রণা।
তাই হে রাজা! সন্ধান কর
পরিত্রাণের মহাসুখ।’

এই উপদেশ দিয়ে শেষে বললেন, ‘তুমি আমার ভক্ত নও, তোমার ঝাড়ুদার ভৃত্য আমার শিষ্য। সে সিদ্ধিলাভ করেছে, সে তোমার কল্যাণমিত্র হবে।’

‘আমার অনেক ভৃত্য আছে, কী করে একে জানব।’

‘সেই ঝাড়ুদার ভৃত্য সব প্রাণীকে আহার্য দেয়, রাতে তার কাছে গিয়ে তাকে ধর।’

তিনিও ভালোভাবে দেখে সেই ঝাড়ুদারের কাছে গেলেন। তাঁকে আমন্ত্রণ করে এনে সিংহাসনে বসিয়ে প্রণাম করে উপদেশ চাইলেন রাজা।

রাজাকে সেই ঝাড়ুদার প্রভাব সংক্রমণী আশীর্বাদ ও অভিষেক দিলেন, বজ্রবারাহীর উৎপন্ন ও সম্পন্ন-ক্রম এই দুইয়ের শিক্ষাও দিলেন। তারপর সেই ঝাড়ুদার এবং সেই নারী *লংকাপুরীতে অনেক যাদুবিদ্যা দেখিয়ে সশরীরে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *লক্ষ্মীংকরার বিবরণ সমাপ্ত॥

*সমুদ্র

*গুরু *সমুদ্র-র কাহিনী।

*সর্বটি নামে এক দেশ; সেখানে নীচ কুলের একজন সমুদ্র থেকে রত্ন আহরণ করে বিক্রি করতেন আর তাই দিয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন।

কোন এক সময়ে কিছু না পেয়ে জীবিকায় বাধাগ্রস্ত হয়ে দুঃখিত মনে তিনি শ্মশানে গিয়ে বসে রইলেন।

যোগী অচিন্ত্য এসে তাঁকে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুমি এখানে কী জন্য বসে আছ?'

তিনিও পূর্বের কাহিনী সত্য করেই বললেন। যোগী উপদেশ দিলেন: 'সংসারে সকল প্রাণীরই অপরিসীম দুঃখ। তোমার পূর্বের (উল্লিখিত) দুঃখ কঠোর ও অসহনীয় বলে কষ্ট পেয়েছ, কিন্তু দুঃখ নেই এমন সুখ তুমি মুহূর্তের জন্যও পাবে না।'

'যোগী, দুঃখ থেকে পরিত্রাণের উপায় বলুন।' —তিনি বললেন। যোগী তাঁকে অভিষেক দিয়ে বাইরের চার অপ্রমাণ ও আভ্যন্তরীণ চার আনন্দের উপদেশ দিলেন।

'মৈত্রী ও করুণা, মুদিতা ও উপেক্ষা
এই চার অপ্রমাণ থেকে
স্থাপন কর অষ্ট লৌকিক ধর্মের সমতা
বহে যাক আনন্দধারা মধ্য থেকে।
চারচক্রে বিরাজ করে চার আনন্দ;
তার সুখ-শূন্যতা আছে অভিন্ন আকারে
সম্যক ধ্যান করতে পারলে তার
অনাস্রব সুখ থেকে
ক্ষণকালের জন্যও দুঃখ দেবে না দেখা।'

তিনিও এই উপদেশ অনুধাবন করে ধ্যান করলেন। তিন বছরে তাঁর পরম সিদ্ধি লাভ ঘটল। সর্বত্র তাঁর নাম *সমুদ্রপা বলে খ্যাত হলো।

তিনি নিজের অবদান ব্যক্ত করলেন। তারপর অনেক প্রাণীহিত করে আটশ অনুচর সঙ্গে নিয়ে খসর্পণে গেলেন।

*গুরু *সমুদ্র-র বিবরণ সমাপ্ত।

*ব্যালিপা

গুরু *ব্যালিপার কাহিনী

অপত্র নামে এক দেশে *ব্যালিপা নামে এক ধনী ব্রাহ্মণ ছিলেন। অমৃত আবিষ্কার করার জন্য তিনি প্রচুর পারদ কিনে তা চূর্ণ করে নানা ওষুধে মিশ্রিত করতেন। কিন্তু ওষুধের একটি উপকরণ না জানায় সিদ্ধির লক্ষণ কিছুতেই এলো

ভারতের *চম্পারণের গুরু অভয়দত্তশ্রীর মুখনিঃসৃত উপদেশ স্বরূপ এই চুরাশি সিদ্ধর বিবরণ। ভিক্ষু 'প্রণিধানসিদ্ধ জ্ঞান' তার অনুবাদ করেছেন।

[বিশ্বভারতীর আচার্য মহাপণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রীর আজ্ঞানুসারে আমি তিব্বতীয় অধ্যাপক সোনাম ডুবপা এই লিখলাম।]

পরিশিষ্ট

সিদ্ধদের রচনা প্রসঙ্গে

ভারত ও তিব্বতের বৌদ্ধধর্মের ইতিহাস সম্পর্কে যাঁদের ধারণা আছে, তাঁদের কাছে "তিব্বতী ত্রিপিটক" নামটি অপরিচিত নয়। ভারতীয় গ্রন্থাবলীর তিব্বতী অনুবাদের এ এক সুবিশাল সংকলন। সংকলনটি দুভাগে বিভক্ত। প্রথমটির নাম কেঙ্গুর বা বুদ্ধবচন, গ্রন্থসংখ্যা ১১০৮। দ্বিতীয়টির নাম তেঙ্গুর বা শাস্ত্রাদি বিভিন্ন রচনা, গ্রন্থসংখ্যা ৩৪৫৯। দুটি মিলিয়ে মোট গ্রন্থ সংখ্যা ৪৫৬৭। এর মধ্যে বহু গ্রন্থ আছে যেগুলির মূল রচনা ভারতবর্ষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে, আজ তিব্বতী অনুবাদের মাধ্যমেই আমরা সেগুলির সন্ধান পাই।

মধ্যযুগের তিব্বতে ভারতীয় গ্রন্থসমূহের এই অনুবাদের ইতিহাস সুদীর্ঘ ও বিচিত্র। অষ্টম-নবম শতক থেকে প্রধানত রাজাদেশে ভারতীয় আচার্যদের নির্দেশে সংস্কৃত ও ভারতীয় ভাষায় ব্যুৎপন্ন লোচাবা অর্থাৎ তিব্বতী অনুবাদকরা কঠোর নিয়মনিষ্ঠায় এই অনুবাদ ও সংকলনের কাজ শুরু করেন। সর্বশেষে ঐতিহাসিক বুতোন রিমছেন ডুপ (১২৯০—১৩৬৪ খ্রীস্টাব্দ) এই সংকলনের এক চূড়ান্ত, সুসংবদ্ধ রূপ দেন।

শুধুমাত্র বৌদ্ধধর্ম বিষয়ক নয়, অবৌদ্ধ বহু বিষয়ে রচিত গ্রন্থাবলীও এই সংকলনে সমান মর্যাদায় স্থান পেয়েছে। অসঙ্গ, বসুবন্ধু, দিঙ্‌নাগ, ধর্মকীর্তি প্রভৃতি দিক্‌পাল আচার্যদের বৌদ্ধ শাস্ত্রগ্রন্থসমূহের সঙ্গে পাণিনির 'ব্যাকরণসূত্র', দণ্ডীর 'কাব্যাদর্শ' থেকে শুরু করে কালিদাসের 'মেঘদূত', চাণক্যের 'নীতিশাস্ত্র' বা 'চাণক্যরাজনীতি', মহাবৈদ্য বাগ্‌ভটের 'অষ্টাঙ্গ-হৃদয় সংহিতা', মহর্ষি শালিহোত্রের 'অশ্ব-আয়ুর্বেদ সংহিতা' ইত্যাদি গ্রন্থগুলিরও তিব্বতী অনুবাদ এই সংকলনে রক্ষিত হয়েছে। পরম আগ্রহে তিব্বতী অনুবাদকরা লিপিবদ্ধ করেছেন ভারতীয় ভাষায় রচিত রসায়ন, জ্যোতির্বিজ্ঞান, ভূবিদ্যা, চিত্রকলা, ভাস্কর্য প্রভৃতি মানুষের জ্ঞান-বিজ্ঞানের নানা শাখার বহুবিধ গ্রন্থের যথাযথ অনুবাদ।

এই প্রসঙ্গে সংকলনটির একটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য আমরা সংক্ষেপে উল্লেখ করতে চাই। আর সেই বৈশিষ্ট্যটি প্রধানত গ্রন্থকর্তাদের নাম প্রসঙ্গেই নজরে পড়ে। আশ্চর্যের বিষয় যে এই সংকলনে বিখ্যাত বৌদ্ধাচার্য অসঙ্গ-র নামে কোন রচনা

নেই, আছে 'থোকমে'র নামে। 'থোকমে' অসঙ্গ-র নামের তিব্বতী অনুবাদ আর এই তিব্বতী নামেই অসঙ্গ-র সমস্ত রচনা; এমন কি 'যোগচর্যা (যোগাচার)-ভূমি', 'যোগচর্যাভূমি-শ্রাবকভূমি'র মতো গ্রন্থগুলির তিব্বতী অনুবাদেও গ্রন্থকর্তার নাম অসঙ্গ নয়, থোকমে।

আবার এই সংকলনে আচার্য বসুবন্ধুর নামে মাত্র তিনটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে। বসুবন্ধুর নামের তিব্বতী অনুবাদ ইগঞেন। এই নামে চল্লিশটিরও বেশি রচনা ও অনুবাদ এই সংকলনে স্থান পেয়েছে।

একই ভাবে আচার্য নাগার্জুনের নামে এখানে মোট আঠারোটি গ্রন্থ পাওয়া গেলেও আরও একশো ষাটটি গ্রন্থ পাওয়া যায় লুড়ুপ বা নাগার্জুনের তিব্বতী ভাষান্তরিত নামে।

স্পষ্টই দেখা যাচ্ছে তিব্বতী পণ্ডিতরা ভাষান্তরণের সময় শুধু আচার্যদের রচনা নয়, তাঁদের ভারতীয় নামও অনেক সময় অনুবাদ করে দিয়েছেন আর গ্রন্থকর্তার যথার্থ পরিচয়ের জন্য তাই যথেষ্ট বলে মনে করেছেন। কোন কোন ক্ষেত্রে আবার ব্যতিক্রমও আছে। যেমন বৌদ্ধাচার্য দীপংকর শ্রীজ্ঞান-এর নাম উল্লেখের সময় অনুবাদকরা পরম শ্রদ্ধাভরে কখনও তিব্বতী হরফে কখনও বা তিব্বতী ভাষায় (মারমে জদ এশে) তাঁর নাম লিখেছেন। গ্রন্থকর্তার পরিচয়কে আরও স্পষ্ট করবার জন্য কখনও তাঁরা উভয় পদ্ধতিই ব্যবহার করেছেন।

সিদ্ধদের নাম প্রসঙ্গেও তিব্বতী অনুবাদকরা মূলত একই পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন, আর সে ক্ষেত্রে কোথাও কোথাও তাঁরা খুবই অসুবিধায় পড়েছেন। গ্রন্থকর্তাদের নাম যেখানে সংস্কৃত ভাষায় পাওয়া যায়, সেখানে অবশ্য সমস্যাটা তুলনায় কম। কিন্তু নামটি যখন একান্তই আঞ্চলিক ভাষায় সংরক্ষিত সেখানে সমস্যা বিশেষ জটিল হয়ে উঠেছে। একটি উদাহরণ দেওয়া যাক': যেমন ঢেঁকিপার নাম। ঢেঁকি একান্তই গ্রাম বাংলার জিনিস। তিব্বতে ঢেঁকি বলতে কিছু নেই, আছে ছোট বড় হামান দিস্তা জাতীয় উপকরণ—যাকে বলা হয় তুন, গোমতিং বা তুমথুং। তাই ঢেঁকি কথাটির সমশব্দ দিতে গিয়ে তিব্বতী অনুবাদক খুবই বিপদে পড়েছেন। দিংকিপা, দিংকপা, টেঙ্গিপা নানা ভাবে নামটি বোঝাবার চেষ্টা করে শেষ পর্যন্ত নামটির প্রকৃত অর্থ ব্যাখ্যা করেছেন এই ভাবে, 'ধান কুটতেন বলে নাম হয়েছিল টেঙ্গিপা।' আরও কয়েকজন সিদ্ধাচার্য-র নামের ক্ষেত্রে তাঁদের এমনি বিড়ম্বনা ঘটেছে।

তেঞ্জুরে কোনও কোনও সিদ্ধের নামে বহুসংখ্যক গ্রন্থ পাওয়া যায়। এদের সব-

গুলিই যে প্রামাণ্য পণ্ডিতরা এমন কথা বলেন না। মহাপণ্ডিত রাহুল সাংকৃত্যায়ন সরহ-র নামে তেঙ্গুরে উল্লিখিত গ্রন্থগুলির মধ্যে মাত্র ছ'টি গ্রন্থকে সরহ-র প্রকৃত রচনা বলে সিদ্ধান্ত করেছেন। নাগার্জুনের নামে তেঙ্গুরে লিপিবদ্ধ একশো আশিটি গ্রন্থের মধ্যে ডক্টর ভেংকটরমন মাত্র কুড়িটিকে নাগার্জুনের প্রকৃত রচনা বলেছেন। এখানে আবার শূন্যবাদী বৌদ্ধাচার্য নাগার্জুন ও সিদ্ধ নাগার্জুনের পার্থক্যের কথাও উঠেছে।

কেন যে এমন শত শত গ্রন্থ সিদ্ধদের নামে তেঙ্গুরে স্থান পেয়েছে, তার কারণও হয়তো অনুমান করা যায়। সেই যুগের সমাজে সিদ্ধদের অসাধারণ জনপ্রিয়তাই বোধহয় এই কারণ। আর সেই ভাবেই হয়তো কবি যশঃপ্রার্থীদের আগ্রহে একাধিক বিদ্যাপতি ও বড়ু, দীন, দ্বিজ ইত্যাদি বিভিন্ন চণ্ডীদাসের আবির্ভাব ঘটেছে বাংলা পদাবলী কাব্যে।

অথচ এই সিদ্ধদের বেশির ভাগই ছিলেন কামার-কুমোর-জেলে-তাঁতি-চামার-ধোপা-তেলি ইত্যাদি সমাজের নিচুতলার খেটে খাওয়া মানুষ। তাঁদের বসবাস ছিল তথাকথিত ভদ্র সমাজের বাইরে—শ্মশান, শুঁড়িখানা, ইত্যাদিতে; চর্যা রচনা করেছেন তাঁরা মুখের ভাষায়—তাঁদের আশে-পাশের মানুষগুলিকে বিশেষ করে শোনাবার জন্য। জটিল সংস্কৃত ভাষায় দুরূহ তত্ত্বকণ্টকিত গ্রন্থ তাঁরা কী করে আর কেনই বা লিখবেন? তাই তাঁদের নামে প্রচলিত ও প্রচারিত বহু রচনাই সিদ্ধদের নয় বলে অনুমান হয়।

হয়তো সে যুগের সাধারণ মানুষের মনে তাঁদের অপ্রতিহত প্রভাবের ফলেই এমনটি ঘটেছে। উচ্চবর্ণের মুষ্টিমেয় মানুষের কাছে এই সিদ্ধরা যতোই ঘৃণার পাত্র হোন না কেন, বৃহত্তর জনসমাজের প্রতিনিধি এই মানুষগুলিকে বেশি দিন দূরে সরিয়ে রাখা যায় নি; জাতের ও জীবিকার বিচার ভুলে ধর্মে-কর্মে, কাব্যে-সাহিত্যে শেষ পর্যন্ত এঁদের স্থান করে দিতে হয়েছে।

তেঙ্গুর সংকলনে চুরাশি সিদ্ধদের রচনা বলে প্রচলিত গ্রন্থসমূহের তালিকা এই পরিশিষ্টে দেওয়া হলো।

১। লূইপার রচনা:

ভগবদ্-অভিসময়
বজ্রসত্ত্ব সাধনা
অভিসময়-বিভঙ্গ

তত্ত্বস্বভাব দোহাকোষ গীতিকা-দৃষ্টি
লূহিপাদ গীতিকা
শ্রীচক্রসম্বর অভিসময়-টীকা
বুদ্ধোদয়

২। লীলপার রচনা :

বিকল্প-পরিহার গীতি

৩। বিরূপার রচনা :

রক্তযমারি সাধন
রক্তযমান্তক সাধন
বলিবিধি
প্রভাস-উদয় ক্রম
সুনিষ্প্রপঞ্চ-তত্ত্ব-উপদেশ
রক্ত যমারিসাধন বিধি
যমারি-মন্ত্রাবলী
অমৃত-অধিষ্ঠান
বিরূপ পদ-চতুরশীতি
দোহাকোষ
মার্গ ফলান্বিত—অববাদক
অমৃত সিদ্ধিমূল
কর্ম চণ্ডালিকা দোহাকোষগীতি
বিরূপ বজ্রগীতিকা
বিরূপগীতিকা
ছিন্নমুণ্ডা সাধন
উড্ডিয়ান-শ্রী যোগি-যোগিনী-স্বয়ম্ভূসম্ভোগ-
শ্মশান-কল্প
গুহ্য অভিষেক প্রক্রিয়া
অমর সিদ্ধি বৃত্তি
অমৃত সিদ্ধি

তেঙ্গুরে বিরূপা কয়েকটি গ্রন্থে বির্বপা বলে উল্লিখিত হয়েছেন। এই গ্রন্থগুলির

মধ্যে কোথাও কোথাও কোর্দিয়ে (Cordier) বির্বপা নামের পরে ব্র্যাকেটে বিরূপা বলেছেন। যেমন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলিতে :

ছিন্নমুণ্ডা সাধন, উড্ডিয়ান শ্রী যোগি-যোগিনী স্বয়ম্ভূ-সম্ভোগ-শ্মশানকল্প ইত্যাদি ; আবার অন্যত্র গ্রন্থগুলির রচয়িতা বিরূপা নামের পরে ব্র্যাকেটে বির্বপা বলেছেন। এ প্রসঙ্গে রক্তযমান্তক সাধন, বলিবিধি ইত্যাদি গ্রন্থগুলি এখানে উল্লেখ করা যায়।

৪। ডোম্বি/ডোম্বিপাদ/ডোম্বিহেরুক/ডোম্বিহেরুকপাদ।

এই চারটি নামে ডোম্বির রচনাগুলি পাওয়া যায়। যেমন

ডোম্বি :

ডোম্বিগীতিকা

ডোম্বিপাদ :

দশতত্ত্ব
শ্রী হেবজ্র সাধন
ভিক্ষাবৃত্তি
শ্রী সহজসিদ্ধি
নাড়ীবিন্দুদ্বারে যোগচর্যা
চতুস্তত্ত্ব

ডোম্বিহেরুক :

গুহ্যবজ্রতন্ত্ররাজ বৃত্তি

[এই গ্রন্থের পুষ্পিকায় ডোম্বি হেরুককে মগধের রাজা বলা হয়েছে।]

একবীরসাধন
যোগি-যোগিনী নাম সাধারণার্থ উপদেশ
গণচক্রবিধি
ত্রিক্রম-উপদেশ
নৈরাত্ম্যা-যোগিনী সাধন
আর্যা-তারা-কুরুকুল্লা স্তোত্র
নাম সংগীতি বৃত্তি
সস্তোত্র কুরুকুল্লা-সাধন
মৃতবিধি
শ্রী গণপতি চক্রসূর্য

৫। শবরিপা/মহাশবর/শবরেশ্বর—এই ভিন্ন ভিন্ন নামে শবরিপার নিম্নলিখিত রচনাগুলি পাওয়া যায় :

মহাশবর :

শ্রী সহজ-উপদেশ-স্বাধিষ্ঠান
শ্রী সহজ সম্বর-স্বাধিষ্ঠান

শবরেশ্বর :

রক্ত বজ্রযোগিনী সাধন
শ্রী বজ্রযোগিনী সাধন

৬। সরহ বা সরহপাদ/মহাশবর সরহ-র নামে নিম্নের রচনাগুলি পাওয়া যায় :

বজ্রযোগিনী সাধন
বুদ্ধকপাল তন্ত্রস্য পঞ্জিকা জ্ঞানবতী নাম
বুদ্ধকপাল সাধন
সর্বভূত বলিবিধি
বুদ্ধকপাল-নাম মণ্ডল বিধিক্রম-প্রদ্যোতন
দোহাকোষগীতি
দোহাকোষনাম চর্যাগীতি
দোহাকোষ উপদেশগীতি
কখস্য-দোহা
কখস্য দোহা-টিপ্পণ
কায়কোষ অমৃত বজ্রগীতা
বাক-কোষ-রুচির স্বর বজ্রগীতা
চিত্তকোষ অজবজ্রগীতা
কায়বাক্‌চিত্ত অমনসিকার
স্বাধিষ্ঠান ক্রম
তত্ত্ব-উপদেশ শিখর দোহাগীতি
সরহগীতিকা
মহামুদ্রা উপদেশ বজ্রগুহ্যগীতি
ত্রৈলোক্য-বশংকর লোকেশ্বর সাধন
অধিষ্ঠান মহাকাল সাধন
মহাকাল স্তোত্র

শ্রীসরহ-প্রভু, মৈত্রীপাদ প্রশ্নোত্তর
দোহাকোষ নাম মহামুদ্রা উপদেশ
বসন্ত তিলক দোহাকোষ গীতিকা
ডাকিনী বজ্রগুহ্যগীতি
মর্ম-উপদেশ
ভাবনাদৃষ্টি-চর্যাফল-দোহাকোষগীতিকা
দ্বাদশ উপদেশগাথা

৭। কংকরিপা/কংকালিপার রচনা :
ষোড়শ বিন্দু ভাবনা

৮। মীন/জীনপা/মীনপাদের রচনা :
বাহ্য-অন্তর বোধিচিত্ত বন্ধ উপদেশ

৯। গোরক্ষপা / গোরক্ষ-র রচনা :
বাহ্যতত্ত্ব ভাবনা উপদেশ

১০। চৌরঙ্গপার রচনা :
বায়ুতত্ত্ব ভাবনা উপদেশ

১১। বীণপা/বীণপাদের রচনা :
গুহ্য-অভিষেক প্রক্রিয়া
মহা অভিষেক-ত্রিক্রম
বজ্র ডাকিনী নিষ্পন্নক্রম

১২। শান্তিপা/রত্নাকর শান্তির রচনা :
সুখদুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি
মধ্যমক অলংকারবৃত্তি মধ্যমক প্রতিপাদ সিদ্ধি
প্রজ্ঞা পারমিতা উপদেশ
প্রজ্ঞা পারমিতা ভাবনা উপদেশ
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি
অন্তরব্যাপ্তি
ডাকিনীমণ্ডল উপায়িকাক্রম
বজ্র তারা সাধন
শ্রী হেবজ্র পঞ্জিকা মুক্তিকাবলি
বজ্রভৈরব গণচক্র

প্রতিসর রক্ষাচক্র লেখ উপায়
মণ্ডলবিধি
অষ্ট সাহস্রিকা প্রজ্ঞাপারমিতা পঞ্জিকা সারোত্তমা নাম।
মধ্যমক অলংকার উপদেশ
ছন্দরত্নাকর

১৩। তন্তিপার রচনা : চতুর্যোগ ভাবনা নাম।

১৪। চমরিপার রচনা : প্রজ্ঞা-উপায়-বিনিশ্চয় সমুদয়।

১৫। খড়্গপা/খড়্গপাদ রচিত গ্রন্থটির নাম খড়্গপাদগীতিকা।

১৬। নাগার্জুন/লুডুপ

তেঙ্গুরে নাগার্জুনের নামে একশো আশিটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায়।

তিব্বতের অন্যতম বিখ্যাত ঐতিহাসিক ও তেঙ্গুর গ্রন্থাবলীর সংকলয়িতা বুতোন নাগার্জুনের নামে প্রচলিত গ্রন্থের মধ্যে ছটি গ্রন্থকে বিশেষ প্রাধান্য দিয়েছেন :

শূন্যতা-সপ্ততি
প্রজ্ঞামূল
যুক্তি-ষষ্ঠিকা
বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী
বৈদল্য-সূত্র
ব্যবহার সিদ্ধি

তিব্বতের আর এক প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক The Blue Annals-রচয়িতা গোয় লোচাবা শোনন্নু পাল-ও একই মত পোষণ করেন।

অধ্যাপক কে. ভেংকটরমনের (K. Venkataraman) মতে তিব্বতী ও চীনা সূত্রানুসারে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি নাগার্জুনের রচনা ও উপদেশ বলে নির্দিষ্ট করা যায়—

মধ্যমকশাস্ত্র
বিগ্রহ-ব্যাবর্তনী
এক-শ্লোক-শাস্ত্র
দ্বাদশ-মুখ-শাস্ত্র
শূন্যতা-সপ্ততি
প্রতীত্য-সমুৎপাদ-হৃদয়শাস্ত্র

যুক্তি-ষষ্টিকা
বোধিসত্ত্ব-পাথেয়-শাস্ত্র
মহা-প্রজ্ঞাপারমিতা-শাস্ত্র
দশভূমি-বিভাষা শাস্ত্র
আর্য-ধর্মধাতু-গর্ভ-বিবরণ
বৈদল্যসূত্র
বৈদল্য-প্রকরণ
নিরুপম স্তব
লোকাতীত স্তব
অচিন্ত্য স্তব
স্তত্যতীত স্তব
পরমার্থ স্তব
ধর্মধাতু স্তব
সুহৃল্লেখ

অনেকের মতে দুজন নাগার্জুন ছিলেন : প্রথম খ্রীস্টাব্দের প্রথম পর্বে দার্শনিক নাগার্জুন ও চারশ বছর পরের সিদ্ধ নাগার্জুন।

১৭। কাহ্নপা নামে নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি পাওয়া যায় :

কাহ্নপাদ গীতিকা

তেঙ্গুর অনুযায়ী মগধের বিখ্যাত কাহ্নপাদ বা ছোট কাহ্নপার রচনা :

জিহ্ম-সরলিকরণ উপদেশ

কাহ্নপাদ বা কৃষ্ণাচার্য-র

শ্রী চক্রসম্বর সাধন
ভগবত্‌শ্রী চক্রসম্বর মণ্ডলবিধি
শ্রী চক্র সম্বর হোম বিধি
বসন্ত তিলক
গুহ্য-তত্ত্ব-প্রকাশ
আলি-চতুষ্টয়
আলি-চতুষ্টয়-বিভঙ্গ
সপ্তাক্ষর সাধন

তিব্বতী নাকপো চোইপা সংস্কৃত অনুবাদে কৃষ্ণাচার্য-র রচনা :

মহামায়া-মণ্ডল-বিধিক্রম বোধন
বিঘ্নরাজ-সাধন
বিনায়ক-রাজ-সাধন
শ্রীবজ্র-ডাকিনী-সাধন
মহাঢুণ্ঢণ-মূল
রথচক্র-পঞ্চদশ-যন্ত্র
চণ্ডালী-যন্ত্র
রক্ত-একজটা-অধিষ্ঠান বিধি
পঞ্চসর্গ

নাকপো চোই পেই শপ্ বা কৃষ্ণাচার্যপাদ-র রচনা :

কুরুকুল্লা সাধন।

১৮। কর্ণরিপা / কর্ণরি / কানেরিপাদ-র রচনা :

কানেরি গীতিকা
যক্ষ-মহাকাল-রত্নস্তুতি

পণ্ডিতবিশেষের মতে কানেরিপাদেরই অন্য নাম আর্যদেব। তেঙ্গুরে আর্যদেব-এর রচনা বলে বহুসংখ্যক তান্ত্রিক গ্রন্থের উল্লেখ পাওয়া যায়।

ঐতিহাসিক বুতোন নিম্নলিখিত গ্রন্থগুলি আর্যদেবের রচনা বলে অভিমত প্রকাশ করেছেন :

চর্যা-মেলায়ন-প্রদীপ
চিত্ত-আবরণ-বিশোধন
চতুঃ-পীঠ-তন্ত্ররাজ-মণ্ডল-উপায়িকা-বিধি-সার-সমুচ্চয়
পীঠ-সাধন
জ্ঞান-ডাকিনী
একদ্রুম-পঞ্জিকা

এবং সম্ভবত প্রদীপ-উদ্যোতন-অভিসন্ধি-প্রকাশিকা-ব্যাখ্যা-টীকা।

এই গ্রন্থগুলি ছাড়াও তেঙ্গুরে কর্ণরিপা বা আর্যদেবের রচনা বলে নিম্নের গ্রন্থগুলিকে উল্লেখ করা হয়েছে—

আর্য-প্রজ্ঞাপারমিতা-মহাপরিপৃচ্ছা
হস্তবাল-প্রকরণ ও তার বৃত্তি
চতুঃশতক-শাস্ত্র-কারিকা

স্খলিত-প্রমথন যুক্তি হেতু সিদ্ধি
জ্ঞানসার সমুচ্চয়
মধ্যমক ভ্রমঘাত।

১৯। খগনপার (ওড্ডিয়ানের) রচনা :

সহজ সদ্‌যোগবৃত্তি গর্ভপ্রকাশিকা
শ্রীগুহ্যসমাজ তন্ত্রবিবরণ
শ্রীসমন্তভদ্র সাধন বৃত্তি
দোহাকোষ তত্ত্বগীতিকা

২০। নারো/নারোপা/তিব্বতী ভাষান্তরে মহানারোপা বা নারোপাদ।

নারোর রচনা :

পরমার্থ সংগ্রহনাম সেকোদ্দেশ-টীকা

নারোপার রচনা :

একবীর হেরুক সাধন
বজ্রযোগিনী সাধন
বজ্রপদ সার সংগ্রহ পঞ্জিকা (?)
শ্রী হেবজ্র সাধন
রত্নপ্রভা
ধর্ম-অভিষেক মার্গ সংহতি
শ্রী দেবী মহাকালী সাধন উপায়িকা
নাড়োপণ্ডিত গীতিকা
বজ্রগীতি
শত-অক্ষর-ভট্টারকস্য সত্বত্রয় ভাবনা
শ্রীগুহ্যরত্ন চিন্তামণি
শ্রীচক্রসম্বর বিকুর্বণ চতুর্বিংশতিদেশ প্রমাণ
শ্রীবজ্রযোগিনী গুহ্যসাধন

কাশ্মীরের নারোপার রচনা :

শ্রীগুহ্যসমাজ উপদেশ পঞ্চক্রম
পঞ্চক্রম সংগ্রহ প্রভাব
শ্রীমতী দেবী মহাকালী গুহ্যসাধনা
গুরু বিধি

২১। শলিপার রচনা বলে দুটি গ্রন্থের নাম পাওয়া যায় :

রত্নমালা
ভৈরব মহাকাল সাধন

২২। তিল্লোপা/তিল্লিপা/তেলো/তৈল/তৈলপার রচনা :

অচিন্ত্য মহামুদ্রা
সদ্ধর্ম উপদেশ
বাহ্যসিদ্ধিপ্রতীত্য সমুৎপাদ
নিমিত্ত সূচনা ব্যাকরণ
শ্রীসহজ শম্বর-স্বাধিষ্ঠান
করুণাভাবনা-অধিষ্ঠান
তত্ত্বচতুর-উপদেশ : প্রসন্ন-দীপ
অন্তরবাহ্য বিষনিবৃত্তি ভাবনাক্রম
দোহাকোষ
মহামুদ্রা-উপদেশ
গুরুসাধন

[এখানে গ্রন্থপরিচয়ে বা পুষ্পিকায় বলা হয়েছে গঙ্গাতীরে নারোপার কাছে তিল্লোপা বচনদান করেছিলেন।]

২৩। ছত্রপার রচনা :

শূন্যতা করুণাদৃষ্টি

২৪। ভদ্রপা—তেঙ্গুর সংকলনে তাঁর রচনা বলে কোনও গ্রন্থ পাওয়া যায় না।

২৫। দ্বিখণ্ডিপার রচনা :

মহাযান-অবতার
চতুরক্ষর-উপদেশ

২৬। অযোকপা/অযোগিন্‌-এর রচনা :

চিত্ত সম্প্রদায়-ব্যবস্থান
বায়ুস্থান রোগপরীক্ষণ

২৭। কলপ/কালপাদ-র রচনা :

কালচক্র সহজ সাধনা
শ্রীকালচক্র সাধন-উপায়িকা চতুরঙ্গ।

নক্ষত্র মণ্ডল সাধনা একাদশাঙ্গ নাম
কালচক্র-উপদেশ (?)

২৮। ধোম্বিপা/ডোম্বি/ডোম্বিপাদ-এর রচনা :

ডোম্বী গীতিকা
দশতত্ত্ব
শ্রীহেরুক সাধন
ভিক্ষাবৃত্তি
শ্রীসহজসিদ্ধি
নাড়ী বিন্দুদ্বারে যোগচর্যা
চতুঃতত্ত্ব

ডোম্বিহেরুক বা ডোম্বিকে মগধের রাজা বলা হয়েছে। তেঙ্গুরে ডোম্বিহেরুকের রচনা বলে তেরটি গ্রন্থের উল্লেখ আছে।

২৯। কংকনপার রচনাটির নাম :

চর্যা দোহাকোষ গীতিকা

৩০। কম্বলপার রচনা :

ভগবদ্ হেবজ্র সাধনতত্ত্ব চতুরক্রম
অসম্বন্ধ দৃষ্টি
অসম্বন্ধ সর্গ দৃষ্টি
আর্য প্রজ্ঞাপারমিতা-উপদেশ
মণ্ডলবিধি
ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিতা নবশ্লোক পিণ্ডার্থ
ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিতা নবশ্লোক পিণ্ডার্থ টীকা

কম্বলপা বা লাবপার রচনা :

সাধনা নিদান নাম শ্রীচক্রসম্বর পঞ্জিকা
ভগবত শ্রীচক্রসম্বরস্যসাধন রত্নচূড়ামণি নাম,
শ্রীচক্রসম্বর মণ্ডল-উপায়িকা রত্নপ্রদীপ
উদ্দ্যোত নাম।
কম্বল গীতিকা
শ্রীচক্রসম্বর অভিসময় টীকা
নবশ্লোক

আর্য সপ্ত শ্লোকিকা ভগবতী প্রজ্ঞাপারমিতা নাম সূত্র

৩১। দিংকিপা/ঢেঁকিপা/টেংকিপা/ডেংগিপা।

লুইপা রচিত 'বুদ্ধোদয়' নামে গ্রন্থটি দিংকিপা/ঢেঁকিপা পরিমার্জিত করেন বলা হয়েছে।

৩২। ভাণ্ডারিন্ : ভাণ্ডেপা/ভদেপার রচনা :

সহজ-আনন্দ দোহাকোষ গীতিকা-দৃষ্টি

৩৩। তন্থেপার (অক্ষপা) কোনও রচনা পাওয়া যায় না।

৩৪। কুক্করিপা/কুক্কুরিপাদ/কুকুরি/কুকুররাজ-র রচনা :

মহামায়াতন্ত্র-অনুসারিনী হেরুকসাধন উপায়িকা
বজ্রসত্ত্ব সাধন
মোহতরণ কল্প
মহামায়া সাধন মণ্ডল বিধি
শ্রীমহামায়া মণ্ডল দেবস্তোত্র
তত্ত্বসুখ ভাবনা-অনুসারী যোগভাবনা উপদেশ
স্রব-পরিচ্ছেদন
শ্রীমহামায়া বলিবিধি
শ্রীবজ্রসত্ত্ব গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
শ্রীবৈরোচন গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
শ্রীবজ্র হেরুক গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
শ্রীপদ্ম নর্তেশ্বর গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
শ্রীবজ্র রত্নপ্রভা গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
শ্রীসুঘোট ললিত গুহ্য-অর্থধর ব্যূহ
সর্বমণ্ডল-অনুসারেণ পঞ্চবিধি
সর্ববুদ্ধ সমযোগ মণ্ডলবিধি

৩৫। কুচিপা/কুজিপা/কুজিপাদ :

তেঙ্গুরের একটি গ্রন্থের (স্রব পরিচ্ছেদন নাম) রচয়িতা বলে কুক্কুরিপা তথা কুচিপার নাম উল্লেখ করা হয়েছে।

৩৬। ধর্মপার রচনা :

সুগতদৃষ্টি গীতিকা
হুংকার চিত্তবিন্দু ভাবনাক্রম

৩৭। মহিপা বা মহীপাদ-এর রচনা :

বায়ুতত্ত্ব দোহাগীতিকা

৩৮। অচিহ্ন বা অচিন্ত-এর রচনা :

তীর্থিক চণ্ডালিকা

৩৯। বভহি বা বভিল-র রচনা :

মহাকাল স্তোত্র
বজ্রযান মূল-আপত্তি
অংগ-অপরাধ

৪০। নালপার একটি মাত্র গ্রন্থ পাওয়া যায় :

ধাতুবাদ

৪১। ভুসুকুপা বা ভুসুখ অথবা শান্তিদেব কিংবা তিব্বতী ভাষায় শান্তিলা (শান্তিদেব) শান্তিপাদ/শান্তিগর্ভ/রত্নাকরশান্তি, রত্নাকরশান্তিপাদ এই বিভিন্ন নামে তেঙ্গুরে ত্রিশটিরও বেশি গ্রন্থের নাম আমরা পাই।

ভুসুকুপার রচনা :

চক্রসম্বর টীকা
চক্রসম্বর সাধনা

শান্তিদেব-এর রচনা :

বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার
শিক্ষা সমুচ্চয়
শিক্ষা সমুচ্চয় কারিকা
তথাগত-হৃদয় পাপদেশনা-বিধি সহিত শত-অক্ষর রক্ষা
আর্য অত্যয়জ্ঞান নাম মহাযান-সূত্রবৃত্তি
কেবলী
বোধিসত্ত্ব চর্যাবতার উদ্ভব প্রণিধান

শান্তিলা-র রচনা :

সরস্বতী পূজাবিধি

শান্তিপাদ/রত্নাকরশান্তির রচনা :

সুখদুঃখদ্বয় পরিত্যাগ দৃষ্টি
মধ্যমক-অলংকার বৃত্তি মধ্যমক প্রতিপদাসিদ্ধি
প্রজ্ঞাপারমিতা উপদেশ

প্রজ্ঞাপারমিতা ভাবনা উপদেশ
বিজ্ঞপ্তিমাত্রতা সিদ্ধি
অন্তরব্যাপ্তি

শান্তিগর্ভ/শান্তিপা/শান্তিপাদ-র রচনা :

ডাকিনী মণ্ডল-উপায়িকা
ক্রমনাম

রত্নাকর শান্তির রচনা :

শ্রীহেবজ্র পঞ্জিকা মুক্তিকাবলী
কুসুম-অঞ্জলি নাম গুহ্যসমাজ নিবন্ধ
কৃষ্ণযমারি মহাতন্ত্ররাজ পঞ্জিকা
রত্ন প্রদীপ
বজ্রভৈরব গণচক্র
প্রতিসরা রক্ষাচক্র লেখ-উপায়
মণ্ডলবিধি

রত্নাকর শান্তিপাদ (কলিকাল-সর্বজ্ঞ)-র রচনা :

চণ্ডরত্নাকর
বজ্রতারা সাধন

৪২। ইন্দ্রভূতির রচনা :

শ্রীচক্রসম্বর তন্ত্ররাজ শম্বরসমুচ্চয় নাম বৃত্তি
শ্রীচক্রসম্বর স্তোত্র
শ্রীচক্রসম্বর-অনুবন্ধ সংগ্রহ
সিদ্ধ বজ্রযোগিনী সাধন (পুষ্পিকায় ইন্দ্রভূতিকে ওড্ডিয়ান-নরেন্দ্র বলা হয়েছে।)
ডাকিনী বজ্রপঞ্জর মহাতন্ত্ররাজস্য পঞ্জিকা (প্রথম পটল) মুখবন্ধ।
সম্পুট তিলক নাম যোগিনীতন্ত্ররাজস্য টীকা স্মৃতি-সন্দর্শন-আলোক।
শ্রী আনন্দপুষ্পমালা (পুষ্পিকায় ইন্দ্রভূতিকে ওড্ডিয়ানের মহারাজা বলা হয়েছে)।
শ্রীতত্ত্ব অমৃত উপদেশ
ইন্দ্রভূতি

সর্ববুদ্ধ সমযোগ নাম তন্ত্রপঞ্জিকা
সর্ববুদ্ধ সমযোগ গণবিধি
বজ্রসত্ত্ব উপায়িকা
জ্ঞানসিদ্ধি নাম সাধন উপায়িকা
সহজসিদ্ধি (রাজকন্যা লক্ষ্মীংকরা এই গ্রন্থটির বৃত্তি বা 'পদ্ধতি' লিখেছেন)
তত্ত্ব-অষ্টক: দৃষ্টি
রত্নচক্র অভিষেক উপদেশ-ক্রম
শ্রীআজ্ঞা বিনিবর্ত গণপতি সাধন
বজ্রযান মূল অংগ আপত্তি দেশনা
শ্রীগুহ্যগর্ভ ক্রমদ্বয় উপদেশ—ক্রমদ্বয়
রত্নচক্র
জ্ঞান আলোক
রত্নমালা
অপরাজিতা মেরুবর ভদ্রংকর রত্নসাধন
চিত্তরত্ন বিশোধন
কুরুকুল্লা-সাধন
শ্রীসহজ সম্বর সাধিষ্ঠান
অষ্ঠমুখ কুরুকুল্লা সাধন
শ্রীবজ্রযোগিনী মন্ত্রতত্ত্ব সাধিষ্ঠান নির্দেশ

৪৩। মেকোপা রচিত কোনও গ্রন্থ নেই।

৪৪। কোটলি/কুদ্দালি/কোদালিপা-র রচনা :
চিত্ত তত্ত্ব উপদেশ
অচিন্ত্য ক্রম উপদেশ
আত্ম যোগ

৪৫। কম্পরিপা/করমারপা-র রচনা :
সোম-সূর্য বন্ধন উপায়

৪৬। জালন্ধরপা-র রচনা :
চক্রসম্বর গর্ভতত্ত্বসিদ্ধি
বজ্রযোগিনী সাধন

বিমুক্ত মঞ্জরী নাম গীতা (পুষ্পিকায় রচয়িতা আদিনাথ জালন্ধরপাদ বলা হয়েছে)।
মহাকারুণিক অভিষেক প্রকরণ উপদেশ
ভগবত্-সম্বর স্তোত্র (মতান্তরে ঘণ্টাপা এই গ্রন্থটির রচয়িতা)।
হেবজ্র সাধনস্য টিপ্পনী শুদ্ধি বজ্রপ্রদীপ

৪৭। রাহুল-এর রচনা :
অচিন্ত্য পরিভাবনা
চর্যা-অপরাধ-স্বয়ংমুক্তি
বজ্রখেচর সাধন
নাথ সময়স্তোত্র
উৎপাদন সমাপি নাম নৈরাত্মা একবীর সাধন

৪৮। ধর্মপার রচনা :
সুগত দৃষ্টি গীতিকা
হুংকার চিত্তবিন্দু ভাবনাক্রম
মহামায়া নিষ্পন্নক্রম

৪৯। ধোকরিপার রচনা :
প্রকৃতি সিদ্ধি

৫০। মেদিনীপার রচনা :
সহজ-আম্নায়

৫১। পংকজপার রচনা :
স্থান মার্গফল মহামুদ্রা ভাবন
অনুত্তর সর্বসিদ্ধিক্রম

৫২। ঘণ্টা/ঘণ্টাবজ্রর রচনা :
চক্রসম্বর পঞ্চক্রম
চক্রসম্বর পঞ্চক্রম বৃত্তি
শম্বর কায়মণ্ডল অভিসময়
সহজ শম্বর সাধন
ভগবত চক্রশম্বর সাধন
রত্ন চিন্তামণি
দ্বিভুজ সহজ শম্বর সাধন

গণচক্রবিধি
চক্রসম্বর সাধন
মঞ্জুশ্রী অববাদক মৈত্রীপাদ উপদেশ উপসংহার (?)
আলি-কালি মন্ত্রজ্ঞান

ঘণ্টাবজ্রর রচনা :

হেরুক পঞ্চক সাধন
চক্রসম্বর উপদেশ
মঞ্জুশ্রী গম্ভীর ব্যাখ্যা
ভগবত শম্বর স্তোত্র (মতান্তরে জালন্ধরপা-র রচনা)
ত্রয়োদশ-আত্মক শ্রীসম্বর অর্চনবিধি

৫৩। যোগিপা/অযোকি/অযোগি-র রচনা :

বায়ুস্থান রোগ পরীক্ষণ

৫৪। চেলুক/চেলুকপার রচনা :

ষড়ঙ্গ যোগ উপদেশ
রত্নবৃক্ষ নাম রহস্য সমাজবৃত্তি

৫৫। গোরুর/বাগুড়ির রচনা :

খেচর রক্ত বজ্রযোগিনী সাধন

৫৬। লুচিক/লুচিকির রচনা :

চণ্ডালিকা বিন্দুপ্রস্ফুরণ

৫৭। নগুণির রচনা :

শরীর নাড়িকা বিন্দু সমতা আম্নায়

৫৮। জয়ানন্দর রচনা ও অনুবাদ : (কাশ্মীরের মহাপণ্ডিত জয়ানন্দ)

বিশ্বকর্ম চর্যা উপদেশ
বোধিচিত্ত বিবরণ
মধ্যমক অবতার টীকা

৫৯। পচরিপা/চর্পটিপা-র রচনা :

চতুর্ভূতভব অভিভাষণক্রম
অমোঘ পাশ পঞ্চদেব স্তোত্র (?)
সর্বসিদ্ধি কর
লোকেশ্বর স্তোত্র

৬০। চম্পক-এর রচনা :

আত্ম পরিজ্ঞান দৃষ্টি উপদেশ

৬১। ভিকৃষণপা/তিব্বতীতে সোনিপা অর্থাৎ বিদন্তী।

তেঙ্গুরে উল্লেখ আছে সে বোধিসত্ত্ব মগধের ভেকুণি বা ভিকৃষণের কাছে 'কালচক্র উপদেশ সূর্য চন্দ্র সাধন' বিবৃত করেছিলেন।

৬২। তেলিপা : আগে তিল্লোপার রচনা তালিকা দেখুন।

৬৩। কুমরিপার রচনা :

প্রদীপ-উদ্দীপ টিপ্পন হৃদয় দর্পণ (?)

৬৪। চপরিপা/জপরি/জবরিপা/অজপালিপার রচনা :

মহাযক্ষ কলাপ নীলাম্বরধর বজ্রপাণি সাধন মহাচক্র
মহাযক্ষ কলাপ নীলাম্বরধর বজ্রপাণি সাধন অমৃতবিন্দু
নীলাম্বরধর বজ্রপাণি পিণ্ডীকৃত সাধন উপায়িকা
নাগকুল চতুর সাধন
যক্ষ সেনাপতি বিশোধনহর নাম সাধন
প্রেত পিশাচ কুষ্মাণ্ড পূতন-বিশোধন হর সাধন
নীলাম্বরধর বজ্রপাণি ধারণী বলিবিধি
কর্মশটক=স্বপ্ন কর্মশটক
মারণমারী অমৃত
দুগ্ধ অমৃত পূজা
ক্রোধনাগ মারণ কর্মন
নাগ কুল চতুর সাধন
নীলাম্বরধর বজ্রপাণি হোমবিধি=শান্তিপুষ্টি হোম
ঐ =রৌদ্র হোম
মহাযক্ষ সেনাপতি নীলাম্বরধর বজ্রপাণি মণ্ডল বিধি
চিতি জ্বালা লক্ষণ
মহাযক্ষ সেনাপতি নীলাম্বরধর বজ্রপাণি মহাচক্র মণ্ডল
দেবগণ স্তোত্র
প্রতীত্য-সমুৎপাদ রক্ষা
অধিষ্ঠান মহাকাল সাধন

৬৫। মণিভদ্রা বা বহুরির রচনা :

বজ্রডাক তন্ত্রস্য তত্ত্ব স্তুম্বির নাম পঞ্জিকা

বজ্রডাক বিবৃতি নিবন্ধ

৬৬। মেখলার রচনা :

চিত্ত চৈতন্য শমন উপায়

৬৭। কনখলা/কংকালমেখলার রচনা :

সনাতন-আবর্ত ত্রয়মুখ আগম

৬৮। কলকলার কোন রচনা পাওয়া যায় না।

৬৯। কন্তালি/কন্থালিন-এর রচনা :

সহজ অনন্ত স্বভাব

৭০। ধহুলির রচনা :

শোকদৃষ্টি

৭১। উড়িলি/উধলি/উধরি } এঁদের কোনও রচনা পাওয়া যায় না।
৭২। কপাল

৭৩। কিলপাদ / কিরপার রচনা :

দোহা চর্যা গীতিকা দৃষ্টি

৭৪। শকর / সাগর / পুকর-এর রচনা

শম্বর চক্রেশ্বর আলিকালি মহাযোগ ভাবনা

৭৫। সর্বভক্ষ্যর (দারিকপার শিষ্য ইনি) রচনা :

করুণা চর্যা কপাল দৃষ্টি

৭৬। নাগ-বোধির রচনা :

কৃষ্ণ যমারি চক্র উপদেশ

সময় অলংকার

সমাজ সাধন ব্যবস্থলী

ক্রম অন্তর ভাব উপদেশ নাম প্রকরণ

পঞ্চক্রম টীকা মণিমালা নাম।

পঞ্চক্রম অর্থ ভাস্করণ

যমারি সিদ্ধ চক্র সাধন

নীলাম্বরধর বজ্রপাণি নাম তন্ত্র টীকা

বলি অলংকার

নীলাম্বরধর বজ্রপাণি-সাধন উপায়িকা ও ঐ গ্রন্থের টীকা

আদি যোগ ভাবনা

৭৭। দারিক/দারিকপা/দারিপা/দারিপাদ-র রচনা :

কাল চক্র তন্ত্ররাজস্য শেক প্রক্রিয়াবৃত্তি বজ্রপাদ
উদ্ঘাটি(নী)
চক্রসম্বর সাধন তত্ত্ব সংগ্রহ
চক্রসম্বর মণ্ডল বিধি তত্ত্ব অবতার
চক্রসম্বর স্তোত্র সর্বার্থ সিদ্ধি বিশুদ্ধ চূড়ামণি
যোগ অনুসারিণী নাম বজ্রযোগিনী টীকা
বজ্রযোগিনী পূজাবিধি
কংকাল তারণ সাধন
ওড্ডিয়ান বিনির্গত মহাগুহ্য তত্ত্ব উপদেশ
সপ্তম সিদ্ধান্ত
তথাগত দৃষ্টি
প্রজ্ঞাপারমিতা হৃদয় সাধন

৭৮। পুতলিপার রচনা :

বোধিচিত্ত বায়ু চরণ ভাবনা উপায়

৭৯। পানহ-র রচনা :

চর্যা দৃষ্টি অনুৎপন্ন তত্ত্ব ভাবনা

৮০। কোকলি/কোকিল-র রচনা :

আয়ু পরিরক্ষা

৮১। অনংগ-র রচনা :

বিষ নিবর্হণ ভাবনাক্রম

৮২। লক্ষ্মীংকরা-র রচনা :

বজ্রযোগিনী সাধন
প্রদীপ উদ্দ্যোতন বিষমপদ পঞ্জিকা
অদ্বয় সিদ্ধি সাধন
বজ্রযান চতুর্দশ মূল আপত্তি বৃত্তি
লোকেশ্বর স্তোত্র

চিত্তকল্প পরিহার দৃষ্টি
ভট্টারক আর্য একাদশমুখ অবলোকিতেশ্বরস্য সাধন
মহাকারুণিক স্তোত্র
অবলোকিতেশ্বরস্য স্তোত্র
সদ্গুরু ধর্মরাজ স্তোত্র
সহজ সিদ্ধি পদ্ধতি
তিঙস্ত (লক্ষ্মীংকরা বা নেপালের লক্ষ্মীশ্রীর রচনা)

৮৩। সমুদ বা সমুদ্রর রচনা :
স্বপ্ন যোগ

৮৪। ব্যালিপা/ব্যাড়িপাদ-র রচনা :
রসসিদ্ধি শাস্ত্র
রসায়ন শাস্ত্রবৃত্তি
উপদেশ প্রকাশ ষড়ঙ্গ যোগ
এক প্রদীপ উপদেশ
এক স্মৃতি
মহামায়া উপদেশ
উপদেশ
বাহ্য-অন্তর অমৃতকল্প